ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ

ও. ইয়াখৎ

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

প্রকাশক : তরুণ সেনগুপ্ত
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪।৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম কথা

মার্কসীয় দর্শনের বিষয়বস্তু

দর্শন কাকে বলে?

এ বিষয়ে রকমারি মতের অন্ত নেই। অনেকেই বলবেন, "দর্শন এক চমৎকার, জীবন্ত ও প্রগাঢ় বিদ্যা।" আবার অন্যেরা ঠোকর দিয়ে বলবেন, "ওটা বাদ দিয়েও আমার বেশ চলে যাবে"। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস, দর্শন তাঁদের কোনো কাজেই লাগবে না। এমনতরো একটা মত দৈবক্রমে দেখা দেয় নি। বহু শতাব্দী ধরে ভাবা হতো, দর্শন শুধু সমাজের শিরোমণিদের জন্য, যারা দাসদাসীদের মালিক কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক তাদের জন্য। তাই এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, দর্শন এমন একটা কিছু যার সঙ্গে সাধারণ জীবনযাত্রার অত্যন্ত দূর সম্পর্ক, যা দুর্বোধ্য ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্তু একবার চিন্তা করা যাক, সত্যই দর্শন ছাড়া আমাদের চলতে পারে কি না।

আপনাদের অনেকেই হয়ত শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যদি আমি বলি যে, আপনাদের সচেতন জীবনে আপনারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দর্শনের আশ্রয় নিয়েছেন এবং তার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছেন। কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। এক বিশেষ সমাজে যে ব্যক্তি বাস করে সে হাজারো ঘটনা ঘটতে দেখে। নিজ দেশে ও সুদূর বিদেশে যা ঘটছে সে বিষয়ে সে চিন্তা করে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধেও সে না ভেবে থাকতে পারে না, সে চায় বিশ্বের রহস্য ভেদ করতে। যখন সে এই সব প্রশ্নের কথা ভাবে, যেমন, কোথা থেকে এল এই গ্রহনক্ষত্ররাজি এবং এই পৃথিবী ও যা কিছু পার্থিব, মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হয়, সুখ কি, জীবনের মানে কি, তখন সে দার্শনিক সমস্যা নিয়েই

মাথা ঘামায়। সে সজ্ঞানে দর্শনচর্চা করছে না অজ্ঞানে, তাতে কিছু যায় আসে না। আর এটা শুধু অলস কৌতূহলের ব্যাপারই নয়। সর্বদা এবং সর্বত্র মানুষকে এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হয়। যে উত্তরই সে দিক না কেন, তার একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক তাৎপর্য থাকবেই।

একটা উদাহরণ দিই। অতীতে চাষীরা অনাবৃষ্টির কালে বৃষ্টিপাতের জন্য প্রার্থনা করত। এই থেকে বোঝা যায়, বারিবর্ষণাদি ঘটনা সম্বন্ধে তাদের মনে একটা বিশেষ রকমের "ধারণা" ছিল।

বলা বাহুল্য, তারা যে ভাবে জগৎকে দেখত সেটা নিতান্তই ভুল। কিন্তু অনাবৃষ্টিজনিত সর্বনাশ নিবারণ করার জন্য লোকেরা যখন সেচপ্রণালী খনন করে কিংবা জমিকে এমনভাবে চাষ করে যাতে তার আর্দ্রতা রক্ষিত হয়, তখন সহজেই বোঝা যায় যে বৃষ্টিপাত ও জগৎ সম্পর্কে তাদেরও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটা এই যে, প্রকৃতির প্রকাশ ঘটে প্রাকৃতিক-ভাবে, ঈশ্বরের সাহায্য বিনাই। জগৎকে এই ভাবে দেখাই ঠিক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধেও নানা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তকে এড়ানো যায় না যে, আমাদের চারিপাশে যা কিছু ঘটছে সেগুলিকে বুঝতে হলে কোনো না কোনো বিশ্বদৃষ্টির দ্বারা চালিত হওয়া চাই। **বিশ্বদৃষ্টি বলতে বোঝায়, জীবন, বিশ্বজগৎ, খণ্ড খণ্ড প্রাকৃতিক প্রকাশ ও সামাজিক ঘটনা, এইগুলিকে আমরা যেমন যেমন ভাবে দেখি তাদের মোট যোগফল।**

জগতে যা যা ঘটছে সেগুলিকে শুধু চুপচাপ দেখে না গিয়ে যদি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাই, তাহলে গোটা জগৎটা সম্বন্ধে আমাদের একটা সাধারণ ধারণা থাকা দরকার। জ্ঞানের সঙ্গে গভীর ভাবাদর্শগত প্রত্যয়ের ঐক্য ঘটলে তবেই একটা অখণ্ড বিশ্বদৃষ্টি গড়ে ওঠে। আমাদের জীবনে তার ভূমিকাটা খুবই বড়।

ধরা যাক, দু'জন লোককে একটি ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হলো। একজন রাজি হলেন, অন্যজন হলেন না। প্রথম ব্যক্তি ধর্মপ্রচারকদের ভুল যুক্তিতর্কের ফাঁদে পড়ে গেলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বুঝতে পারলেন, এ সবই ধাপ্পাবাজি। উভয়ের আচরণের পার্থক্যের কারণ

এই যে, বাস্তবজগতকে তাঁরা বিভিন্নভাবে বুঝেছেন, অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় বিশ্ববোধ সে ব্যাপারে তাঁদের মিল নেই। একজন উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষ নিজের সুখ নিজেই সৃষ্টি করে। অন্য জনের এমন কোনো দৃঢ় প্রতীতি নেই, তাই তিনি একটা অমানবিক মহাশক্তির কৃপাপ্রার্থী। দু'জন দুইভাবে জীবনকে দেখেন। একজন ঠিকভাবে, অন্যজন ভুল ভাবে। শেষোক্ত ব্যক্তিটির বিশ্বদৃষ্টি ভ্রান্ত।

দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ যতটা ভাবেন তার চেয়ে একটু বেশি ঘনঘনই আমরা দর্শনের আশ্রয় নিয়ে থাকি। এমনটি হওয়ারই কথা। লেনিন লিখেছিলেন: "সমাজতন্ত্রীর পক্ষে একটি সুচিন্তিত ও অবিচলিত বিশ্বদৃষ্টির প্রয়োজন আছে যাতে করে তিনি ঘটনার দ্বারা চালিত না হন, ঘটনা তাঁর দ্বারা চালিত হতে পারে।"১

প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন ওঠে: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও ইতিহাস, এইগুলিকে অধ্যয়ন করে কি জগৎ সম্বন্ধে আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্থাৎ একটা সত্য বিশ্বদৃষ্টি জন্মায় না? এর উপর আবার দর্শন অধ্যয়ন করতে হবে কেন? একথা অবশ্যই ঠিক, এই সকল বিজ্ঞান পাঠ করে আমরা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু এরা আমাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্বদৃষ্টি দিতে পারে না, এমন এক বিশ্বদৃষ্টি যার একটি আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

দৈনন্দিন জীবনে জগৎ সম্বন্ধে একটা নিভুল ধারণা থাকা দরকার। সেটা লাভ করি মার্কসীয়-লেনিনীয় বিশ্বদৃষ্টি থেকে। তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসীয় দর্শন। সুতরাং এই প্রশ্ন, দর্শন বা ফিলসফি কাকে বলে?

ফিলসফি কথাটা দু'টি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত: 'ফিলীন'—মানে অনুরাগ এবং 'সোফিয়া'—মানে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন, প্রতিটি বিজ্ঞান থেকেই আমরা জ্ঞানলাভ করি এবং এই অর্থে প্রতিটি বিজ্ঞানই প্রজ্ঞা। তাহলে বলতে হয়, বিজ্ঞানমাত্রই দর্শন। কিন্তু সত্যই কি তাই?

একথা ঠিক, বিজ্ঞানমাত্রই জ্ঞানের উৎস। কিন্তু এই জ্ঞানের প্রকারভেদ আছে। প্রতিটি বিজ্ঞান বস্তুজগতের একটি বিশেষ শাখা সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে, যেমন, জ্যোতিষ—গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে; জীববিদ্যা—উদ্ভিদ্, পশু ও মানব

১ লেনিন, কলেক্টেড্ ওয়ার্কস্ খণ্ড ৮, পৃঃ ৩১৬

সম্বন্ধে; ইতিহাস—সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে। এই সকল বিজ্ঞান থেকে সমগ্র প্রকৃতি ও অখণ্ড বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানার্জন করি না। অথচ এই ধরণের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

যেমন ধরুন, জগৎ সম্বন্ধে আমরা পদে পদে নানা সামুদায়িক প্রশ্নের সম্মুখীন হই। জগৎ কি "সৃষ্ট" হয়েছিল অথবা তা শাশ্বত কাল ধরে বিরাজমান? প্রকৃতি কি স্বাভাবিক ভাবেই, অর্থাৎ রহস্যময়ী অতিপ্রাকৃত শক্তির লীলা ব্যতিরেকেই বিকাশলাভ করে? পদার্থবিদ্ অবশ্যই একথা জানেন যে, তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত বলে কিছুই নেই। কিন্তু তাঁর এই উপলব্ধি মূলতঃ তাঁর স্বকীয় গবেষণার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। চাই এমন এক জ্ঞান সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা যার অন্তর্ভুক্ত হবে অব্যতিক্রমে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান বলে যেগুলি পরিচিত সেগুলি থেকে আমরা এই জ্ঞান আহরণ করতে পারি না। এর জন্য দর্শনের শরণাপন্ন হতে হবে। দর্শনই কেবল প্রকৃতির ও সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে ব্যাপকতম প্রশ্নের অবতারণা করে এবং তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। এই থেকেই বোঝা যায় দর্শনের বিষয়বস্তু কি, অর্থাৎ কি কি প্রশ্ন দর্শনের পরিধিভুক্ত।

সুতরাং, দর্শনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পার্থক্য আছে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর, যাদের চর্চার ক্ষেত্র বস্তুজগতের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। এই পার্থক্য কী?

পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, জীববিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান এমন সব বিশেষ বিশেষ নিয়ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার একাংশের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সেই সব ব্যাপকতম বিধিই দর্শনের আলোচ্য যেগুলি প্রকৃতির, সমাজের ও চিন্তাজগতের সমস্ত ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের অংশমাত্রকেই নয়। সুতরাং দর্শনের সংজ্ঞানিরূপণ এই ভাবে করা যেতে পারে। **প্রকৃতির, সমাজের ও চিন্তার ব্যাপকতম বিধিগুলির বিজ্ঞানের নামই দর্শন**। এই কারণে দর্শন মানুষকে দেয় একটা বিশেষ বিশ্বদৃষ্টি, চারিপাশের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণা। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের মনে এত বিভিন্ন ধারণা দেখা যায় কেন?

দর্শনের পক্ষপাতিত্ব

পশ্চিম জার্মানির কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিশুদের একবার এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছিল: "আমি যদি যা খুশি করতে পারতাম, তাহলে আমি কি করতাম?" উত্তরে তার

কি লিখেছিল? একজন লিখেছিল : "পৃথিবীর যেখানে যত বিদ্যালয় আছে সব ভেঙে চুরমার করে দিতাম।" আর একজন লিখেছিল : "আমি সর্বত্র বোমা ফেলতাম...বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতাম ও নদীতে ঝাঁপ দিতাম।" একই প্রশ্নের জবাব সোভিয়েত বিদ্যালয়ের শিশুরা দিয়েছিল এই ভাবে : একজন লিখেছিল : "আমি পুঁজিপতিদের ও কারখানার মালিকদের দাসত্ব থেকে নিগ্রোদের মুক্তি দিতাম।" আব একজন লিখেছিল : "আমি প্রথমেই পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করে দিতাম।"

ছেলেমেয়েদের উত্তর এমন আলাদা রকমের হয় কেন? প্রথম দেশটিতে তারা শিখেছে মানুষকে অবজ্ঞা করতে এবং অনুপ্রাণিত হয়েছে বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির দ্বারা। দ্বিতীয় দেশটিতে তারা শিখেছে স্বদেশকে ভালবাসতে ও বিশ্বজোড়া শান্তির স্বপক্ষে দাঁড়াতে। সোভিয়েত বিদ্যালয়ে কমিউনিষ্ট বিশ্বদৃষ্টির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলা হয়।

জীবনের মানে কি, সুখ কাকে বলে, এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজে একরকম, বুর্জোয়া সমাজে অন্যরকম। শেষোক্ত সমাজে সব কিছুই কেনা বেচা হয় মুদ্রার বিনিময়ে। কাজেই মূলতঃ ধনই সুখ এবং অনেকের কাছে জীবনের মানেটাও তাইই। সঙ্কীর্ণমনা লোকদের ফিলিষ্টাইন দর্শনের গোড়া এইখানে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের লোকেদের কাছে এই ফিলিষ্টাইন দর্শন অগ্রাহ্য। তারা সুখ বলতে বোঝে, যাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করি তারা আমাকে সম্মান করবে, যে সমাজের হিতার্থে আমার জীবন উৎসৃষ্ট সেই সমাজ আমাকে মর্যাদা দান করবে। তাদের শ্রেষ্ঠ সুখ হলো এই অনুভূতি যে, সমূহের কাছে, স্বদেশের কাছে, নতুন সুখী জীবন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত লোকেদের কাছে আমার আবশ্যকতা আছে। মার্কস তাঁর গোড়ার দিকের এক রচনায় লিখেছিলেন : "অভিজ্ঞতা তাঁকেই সব চেয়ে সুখধন্য ব্যক্তির আসন দেয় যিনি বহুতম মানুষের জীবনে সুখ এনে দিয়েছেন।"

সুতরাং পুনরায় দেখছি দুই প্রশ্নাভিমুখিতা, দুই বিশ্বদৃষ্টি—বুর্জোয়া ও প্রলেটারীয়।

সমাজ যদি বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত হয় তাহলে সবারই বিশ্বদৃষ্টি এক ও অভিন্ন, এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। দেখা যাবে যে, এক শ্রেণীর এক দর্শন, অন্য শ্রেণীর

অন্য দর্শন। এটা খুবই সহজবোধ্য। প্রলেটারিয়েটের ও কর্মজীবী মানুষদের জীবন ও সামাজিক আসন এবং বুর্জোয়াদের ও শোষকদের জীবন ও সামাজিক আসন এক নয়। পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে দুই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া দুইরকম, প্রতিটি শ্রেণীই সেগুলিকে নিজের মতো করে দেখে। তাই তাদের বিশ্বদৃষ্টি বা দর্শনও আলাদা, প্রলেটারিয়েটের একরকম, বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যরকম। কোনো নিরপেক্ষ দর্শন নেই, এমন কোনো দর্শন নেই যা একটি বিশেষ শ্রেণীর ভৃত্য নয়।

লেনিন শিক্ষা দেন, দর্শনের সর্বদাই একটি দলীয় চরিত্র আছে, দর্শন দলীয় ও শ্রেণীগত স্বার্থের স্বপক্ষে দাঁড়ায়। তাই প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের দর্শনেই যুধ্যমান দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দর্শনে এমনতরো যুধ্যমান দল হলো একদিকে **মেটিরিয়ালিজম** অর্থাৎ বস্তুবাদ বা জড়বাদ এবং অন্য দিকে **আইডিয়ালিজম** অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদ বা ভাববাদ।

বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদ

এই দু'টি কথার অর্থ কি? পৃথিবীর নানা জিনিসের ও নানা ঘটনার উপর একবার চোখ বুলোনো যাক। পাথর, গাছ, জীবশরীর, জল প্রভৃতি দ্রব্যকে আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, চোখ দিয়ে দেখতে পারি, ওজন করতে ও মাপ করতে পারি, ইত্যাদি। এরা মানুষের চৈতন্যের বাইরে অবস্থিত, এদের অস্তিত্ব মানুষের চৈতন্যের উপর নির্ভরশীল নয়। এই সকল দ্রব্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত। কিন্তু অন্য একপ্রকার ঘটনা আছে, যেমন আমাদের চিন্তা ও কামনা, যেগুলিকে আমরা মাপ করতে বা ওজন করতে, দর্শন বা শ্রবণ করতে পারি না। এরা মানুষের চৈতন্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

সেইগুলিকে মেটিরিয়াল অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ ও ঘটনা বলা হয় যাদের অস্তিত্ব মানুষের চৈতন্যের ভিতরে নয়, বাইরে। তারা মানব-নির্ভর নয়, তারা বিষয়গত ভাবে বিদ্যমান, অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব বস্তুজগতে। মানুষ না থাকলেও তারা থাকত। কিন্তু অপর শ্রেণীর ঘটনাগুলি চৈতন্যলোকের অন্তর্ভুক্ত। তারা ভাবজাগতিক ঘটনা। তাদের মধ্যে পড়ে চিন্তা, অনুভূতি, কামনা,এষণা। মানুষের বাইরে এবং মানুষ থেকে আলাদা ভাবে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই যে দুই শ্রেণীর ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, সামগ্রিক ভাবে তাদের একটি হলো প্রকৃতি, জড়জগৎ এবং অন্যটি হলো চৈতন্য বা মন।

প্রকৃতি তথা জড়বস্তু সত্তা নামেও অভিধেয়। ভৌতিক ঘটনা ও মনোজাগতিক ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে কি ভাবে সম্পর্কিত? এই প্রশ্ন নিরন্তর আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রশ্নটিকে আমরা এইভাবে উত্থাপন করতে পারি: কোন্‌টি প্রাথমিক, কোন্‌টি অপরটির আগে? প্রকৃতি, জড়বস্তুই প্রাথমিক অথবা চিন্তা, বুদ্ধি, চৈতন্য? অনেক সময়ে প্রশ্নটিকে একটু ভিন্ন ভাবে উপস্থিত করা হয়, যথা: মন বা চৈতন্য থেকেই কি প্রকৃতি তথা জড়বস্তুর উদ্ভব হয়? অথবা প্রকৃতি, জড়বস্তু, সত্তা থেকেই মন বা চৈতন্য উদ্ভূত? এটাই **দর্শনশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্ন**। বিভিন্ন দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেন।

কেউ কেউ বলেন, জড়বস্তুই আদি ও প্রাথমিক, তার থেকেই মন বা চৈতন্যের উদ্ভব। এই সকল দার্শনিকদের বলা হয় **মেটিরিয়ালিষ্ট অর্থাৎ বস্তুবাদী**, কেন না তাঁরা শুরু করেন এইখান থেকে যে, যা কিছু অস্তিত্বশীল তার মূলে আছে জড়বস্তু। অন্যেরা বলেন, চৈতন্য বা মনই প্রাথমিক এবং প্রকৃতি, জড়বস্তু হলো গৌণ, সমুৎপন্ন। তাঁদের মতে আগে চৈতন্য পরে জড়বস্তু, প্রকৃতির একটা কোনো আধ্যাত্মিক বনিয়াদ আছে। এই সকল দার্শনিকদের বলা হয় **আইডিয়ালিষ্ট অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী**; তাঁরা মনে করেন, অস্তিত্বশীল সব কিছুরই মূলে আছে আইডিয়া অর্থাৎ কিনা চিৎ, অধ্যাত্মশক্তি। দার্শনিকেরা বস্তুবাদী শিবির ও বিজ্ঞানবাদী শিবির, এই দুই শিবিরে বিভক্ত। দর্শনশাস্ত্রের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এই দুই শিবির পরস্পরের বিরোধিতা করে এসেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৌলিক প্রশ্নটির নিষ্পত্তি কি ভাবে করতে হবে এটাই দার্শনিকদের দুই দলে বিভক্ত করে দিয়েছে। অধিকন্তু, জ্ঞানলাভের জন্য এক বিশেষ দার্শনিক কোন্‌ বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেন, তারও উপর বিশ্বসমীক্ষা ও বিশ্বোপলব্ধি নির্ভর করে।

জড়বস্তুকে বিচার করার জন্য কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বনীয়?

যে পদ্ধতির সাহায্যে বস্তুজগতের ঘটনাবলীর বিচার করা হয় তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "পদ্ধতি" কথাটা থেকেই তা বোঝা যায়। পদ্ধতি হলো ইংরাজিতে যাকে বলে "মেথড"; এর ব্যুৎপত্তি গ্রীক শব্দ "মেথডস" থেকে—যার মানে পথ, দিশা। আমরা যদি ঠিক পথে চলতে পারি তাহলে গন্তব্যস্থলে

পৌঁছুতে পারব। অন্যথা, আমরা পথভ্রষ্ট হবো এবং যেখানে যাওয়া উচিত সেখানে উত্তীর্ণ হতে পারব না।

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের নিজ নিজ অনুসন্ধান পদ্ধতি আছে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের শাখা বিশেষে তার স্বকীয় ঘটনাকে বোঝার জন্য নয়, আমাদের চারি পাশে বিশ্বচরাচরের পরিদৃশ্যমান সমগ্র বস্তুনিচয়ের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রশস্ত পথ কোন্‌টা, এটা জানাই একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রশ্নটা হলো বিশ্বদৃষ্টির। কল্পনা করুন, কেউ একজন বলছেন: "নতুন শস্যাবর্ত প্রথার সন্ধানে কাজ কি? পিতৃপুরুষেরা বরাবর যা করে এসেছেন অবিকল তাই করা যাক।" একথা শুনে নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন, কথাটা ঠিক নয়, মৃত্তিকা ও তার গঠন-বিন্যাস পূর্ব যুগে যেমন ছিল এখন আর তেমনটি নয়, অনেক বদল ঘটেছে। ভূমি কর্ষণের জন্য হরেক রকমের যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই মধ্যযুগে যে শস্যাবর্ত প্রথা প্রচলিত ছিল তাই নিয়েই আজকের দিনে আমরা খুশি থাকতে পারি না। সুতরাং ক্ষেত থেকে কি করে বেশি ফসল পেতে পারি তার জন্য নিত্যনূতন উপায়ের সন্ধানে থাকতে হবে। বিশ্ব সম্বন্ধে প্রতিটি ধারণার অন্তরালে রয়েছে এক বিশেষ বিচারপদ্ধতি, প্রাকৃতিক লীলার মুখোমুখি হওয়ার এক বিশেষ পথ। বিশ্বপরিচয়ের প্রথম পথ হলো জগৎকে অব্যয়, অস্থিভূত একটা কিছু বলে মনে করা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "মেটাফিজিক্যাল মেথড"১ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার-পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিটা বহির্বিষয়কে ও ঘটনানিচয়কে বিকাশমান ও পরিবর্তনশীলরূপে দেখে। এটাকে বলা হয় ডায়লেকটিক্যাল মেথড২ অর্থাৎ দ্বন্দসমন্বয়-পদ্ধতি।

১ মেটাফিজিকস—গ্রীক "মেটা টা ফিনিকা" থেকে—মানে, ফিজিকসের বা পদার্থবিদ্যার পরে। অ্যারিষ্টটলের রচনার প্রথম অংশের নাম ছিল ফিজিকস; পরের অংশে তিনি কাল্পনিক চিন্তায় নিযুক্ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এই অংশের নাম রাখেন মেটাফিজিকস। পরবর্তীকালে এর মানে দাঁড়ায় ডায়ালেকটিকসের বিরোধী একটা জ্ঞানমার্গ।

২ ডায়ালেকটিস—গ্রীক "ডায়ালেগো" থেকে—মানে কথোপকথন, তর্ক করা। প্রাচীন কালে ডায়ালেকটিকস বলতে বোঝাত বাদ-বিচার, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর তর্কবিচারে যে অন্তর্বিরোধ আছে তার আবিষ্কার এবং সেই

এই দুই পদ্ধতির কোন্‌টি বৈজ্ঞানিক? তত্ত্ববিচার-পদ্ধতি ধরে নেয় যে, সূর্য, পর্বতমালা, নদনদী, সপ্তসিন্ধু, সবই কোটি কোটি বছর আগে যেমনটি ছিল আজো ঠিক তেমনই আছে। এই পদ্ধতি পরিদৃশ্যমান বস্তুনিচয়কে আলাদা আলাদা, পরস্পরের সঙ্গে অসংস্পৃক্ত, ভাবে দেখে। এটাই তত্ত্ববিচার-পদ্ধতির সারমর্ম। অতীতে বস্তুবাদও এই পদ্ধতির উপাসক ছিল; তাই তার নামকরণ হলো "তত্ত্ববিচারমূলক বস্তুবাদ"।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সম্বন্ধে এই তত্ত্ববিদ্যাগত ধারণার ক্রমশই বেশি বেশি ঠোকাঠুকি বাধতে লাগল। তত্ত্ব-বিচারমূলক ধারণায় প্রথম ফাটল ধরাল জার্মান দার্শনিক কাণ্ট ও ফরাসী জ্যোতির্বিদ্‌ লাপলাসের সৌরজাগতিক প্রকল্প। তাঁরা দেখালেন, জড়বস্তুর সুদীর্ঘকালব্যাপী বিকাশের ফলেই পৃথিবী ও সৌর জগতের উৎপত্তি ঘটেছিল। আরো পরে, ভূ-বিজ্ঞানও সমর্থন করল যে, পৃথিবী বিবর্তনের ফল।

ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে উদ্ভূত এই বিশ্বের যে একটা সমগ্রত্ব আছে, তার বিভিন্ন অংশ যে যোগসূত্রের দ্বারা গ্রথিত, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে খুব বড় করে তুলল তিনটি বিরাট বিরাট আবিষ্কার। মহীয়ান ইংরাজ প্রাণিবিৎ চার্লস ডারউইন দেখালেন যে, পৃথিবীতে জন্তুর ও উদ্ভিদের যে সব উপজাতির সাক্ষাৎ পাই তারা আজ যেমনটি দেখতে চিরকালই ঠিক তেমনটি ছিল না। বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা আজকের আকার লাভ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল জান্তব ও উদ্ভিদীয় জীবশরীরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষের দ্বারা গঠিত— তাদের মধ্যে ঘটে জটিল প্রাণক্রিয়া। জীবশরীরের অভিব্যক্তিকে ঠিক মতো বোঝার ভিত্তি এই ভাবে রচিত হলো। তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিকেরা শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তরের নিয়ম আবিষ্কার করলেন। এটা প্রমাণিত হলো যে, গতিক্রিয়া অসৎ বা শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, তেমনি আবার তা অসতে বিলীন হতে পারে না। গতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপগুলি একটি অন্যটিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ গতিশীল জড়বস্তু শাশ্বত ও অবিনশ্বর। বিকাশ তত্ত্বের পক্ষে এটা একটা বিরাট জয়লাভ।

কার্ল মার্কস (১৮১৮—১৮৮৩) এবং ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (১৮২০—১৮৯৫),

অন্তর্বিরোধ দূর করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। পরে বাস্তব সত্যকে অবধারণ করার একটা পদ্ধতিকে এই নাম দেওয়া হয়।

এঁরা যে নুতন দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিকে সম্যক ভাবে ব্যাখ্যা করলেন তার বিজয়াভিযানের জন্য পূর্বাবশ্যক ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল আবিষ্কার।

দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বিশ্বদৃষ্টির একটার পর একটা জয়লাভ ঘটতে লাগল। বিকাশ-নীতিকে অস্বীকার করা তত্ত্ববিদ্যার পক্ষে ক্রমশই আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর তত্ত্ববিদ্যার একটা চারিত্রিক লক্ষণ হলো বিকাশের আপাত—"স্বীকৃতি"। মূলতঃ অবশ্য তত্ত্ববিদ্যা বিকাশনীতিকে সর্বদাই অস্বীকার করে কেননা বিকাশ বলতে তা বোঝে শুধুই সরল চক্রাবর্তন, তার ভিতর দিয়ে নতুন কোনো কিছু আবির্ভূত হতে পারে না। বস্তুর স্বদেহেই যে বিকাশের উৎস, একথা তত্ত্ববিদ্যা অস্বীকার করে। তত্ত্ববিদ্যার চোখে বস্তুর বা ঘটনার বাইরেই তাদের বিকাশের কারণ অবস্থিত—কোনো দেবতায়, উপদেবতায় বা কোনো মনোগত ধারণায়। তাই দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার ও তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ।

দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা বিকাশকে এমন একটা প্রক্রিয়া রূপে দেখে যার ফলে সত্যকার পরিবর্তন দেখা দেয়, পুরাতন যেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নুতনের জন্মলাভ ঘটে, যেখানে ঘটনাপরম্পরা চক্রাকার নয়, বরং যেখানে ঘটনার নুতন গুণাবলী উদিত হয়।

তত্ত্ববিদ্যার চোখে বিশ্ব হলো আকস্মিক বস্তুনিচয়ের ও প্রক্রিয়াবলীর সমাবেশ। অন্যদিকে দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা বিশ্বকে একীভূত, অন্তর্যোগশীল, সমগ্র রূপেই দেখে, এই সকল যোগসূত্রকে অনুধাবন করে, সার ও অসার, মৌল ও আকস্মিক যোগসূত্রগুলির পৃথক্‌করণ করে।

বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করা হবে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়-বিদ্যার নিয়ম ও মূলপ্রত্যয় সম্বন্ধে আলাপে। তখন আপনাদের দেখানো হবে যে, ঘটনাবলী কখনও ছাড়া ছাড়া ভাবে বিদ্যমান থাকে না, সর্বদাই তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল। বিশ্বকে বোঝা যাবে না যদি তত্ত্ববিদ্‌দের মতো বিভিন্ন ঘটনাকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন বলে মনে করি।

উপরে যা বলা হয়েছে তার থেকে আমরা এই সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারি: **দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা হলো প্রকৃতির, মানবসমাজের ও চিন্তার গতিক্রিয়া**

ও বিকাশের সামান্যতম নিয়মাবলীর বিজ্ঞান, বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার সর্বময় সম্পর্কের বিজ্ঞান। এই কারণে তা তত্ত্ববিদ্যার ঠিক বিপরীত।

বস্তুবাদের ও বিজ্ঞানবাদের সংঘাত কেন অবশ্যম্ভাবী?

সকল মূল সমস্যার সম্মুখীন হলেই বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সংঘাত চোখে পড়ে। ধর্মকে তারা কি চোখে দেখে? এঙ্গেলস বলেছিলেন, দর্শনের মৌল প্রশ্নকে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে: ঈশ্বর কি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছিলেন অথবা বিশ্বের অস্তিত্ব নিত্য ও শাশ্বত? বস্তুবাদীরা ও বিজ্ঞানবাদীরা এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উল্টো উত্তর দিয়েছেন।

বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, ধারণার বা চিন্তার দ্বারা উদ্ভূত হয়েই বিশ্বের সৃষ্টি ঘটেছিল। ধর্ম এইকথা বলে যে, ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার আগে জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই দুই মত মূলতঃ একই। বিজ্ঞানবাদ শুধু "ঈশ্বর"-এর জায়গায় "ধারণা" শব্দটি বসিয়ে দেয়। বিজ্ঞানবাদ ও ধর্ম অবশ্য সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়; তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তাদের মিল এইখানটায় যে, তারা উভয়েই সব কিছুর মূল হিসাবে একটা জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক কারণের অবতারণা করে। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। লেনিন বলেছিলেন: "বিজ্ঞানবাদ হলো পুরোহিততন্ত্র"। ধর্মের ভিত্তিস্থাপক ও অনুমোদক রূপে বিজ্ঞানবাদ উদ্ভূত হয় ও বিরাজ করে।

অন্যদিকে বস্তুবাদ শিক্ষা দেয় যে, জড়বস্তু, প্রকৃতি নিত্যকাল বিরাজ করছে। তার কোনো স্রষ্টা নেই। জগদ্বিকাশের এই ধারণায় কোনো স্বর্গীয় পরা শক্তির, কোনো ঈশ্বরের স্থান নেই। ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই; ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ বিনাই জগতের বিকাশ ঘটে এসেছে। সুতরাং বস্তুবাদের মানে হলো সর্বপ্রকার ঈশ্বরের অস্বীকৃতি এবং তা নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকবে; বস্তুবাদী হলে অবশ্যম্ভাবী রূপে নিরীশ্বরবাদী হতেই হবে। ধর্মীয় অন্ধসংস্কার মানুষকে নির্ভুল বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিতে উপনীত হতে বাধা দেয়।

বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদ অন্যান্য সকল মুখ্য সমস্যাকেই বিপরীত দিক থেকে দেখে। আমরা এ কথা জানি যে, শোষণমূলক সমাজ বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত। এ বিষয়ে বস্তুবাদীরা ও বিজ্ঞানবাদীরা কি মনোভাব পোষণ করেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বিজ্ঞানবাদীরা যে সব দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলি "পার্থিব অহং বোধ"-এর এবং দলগত ও শ্রেণীগত সংঘর্ষের

অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যেমন ধরুন, মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম ভোৎ মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে আছে কোটি কোটি "অপ্রয়োজনীয়" লোক। সুতরাং একটা পারমাণবিক যুদ্ধ চাই, নইলে লোকবাহুল্য দূর হবে না। তিনি তাদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়েছেন যারা একটা প্রলয়ংকর যুদ্ধ বাধাতে চায়।

আরো অনেক বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক চান কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ। এই ভাবে তাঁরা পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পুঁজিপতিদের সাহায্য করেন। এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা কর্মজীবী মানুষদের বারণ করেন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে। তাঁরা দাবী করেন যে, তাঁদের তত্ত্বগুলি অ-রাজনৈতিক এবং বলে থাকেন: "রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব নেই"। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝিবা এইসব বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা সত্যসত্যই শ্রেণীগত ও দলগত সংঘর্ষ থেকে দূরে আছেন। কিন্তু সহজেই বোঝা যায়, এটা শুধু তাঁদের সত্যকার অভিসন্ধির একটা আবরণ। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা যখন "নিরপেক্ষতা", "নির্দলীয়তা" প্রভৃতি বুলি আওড়ান তখন শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি তাঁদের উপদেশটা দাঁড়ায় এই: "পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরো না।" তাতে লাভ হয় শুধু পুঁজিপতিদের ও শোষকদের। দেখা যাচ্ছে যে, শোষণ থেকে সুরু করে ধর্ম ও যাজকতন্ত্র পর্যন্ত যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে, অচল, সবই বিজ্ঞানবাদের সমর্থন লাভ করে।

বিজ্ঞানবাদের প্রতিপক্ষরূপে বস্তুবাদ বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির স্বার্থকে রূপায়িত করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল, বিগতকালীন শ্রেণীগুলির স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে। বিজ্ঞানবাদ যদি হয় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির কেতন, তাহলে বস্তুবাদ প্রগতিশীল, অগ্রণী শ্রেণীগুলির কেতন। একথা অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, কথাটাকে অতি সরল করে ফেলা ঠিক হবে না, কথাটার মধ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ও গতায়ু, বিজ্ঞানবাদীরা অবস্থা নির্বিশেষে সর্বদা তার পক্ষালম্বন করেন এবং বস্তুবাদীরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির স্বার্থকে প্রকাশিত করেন। যেমন ধরুন, প্রাচীন যুগের বস্তুবাদী দার্শনিক হেরাক্লিটাস দাসপ্রভুদের স্বার্থকে সমর্থন করেছিলেন, এথেনীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, এমন কি যুদ্ধেরও সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

অন্যদিকে, সমসাময়িক ইংরাজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল শান্তির একজন সক্রিয় সমর্থক যদিও তাঁর দর্শন বিজ্ঞানবাদী।

যখন আমরা বলি যে, বিজ্ঞানবাদ পুরাতন, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির স্বার্থের দ্যোতক এবং অন্যদিকে বস্তুবাদ প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির স্বার্থের দ্যোতক, তখন আমরা দর্শনশাস্ত্রের বিকাশের মূল ঐতিহাসিক প্রবণতারই উল্লেখ করি। এই দিক থেকে বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় যে, বস্তুবাদীরা যখন নিজেদের তত্ত্বাবলীকে বস্তু জগতের উপর, বাস্তব জীবনের উপর দাঁড় করান তখন তাঁরা হয়ে পড়েন অগ্রনী প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির সেবক। অন্যদিকে, বিজ্ঞানবাদ যখন তার তত্ত্ববিস্তারে সত্যকে বিকৃত করে, তখন তা বিগতকালীন, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির স্বার্থের সেবা করে, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবাদী প্রবক্তার অভিপ্রায় যাই হোক না কেন। এই অর্থে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সংঘর্ষ শ্রেণী সংগ্রামের ব্যঞ্জক।

এই সংগ্রামে দার্শনিকদের পক্ষে যুধ্যমান কোন পক্ষকে বা দলকে সমর্থন না করা, নিরপেক্ষ থাকা, অসম্ভব। যাঁরা বলেন, "আমরা বস্তুবাদীও নই, বিজ্ঞানবাদীও নই, আমরা এই সব দলের 'ঊর্ধ্বে'," লেনিন তাঁদের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন। তিনি এই সব দার্শনিকদের আখ্যা দিয়েছিলেন, "হেয় মধ্যপন্থী দল।" এঁরা দেখাতে চেষ্টা করেন যে, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সংঘাত সেকেলে হয়ে গেছে এবং আজ আর দার্শনিকদের বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানবাদী, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যায় না। লেনিন এই প্রচেষ্টাকে খণ্ডন করেছিলেন। সমকালীন সংশোধনবাদীরা১ এই মধ্যপন্থী ধারণার অত্যুৎসাহী সমর্থক। দর্শন পক্ষাবলম্বী, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সংগ্রাম আপসহীন, এই মার্কসীয় নীতি ও সিদ্ধান্তকে তাঁরা প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেন। তাঁরা বলেন যে, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মতভেদ তিরোহিত হচ্ছে। এই ধরনের উক্তির দোষ সহজেই বোঝা যায় যদি মনে রাখি যে, বুর্জোয়া সমাজ পরস্পরের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সংগ্রাম ক্ষান্ত হতে পারে না। সুতরাং বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের লড়াইয়ের বিরতি অসম্ভব ঃ যেহেতু তা শ্রেণীসংগ্রাম থেকেই উৎপন্ন। অতএব প্রতিটি দর্শনই একটি বিশেষ

১ সংশোধনবাদ হলো বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রধান প্রধান শিক্ষাগুলির সংশোধনের দ্বারা মার্কসবাদের বিকৃতিসাধন।

শ্রেণীস্বার্থের ব্যঞ্জনা। কথাটা মার্কসবাদ সম্বন্ধে কতদূর সত্য?

মার্কসবাদ কাকে বলে এবং কাদের স্বার্থকে প্রকাশ করে?

যে যুগে (ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে) মার্কসবাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, এক নতুন বিপ্লবী শ্রেণী বা প্রলেটারিয়েট—আবির্ভূত হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম অবশ্য আগেই ঘটেছিল কিন্তু চল্লিশ দশকে দেখা গেল, ওই শ্রেণী একটা বলিষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি রূপে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যেই তা জোর গলায় নিজের অধিকার দাবী করতে লেগে গেছে। তার তদানীন্তন ক্রিয়াকলাপই এর প্রমাণ। শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম বড় রকমের সংগ্রাম ছিল: ব্রিটেনে চার্টিষ্ট আন্দোলন[১] এবং ফ্রান্সে ত্রিশ দশকে লিয়ঁ তন্তুবায়দের বিদ্রোহ। জার্মানিতেও শ্রমিক শ্রেণী পর পর অনেকগুলি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই সব লড়াই ছিল উত্তিষ্ঠমান নতুন শ্রেণীর, প্রলেটারিয়েটের, বিপুল শক্তির সাক্ষ্যস্বরূপ। দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গ ঘটেছিল কিন্তু জয়লাভের জন্য কেবল এইটুকুই যথেষ্ট ছিল না। দরকার ছিল এই অমিত শক্তিকে ঠিক মতো প্রয়োগ করার। শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল ঠিক পথে চলার। কিন্তু কোনটা ছিল ঠিক পথ?

এক পথ শ্রমিক শ্রেণী অবলম্বন করতে পারত, পুঁজিবাদের সঙ্গে ছোট-খাটো সংঘর্ষের পথ, অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত খণ্ডযুদ্ধের পথ—যার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই, কোনো নেতৃত্ব নেই।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম একটা সংঘবদ্ধ চরিত্র লাভ করবে এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণীর মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে, এর জন্য শ্রমিক শ্রেণীর হাতে কোন্ জিনিষটার অভাব ছিল? একটা বিপ্লবী তত্ত্ব—সেদিন এইটারই অভাব ছিল। লেনিনের বাণী স্মরণ করা যাক: "একটা বিপ্লবী তত্ত্ব বিনা কোনো বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়।" শ্রমিক শ্রেণী চায় পুঁজিবাদী দাসত্বের জোয়াল কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে। তার মনে আছে একটা নতুন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করার মহৎ কামনা। কিন্তু

---

১ চার্টিজম—১৮৩৬-৪৮ সালের ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলন; তার লক্ষ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারের আদায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন।

এই লক্ষ্যসিদ্ধির পথ খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। একটা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব সৃষ্ট হওয়া দরকার ছিল। মার্কসবাদ প্রলেটারিয়েটকে ও শ্রমজীবি জনসাধারণকে সেই তত্ত্ব দান করল।

শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টি রূপে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের সৃজনের মানে ছিল এমন এক নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি যা দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ, এই বিদ্যাত্রয়ীর একীভূত সমন্বয় রূপ! একথা ঠিক যে, মার্কসবাদের আবির্ভাবের পূর্বেও বহুতর দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাদের কোনো অঙ্গাঙ্গী ঐক্য গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়তঃ, তারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে প্রকাশ করেনি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের তাত্ত্বিক ভিত্তি রূপে কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অবশ্য তার অর্থ এমন নয় যে, মার্কবাদের আগে কোনো প্রগতিশীল দার্শনিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব দেখা দেয় নি। লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, মার্কসবাদের তিন অঙ্গের তিন উৎসঃ জার্মানির ক্লাসিকাল বা চিরায়ত দর্শন, ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল অর্থনীতি এবং ফ্রান্সের ইউটোপীয় সমাজবাদ। এই সব তত্ত্বের স্রষ্টাদের মতবাদ প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক ছিল না। ধরুন যেমন ফ্রান্সের ইউরোপীয় সমাজবাদীদের তত্ত্বচিন্তা। এইসব তত্ত্বের প্রবর্ত্তকদের মতবাদ যথার্থভাবে বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসী ইউটোপীয় সমাজবাদীদের তত্ত্বের কথা ধরা যেতে পারে। ইউটোপীয়া বলতে বোঝায় একটা কাল্পনিক স্বর্গলোক, একটা অবাস্তব মনোমরীচিকা। এই ছিল তাঁদের তত্ত্বের চরিত্র। এর একটা উদাহরণ এই যে, তাঁরা কারখানার মালিকদের প্রণোদিত করতে চেষ্টা করেছিলেন যাতে মালিকেরা নিজেদের কারখানাগুলি শ্রমিকদের দান করেন। এই পরিকল্পনার কোনো সুফল ফলেনি। ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব আকাশকুসুমই রয়ে গেল।

শ্রমিকশ্রেণীর মহান্ শিক্ষক, মার্কস ও এঙ্গেলস, এই শ্রেণীর জন্য একটা সত্যকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। তার নাম মার্কসবাদ। **মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের দ্যোতক ও তার তত্ত্বগত হাতিয়ার।** মার্কসবাদ দার্শনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রাজনৈতিক মতামতের একটী একীভূত ও সুসঙ্গত সমষ্টি। লেনিন দেখিয়েছিলেন, মার্কসবাদের তিন অংশ আছেঃ দর্শন, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ।

মার্কসবাদের শ্রেণীভিত্তিকে যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছি তাই সহজেই বোঝা যায় যে, কেবল বস্তুবাদী দর্শনই মার্কসবাদের বনিয়াদ হতে পারে।

দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বস্তুবাদই মার্কসবাদের দর্শন

আপনারা ইতিপূর্বেই দেখেছেন যে, জগতের বিজ্ঞানবাদী ব্যাখ্যাটা আগাগোড়াই মায়াজাল; তা বিশ্বঘটনার বিকৃতিসাধন করে। এমনতরো দর্শনের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী কোনো সম্পর্ক রাখতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণী চায় মেহনতী মানুষের জন্য প্রকৃষ্টতর জীবন গড়ে তুলতে। তা চায় বিশ্বজগৎ প্রকৃতই ঠিক যেমনটি তেমনি করে তাকে বুঝতে। সর্বপ্রকার কুহক ও বিকৃতি বাদ দিয়ে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানবাদ ঠিক পথ দেখাতে পারে না। কিন্তু বস্তুবাদ পারে। জগৎ সত্যই যেমন, সেই ভাবেই বস্তুবাদ তার সমীক্ষণ করে। মার্কসবাদেরও গোড়ায় আছে নির্ভেজাল বাস্তব জীবন। তাই কেবল বস্তুবাদী দর্শনই তার তত্ত্বগত ভিত্তি হতে পারে।

মার্কসবাদের আবির্ভাবের পূর্বেই বস্তুবাদ বিদ্যমান ছিল। সেটা কিন্তু ছিল তত্ত্ববিচারমূলক বস্তুবাদ। মার্কস এবং এঙ্গেলস একটি নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন—দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ। বিশ্ব শাশ্বত ও নির্বিকার, এই তত্ত্ববিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদের কাছে অগ্রাহ্য। সদ্‌বস্তু নিত্যই বিকাশমান ও পরিণামশীল। মার্কসবাদের সমস্ত তত্ত্বে ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকাণ্ডে জীবনের স্বকীয় পরিবর্তনশীল চরিত্রই প্রতিফলিত হয়। স্বভাবতই মার্কসবাদ একটা বিপ্লবী তত্ত্ব। কিন্তু বুর্জোয়া দার্শনিকেরা আজ তত্ত্ববিদ্যাকে আঁকড়ে ধরে আছেন কেননা তাঁরা ঐতিহাসিক বিকাশের ধারাকে স্তব্ধ করতে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে চান। তাই বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা অর্থাৎ বিকাশবিজ্ঞানই বস্তুজগতের সমীক্ষার ও রূপান্তরসাধনের মার্কসীয় পথ।

অতএব, **বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বসমন্বয় পদ্ধতি, এই দুইটির মিলনে ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গঠিত হয়েছে মার্কসবাদী তত্ত্ব ও বিচার পদ্ধতি।** এই কারণে মার্কসবাদের দর্শনকে বলা হয় দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এটা যুগপৎ একটা দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টি এবং একটা বিচার-পদ্ধতি। মার্কসবাদই কর্মজগতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের দিগদর্শন ও ধ্রুবতারা।

মার্কসবাদ কেন মেহনতী মানুষের দিগদর্শন ও ধ্রুবতারা

নাবিকেরা একদা নক্ষত্র দেখে নিজেদের গতিনির্ণয় করত। তাই 'ধ্রুবতারা' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। যখন দিগদর্শন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় তখন দিশা নির্ণয়ের জন্য সেটি ব্যবহৃত হতো। মার্কসীয় দর্শনশাস্ত্র দিগ্‌দর্শনের ও ধ্রুবতারার সঙ্গে তুলনীয় কেননা তা শ্রমিক শ্রেণীকে, কমিউনিষ্ট পার্টিকে ও সকল মেহনতী মানুষকে দেখিয়ে দেয় তাদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু দিগ্‌দর্শন ভাল হওয়া চাই, নচেৎ তা আমাদের বিপথগামী করবে।

সমাজঘটিত ব্যাপারে পথনির্ণয়ের জন্য নির্ভুল দিগ্‌দর্শনের প্রয়োজন আরো বেশি। প্রসিদ্ধ নিগ্রো গায়ক পল রোবসন কথাচ্ছলে বলেছেন যে, তিনি একবার এক ছাত্র সমিতির সভ্য ছিলেন; সমিতির মূলমন্ত্র ছিল: "দর্শনই জীবনের দিশারী"। "কিন্তু", রোবসন বলছেন, "দেখা গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দর্শন শেখানো হতো তা জীবনের যথোপযুক্ত দিগ্‌দর্শন নয়··· এই কানা গলি থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগলাম কিন্তু কোন পথই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে যখন মার্কস ও লেনিনের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হলাম তখনই কেবল এমন একটা দার্শনিক চাবিকাঠি পেয়ে গেলাম যা সত্যই আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।"

মার্কসীয় দর্শনকে এই অর্থে একটা দিগ্‌দর্শন ও ধ্রুবতারা বলা যায় যে, ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বদাই মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে মার্কসীয় দর্শন কর্মের পথপ্রদর্শক—কথাটার মধ্যে কোনো অত্যুক্তি নেই। একটা উদাহরণ দিই। ইতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় ঘটেছিল ১৯১৭ সালে। অমনি তার সামনে এই কঠিন ও গুরু সমস্যা উপস্থিত হলো, কি করে সমাজতন্ত্রকে গড়ে তোলা যায়। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পার্টি মার্কসীয় তত্ত্বের অন্যতম প্রধান সূত্রের দ্বারা চালিত হলো, যথা, অর্থনীতিব্যবস্থাই দেশের বিকাশের নির্দেশক কারণ। যদি দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে কারখানা নির্মিত না হয়, যদি ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তিগত কৃষিকার্য চলতে থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নীতির দ্বারা চালিত হয়ে ঠিক পথ খুঁজে পাওয়া গেল। শিল্পায়ন, কৃষির সমূহীকরণ ও শোষক শ্রেণীগুলির উচ্ছেদসাধন, এই পথেই সোভিয়েত জনগণ সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করল। ১৯১৯ সালে কমিউ-

নিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত দ্বিতীয় কর্মস্থচীতে সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের এই পথ নির্ধারিত হলো।

ওই একই কথা সোভিয়েত সমাজের বর্তমান যুগ অর্থাৎ সাম্যবাদ গড়ে তোলার যুগ সম্বন্ধেও বলা চলে। সাম্যবাদী সমাজস্থষ্টির পথিকৃৎ হওয়ার, সমাজ বিকাশের নতুন পথ কাটার ঐতিহাসিক ভূমিকা সোভিয়েত দেশের লোকদের উপর অর্পিত হয়েছে। এখানেও মার্কসীয় তত্ত্বই পথপ্রদর্শক।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ বস্তুবাদী ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছিলেন, নির্ভুল তত্ত্ব লণ্ঠনের মতো, পথিকের অন্ধকার পথকে তা আলোকিত করে। যে বৈজ্ঞানিকের হাতে নির্ভুল তত্ত্বের আলো নেই তিনি এমন এক পথিকের মতো যে অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত জনগণকে একমাত্র নির্ভুল পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি এর প্রমাণ। সাম্যবাদী সমাজ গড়তে হলে প্রথমে তার ভিত্তিস্বরূপ যন্ত্রাদি ও উৎপাদনকলা স্বষ্ট হওয়া চাই। তার মানে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার, তার শিল্পের ও কৃষির বিকাশ, যাতে করে সাম্য-বাদের নীতিকে কার্যকর করার জন্য যা কিছু দরকার সবই সোভিয়েত জনগণ নিশ্চিত ভাবে পায়। নীতিটা হলো: "প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমতা অনু-সারে; প্রত্যেককে প্রয়োজন অনুসারে।" এই সরল অথচ গভীর সূত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশতি-তম কংগ্রেসের নূতন কর্মস্থচীর সকল মুখ্য ধারার তলে। এই কর্মস্থচী সমগ্র ও পূর্ণ ভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের উপর স্থাপিত। এ ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্বকে ঠিক লণ্ঠনের সঙ্গে তুলনা না করে বরং সন্ধানী আলোক, নির্দেশবর্তিকা ও দিগ্-দর্শন যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

উপরে যা বলা হয়েছে তা যে-সব সংশোধনবাদীরা নিন্দাচ্ছলে বলে যে, মার্কসবাদ "সেকেলে" হয়ে গেছে, তাদের মুখোশ খুলে দেয়। মার্কসবাদ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ও কর্মজীবী মানুষদের কমিউনিষ্ট পার্টির সংগ্রামে শক্তিশালী অস্ত্র। এর আবির্ভাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি প্রকৃত বিপ্লবের সূচনা করল।

দ্বিতীয় আলোচনা
প্রাক-মার্কসীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মার্কসবাদের আবির্ভাব—দার্শনিক চিন্তাধারায় বিপ্লব

মার্কসবাদ সমাজবিজ্ঞানের যে বিপ্লব সাধিত করেছিল তার চরিত্রকে বুঝতে গেলে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রধান প্রধান পর্যায় সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত জানা দরকার, কেননা মার্কসবাদ পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তার প্রশস্ত রাজপথেরই পথিক, সেখান থেকে দূরে অপরিচিতের মতো তার সাক্ষাৎ পাই না। কথাটা লেনিনই বলেছিলেন। পূর্বেকার দার্শনিক চিন্তার মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের কীর্তিরাজি, সবই মার্কসবাদ পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে।

দাসসমাজে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সংঘাত

বিশ্ব সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা শুরু হয় সুদূর অতীতের দাসসমাজে প্রাচীন প্রাচ্যখণ্ডে—চীনে, ভারতবর্ষে, মিশরে। অতীত প্রাচ্যের এই জগচ্চিন্তা থেকেই জন্মলাভ করে পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক তত্ত্বাবলী। যেহেতু জগচ্চিন্তার জন্য হয় বস্তুবাদী নয়ত বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিতে হবে, তাই সম্পূর্ণ বিরোধী স্বার্থের দ্যোতক এই দুই চিন্তাধারার সুতীব্র সংঘাত গোড়া থেকেই চোখে পড়ে। দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতি পর্বেই এই সংঘাত অবিরাম চলে এসেছে।

দাসসমাজের যুগে প্রাচীন গ্রীসেই দর্শনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে। এঙ্গেলস যে মতবাদের নাম দিয়েছিলেন আদিম স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ তা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীসেই উদ্ভূত হয়। এই তত্ত্বের জনকেরা মনে করতেন, সমগ্র বিশ্বজগতের মূলে আছে একটা ভৌতিক পদার্থ। দার্শনিক থেলিস (খ্রীঃ পূঃ ৬২৪-৫৪৭) মনে করতেন, বিশ্বের "আদি ভূত" হলো অপ্ বা জল; তাঁর শিষ্য আনাক্-

মিয়েনিস (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) বললেন, বায়ুই আদি ভূত। কিঞ্চিৎ অপরিপক্ক মতবাদ কিন্তু মূলতঃ সত্য, যেহেতু এই দার্শনিকদের বিচারে জগৎ কোনো ঐশী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় নি, তার মূল কারণ প্রাকৃতিক, জড়বস্তুগত।

দার্শনিক **হেরাক্লিটাস** (খ্রীঃ পূঃ ৫৪০-৪৮০) এই মতবাদের আরো বিস্তারসাধন করলেন। তিনি লিখলেন, জগৎ ঈশ্বর বা মানুষ কারো দ্বারাই সৃষ্ট নয়, জগৎ নিত্যকাল বিরাজ করছে এবং করবে। হেরাক্লিটাসের মতে বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যের মূলে হলো 'শাশ্বত প্রাণময় অগ্নি'। হেরাক্লিটাস বললেন: "সর্বপদার্থের সংযোজনে একীভূত এই জগৎকে কোনো দেবতা বা মানুষ সৃষ্টি করে নি ; প্রাণবান অবিনশ্বর হুতাশন রূপে নিয়মিত ভাবে প্রজ্জ্বলিত ও নিয়মিত ভাবে নির্বাপিত হয়ে জগৎ নিত্যকাল ছিল, আছে ও থাকবে।" "লেনিন হেরাক্লিটাসের এই তত্ত্বের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, আমরা এর মধ্যে পাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্রগুলির সুন্দর ব্যাখ্যা।*

হেরাক্লিটাস দ্বন্দ্ব সমন্বয়-পদ্ধতির অন্যতম স্রষ্টা। তিনিই এই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন: "সবই প্রবহমান, সবই পরিবর্তনশীল।" জগৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সর্বদাই তা বিকাশমান। বিপরীতের সংঘর্ষের ফলেই বিশ্বের বিকাশ ঘটে,, হেরাক্লিটাসের এই অনুমান একটা পরম বিস্ময়। মার্কস-বাদ—লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা হেরাক্লিটাসের মতবাদকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন।

ডিমক্রিটাস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৭০) যে দর্শন রচনা করলেন সেটাই প্রাচীন বস্তুবাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই পুস্তকে একাধিকবার আমরা তাঁর তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাব। তিনিই জড়দ্রব্যের পরমাণু-সংযোগ তত্ত্বের প্রবর্ত্তন করেন ; বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক সমর্থন লাভ করার জন্য এই বিস্ময়কর তত্ত্বকে আড়াই হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

ডিমক্রিটাসের মতে, জগতের যাবতীয় পদার্থের মূলে রয়েছে পরমাণুরাশি ও শূন্য দেশ। তিনি ধারণা করেছিলেন, পরমাণুগুলি অবিভাজ্য জড়কণা, তাদের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই, কিন্তু আকারগত পার্থক্য আছে। তারা শূন্যে অবিরাম গতিশীল, কখনও সংযুক্ত ও কখনও বিযুক্ত হয় এবং এইভাবে ঘটায় পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্বলীলা। পরমাণুর নিয়মানুগ গতিক্রিয়ার ফলেই

---

*লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস্ খণ্ড ৩৮ পৃঃ ৩৪৭

বিশ্বের সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত হয়।

ডিমক্রিটাসের মতে, "কারণ বিনা কিছুই উদ্ভূত হয় না, প্রতিটি সদ্বস্তুর উদ্ভব ঘটে কোনো একটা মূল কারণ থেকে আবশ্যিক ভাবে।" এই ধরণের জগদ্ভাবনায় অতিপ্রাকৃত, ঐশী শক্তির কোনো স্থান নেই, সব কিছুরই একটা বস্তুগত কারণ বিদ্যমান। তাই এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, বিজ্ঞানবাদীরা এবং বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) ডিমক্রিটাসের দর্শনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে, দর্শনের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের যে সংঘর্ষ দেখতে পাই তাকে 'ডিমক্রিটাসের মার্গ' (বস্তুবাদ) ও 'প্লেটোর মার্গ' (বিজ্ঞানবাদ), এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব বলে মনে করা যেতে পারে।

প্লেটো বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন: একদিকে "শাশ্বত সারসত্তার", আইডিয়ার বা ভাবের—জগৎ; অন্যদিকে "পরিণামী বস্তুদ্রব্যের" জগৎ। তাঁর মতে ভাবরাজিই "প্রকৃত সত্তা"; তারা প্রাথমিক। আমাদের চারিদিকে যা কিছু দেখি সবই শুধু "ভাবের ছায়া"। নিম্নলিখিত রূপকের সাহায্যে তিনি কথাটা পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। এক সন্ন্যাসী গুহাবাসী; বাইরের খোলা হাওয়ায় সূর্যের আলো জ্বলছে, লোকেরা চলাফেরা করছে; সেখানে যা ঘটছে সন্ন্যাসী তার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না; তিনি শুধু গুহাগাত্রে তাদের ছায়াগুলিকেই দেখছেন। সংসারী লোকেদের অবস্থাটা ঠিক তাই। সন্ন্যাসীর মতো শুধু ছায়াগুলিকেই জানে। যে সব জিনিস তাদের চোখে পড়ে সেগুলি "সৎ" জগতের, ভাবলোকের, ছায়া মাত্র। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে, প্লেটোর এই সব উক্তি একান্তই অর্থহীন রহস্যবাদ*। লেনিন যে উচিত কথাই বলেছিলেন তা অপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

যে দর্শনকে বলা হয় **অবজেকটিভ আইডিয়ালিজম বা সবিষয় বিজ্ঞানবাদ**, প্লেটো তার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। কথাটার অর্থগ্রহণ করার জন্য মনে রাখতে হবে যে, সাধারণতঃ "বিষয়" বলতে বোঝায় এমন

---

* রহস্যবাদ—ইংরাজিতে "মিষ্টিসিজম"—গ্রীক "মিষ্টিকস" থেকে—মানে রহস্য। রহস্যবাদ একটা ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য তার মূল কথা। সচরাচর যে কোনো মতবাদ রহস্যময়, ব্যাখ্যাতীত একটা কিছুর উপর নির্ভরশীল, তাকেই রহস্যবাদ বলা হয়।

একটা কিছু যা মানুষের বাইরে, তার চৈতন্য থেকে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং যা মানুষের ক্রিয়াধীন! বস্তুবাদ মনে করে, বহির্জগৎ বিষয় রূপে, বিষয়ীভূত সদ্বস্তু রূপে বিদ্যমান। প্লেটো কথিত বিজ্ঞানবাদ বলে যে, ভাবের বিষয়ীভূত অস্তিত্ব আছে।

প্লেটো বস্তুবাদীদের, বিশেষ করে ডিমক্রিটাসের, বিরুদ্ধে ঘোরতর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ডিমক্রিটাসের রচনাবলী "ধর্মহানিকর"। তিনি চেয়েছিলেন, ডিমক্রিটাসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।

প্লেটোর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামতও সমানই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। তিনি মনে করতেন, দাসত্বপ্রথার উপর স্থাপিত অভিজাত সাধারণতন্ত্রই "আদর্শ রাষ্ট্র"। তাঁর মত ছিল এই যে, দাসত্বপ্রথা স্বাভাবিক ও আবশ্যিক: ঈশ্বর বিধান দিয়েছেন যে, কেউ কেউ হবে দাস এবং অন্যেরা হবে দাসদের প্রভু। তাই বুঝতে কষ্ট হয়না যে, সকল যুগের প্রতিক্রিয়াশীলেরা নিজেদের ধ্যানধারণার সমর্থনকল্পে প্লেটোর উল্লেখ করেছেন।

অ্যারিষ্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) ছিলেন একজন সর্বোত্তম গ্রীক দার্শনিক। তিনি প্লেটোর শিষ্য ছিলেন কিন্তু গুরুর শিক্ষার প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে—"আইডিয়া"র তত্ত্বকে—তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তাই বিজ্ঞানবাদের সমালোচনায় অ্যারিষ্টটলের অবদান গুরুত্বপূর্ণ; তিনি এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে একের পর এক বহু সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। দ্রব্যের সার হলো "ভাবরাজি", প্লেটোর এই মতবাদের উত্তরে অ্যারিষ্টটল নির্ভুল ভাবে বললেন: দ্রব্যের সার তার বাইরে কোথাও থাকতে পারে না, তার ভিতরেই আছে। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রকে প্লেটোর "ভাবগত রহস্যবাদ" বর্জন করে বাস্তব দ্রব্যজগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে।

অ্যারিষ্টটল দ্রব্যরাজির ও জড়বস্তুর বিষয়গত অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন কিন্তু তিনি তাদের মনে করতেন গতিসামর্থ্যহীন, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। তিনি "রূপ"-কে বা "আকার"-কে মনে করতেন ক্রিয়াশীলতার ভিত্তি। উপরন্তু, *অ্যারিষ্টটল বলেছিলেন, এমন একটা রূপ আছে যা "সকল রূপের রূপ", একটা* "প্রাইম মোটর" বা পরম, আদি কারণ—ঈশ্বর। লেনিন দেখালেন যে, অ্যারিষ্টটল বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন।

একটা ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীসের ও রোমের দার্শনিকদের পূর্ণ বিবরণ

দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এটা বোঝা একান্তই দরকার যে, প্রাচীন মনস্বীরাই সৃষ্টি করেছিলেন বস্তুবাদী দর্শনের প্রথম রূপ—স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ এবং বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অপরিপক্ব দ্বন্দ্বসমন্বয়ী দৃষ্টি। বিজ্ঞানের তখনও শৈশবকাল চলছিল এবং বস্তুবাদীদের ব্যবহার্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিমাণ ছিল যৎসামান্য ; তাঁদের প্রায় সব মতই ছিল প্রতিভাদীপ্ত অনুমান। তাঁদের বিশ্বদৃষ্টি ছিল অপরিণত, কিন্তু মোটের উপর ঠিক।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদ এবং ধর্মের ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম

দাসসমাজ তিরোহিত হলো। তার জায়গা দখল করল সামন্ততন্ত্র ; এল সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের ও গির্জার শাসন। এই যুগে দর্শন হয়ে পড়ল পুরোহিত-তন্ত্রের ভৃত্য। প্রাচীন মনস্বীদের বস্তুবাদী তত্ত্বগুলি বিস্মৃত অথবা বিকৃত হয়ে পড়ল। একটা ধর্মীয়—বিজ্ঞানবাদী বিশ্বদৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করল। গির্জার কঠিন হস্ত সত্ত্বেও এযুগেও দর্শন বিকাশলাভ করেছিল, যদিও মৃদুমন্দ ভাবে। এই সময়েই চীনে, ভারতবর্ষে ও আরব দেশগুলিতে বহু বস্তুবাদী তত্ত্ব রচিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরম্ভ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে দর্শন বিকশিত হতে লাগল।

একথা বিশেষভাবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী সম্বন্ধে খাটে ; ওই সময়ে তত্ত্ববিচারমূলক বস্তুবাদের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ফলস্বরূপেই তত্ত্ববিচারমূলক বস্তুবাদের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের স্বরূপকে বুঝতে গেলে সে যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝা চাই। ব্যষ্টিগত দ্রব্যের ও ঘটনার পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধানকেই তৎকালীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধান কর্তব্য বলে মনে করত। প্রাচীন যুগের তুলনায় এটা ছিল অগ্রগতির পথে একটা বড় রকমের পদক্ষেপ। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান ব্যষ্টিগত বিষয়ের ও ঘটনার অনুধাবন সম্বন্ধে মাথা ঘামাত না। তবে ব্যষ্টিগত দ্রব্যের ও ঘটনার অনুসন্ধানের একটা নঞর্থক দিকও দেখা দিল ; এই অনুসন্ধানের নেশায় বৈজ্ঞানিকেরা বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের যোগসূত্র সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়লেন। জগৎকে এই ভাবে দেখা হতে লাগল যে, তা ছাড়া ছাড়া দ্রব্যের

ও ঘটনার স্তূপ, তার একীভূত ও বিকাশমান সাকল্য নেই। আগেই বলেছি, ঠিক এটাই হলো তত্ত্ববিচার—পদ্ধতির চারিত্রিক লক্ষণ। তৎকালে বলবিদ্যা বা যন্ত্রগণিতই ছিল সবচেয়ে উন্নত বিজ্ঞান। অতএব, কেবল যন্ত্রবিদ্যাকে প্রয়োগ করেই বস্তুবাদীরা যাবতীয় জগদ্ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। এইভাবে স্বীয় বিকাশধারাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে প্রণোদিত করল প্রকৃতির ঘটনাবলীকে তত্ত্ববিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে। এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন, তত্ত্ববিচার-পদ্ধতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রসারিত হয়ে দর্শনশাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করল।

সপ্তদশ শতাব্দীর বস্তুবাদ

১৭শ—১৮শ শতাব্দীর বস্তুবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ইংরাজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন। (১৫৬১—১৬২৬)। তিনি মধ্যযুগীয় দর্শনের তীব্র সমালোচনা করলেন কেননা তা ছিল ধর্মের ভৃত্য, ধর্মকে তা ঔচিত্যদান করতে চেয়েছিল। বেকন বললেন, এই ধরণের দর্শন ঈশ্বরবৃতা দেবকুমারীর মতোই বন্ধ্যা। সত্যকার দর্শন প্রকৃতিকে অনুধাবন করবে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। মার্কস বলেছেন, বেকনীয় দর্শনে বস্তুর প্রসন্ন হাসি কাব্যের সংবেদনে ও ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হয়ে মানুষের উপর ঝরে পড়ে।

পরীক্ষণের উপর বেকন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণার বিরোধী মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের সমালোচনা করে বেকন বললেন যে, তাঁরা যেন মাকড়সা, বুনে চলেছেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক, অবচ্ছিন্ন ধারণার জালিকা। বেকনের চোখে সত্যকার দার্শনিক মৌমাছির মতো, তিনি তথ্যরূপ পুষ্পরাজি থেকে সুমিষ্ট সুধা আহরণ করে তাকে বাস্তব সত্যের মধুতে পরিণত করেন। বেকন নির্দেশ দিলেন, সংগৃহীত ও অধীত তথ্যের ভিত্তিতেই কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। সহজ, সরল কথা, তবু তখনকার দিনের পক্ষে একটা প্রোজ্জ্বল উক্তি। সুতরাং প্রকৃতির ঘটনাবলীকে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা অনুধাবন করতে হবে। বস্তুজিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষবাদী তথা পরীক্ষণ মূলক পদ্ধতিকে বেকন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন; বিজ্ঞানের ও দার্শনিক চিন্তার উত্তর-কালীন বিকাশে এই পদ্ধতির ভূমিকা ছিল বিরাট।

ইংরাজ দার্শনিক হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর এক

মহৎ বস্তুবাদী ; মার্কস তাঁকে বেকনীয় দর্শনের সংহিতাকার, এই আখ্যা দিয়েছিলেন। যান্ত্রিক বস্তুবাদের সব চারিত্রিক লক্ষণই হবসের দর্শনে ছিল। তাই তিনি সকল প্রাকৃতিক বিষয়কে, মানুষকে পর্যন্ত, যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গতিক্রিয়া বলতে তিনি বুঝতেন শুধু যান্ত্রিক গতিক্রিয়া ; ওই ভাবেই তিনি সংবেদন, প্রত্যক্ষীকরণ প্রভৃতি সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঘণ্টার আন্দোলন যেহেতু বায়ুমণ্ডলে কম্পন শুরু করে এবং এইগুলি আবার প্রথমে কর্ণকুহরে এবং পরে স্নায়ুরাজিতে গতিসঞ্চার করে, তাই আমরা ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাই। যন্ত্রে যেমন পরম্পরাক্রমে গতি-ক্রিয়ান্তর সাধিত হয়, সেই ভাবেই জগতের যাবতীয় ঘটনা ঘটে। তিনি রাষ্ট্রকেও এক যন্ত্রদানব রূপে চিত্রিত করেছিলেন এবং বাইবেলে বর্ণিত সামুদ্রিক রাক্ষসের সঙ্গে তুলনা করে রাষ্ট্রের নামকরণ করেছিলেন "লেভিয়াথান"। আমরা আজ ভাল করেই জানি যে, সব কিছুকে যন্ত্রবিদ্যার কোঠায় ফেলে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু সেদিন এই ধরণের মতবাদ প্রগতিশীল ছিল।

হবসের বিরাট কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর বস্তুবাদী মতামত থেকে নিরীশ্বর-বাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি দেখালেন যে, বস্তুজাগতিক কারণে বিকাশমান বিশ্বে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির স্থান নেই। বেকনীয় দর্শনের তুলনায় এটা একধাপ অগ্রগতি।

এই যুগে ফ্রান্সে বিখ্যাত দার্শনিক ও গাণিতিক **দেকার্ত** (১৫৯৬-১৬৫০) তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে গড়ে তুলেছিলেন। দেকার্ত ছিলেন দ্বৈতবাদী। তিনি বললেন, জগতের মূলে রয়েছে দুই স্বতন্ত্র পরমতত্ত্ব,—জড়বস্তু ও চৈতন্য। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দেকার্ত বস্তুবাদী। এক্ষেত্রে তিনি অ-বস্তুজাগতিক বহিঃশক্তির প্রয়োজন দেখেন না। মার্কস দেকার্ত সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের **চতুঃসীমায়** জড়বস্তুই এক-মাত্র **দ্রব্য**, সত্তার ও জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি।"* বস্তুর গতিক্রিয়া বলতে দেকার্ত বুঝতেন বিভিন্ন বস্তুশরীরের দেশগত স্থানচ্যুতি ; তারই ভিত্তিতে প্রকৃতিজগতের সব কিছু ঘটে। আমরা দেখেছি, এটাই যান্ত্রিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু দেকার্ত যখন চৈতন্য, অনুভূতি ও অন্যান্য মনোজাগতিক

---

*মার্কস এণ্ড এঙ্গেলস্। দি হোলি ফ্যামিলি অব ক্রিটিক অফ ক্রিটিকাল ক্রিটিক, মস্কো, ১৯৫৬, পৃঃ ১৬৯।

ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে নামেন, তখন তিনি বিজ্ঞানবাদী। এক্ষেত্রে তাঁর মতে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বুদ্ধির তাৎপর্যই চূড়ান্ত।

দেকার্ত প্রজ্ঞাবাদের জনক। তাঁর মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাই আমাদের জ্ঞানের অনন্য উৎস। এই উক্তি একদেশদর্শী কিন্তু তখনকার দিনে এর একট প্রগতি-মূলক তাৎপর্য ছিল। গির্জার প্রতি অন্ধ আনুগত্যই ছিল ধর্মের শিক্ষা; প্রজ্ঞা-বাদ ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবিক বুদ্ধির জয়গান করেছিল। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড লড়াইয়ের যুগে এটা কম কথা ছিল না।

বিশ্ববিশ্রুত ওলন্দাজ মনস্বী **স্পিনোজা** (১৬৩২-১৬৭৭) সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্রণী বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে গণ্য। দেকার্তের দ্বৈতবাদের ঊর্ধ্বে গিয়ে স্পিনোজা শিক্ষা দিলেন যে, জগতে সব কিছুরই মূলে আছে এক ও অদ্বিতীয় দ্রব্য অর্থাৎ প্রকৃতি। তা শাশ্বত, অসৃষ্ট ও অসীম।

কোনো অলৌকিক শক্তি প্রকৃতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়; প্রকৃতি তার নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মের ভিত্তিতেই বিকাশলাভ করে। কথাটাকে স্পিনোজা এই ভাবে বললেন: জগৎ নিজেই নিজের কারণস্বরূপ।

সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, স্পিনোজা শুধু বস্তুবাদীই ছিলেন না, তিনি একজন উচুঁ দরের নিরীশ্বরবাদীও ছিলেন। ধর্মযাজকদের মতে একমাত্র ঈশ্বরই সৃষ্টিশক্তির অধিকারী কিন্তু স্পিনোজা দেখালেন যে, প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে "স্পিনোজাপন্থী" ও "নিরীশ্বরবাদী", এই দু'টি শব্দ ছিল সমার্থক। তাই স্পিনোজার দর্শন গির্জার মোহন্তদের মনে প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক করেছিল। স্পিনোজা নিজে নিন্দিত ও উৎপীড়িত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি সাহসের সঙ্গে নিজের বস্তুবাদের ও নিরীশ্বর-বাদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ

আলোচ্য যুগে **অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ** ছিল বস্তুবাদের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ নবপর্যায়ের সূচক। এর প্রবক্তারা ছিলেন **দিদেরো** (১৭১৩-১৭৮৪), **হোলবাখ** (১৭২৩—১৭৮৯) ও **হেলভেশিয়াস** (১৭১৫—১৭৭১)। ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বাহ্ণে এই দর্শনই সামন্ততন্ত্রের ও ধর্মীয়-বিজ্ঞানবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীকে তত্ত্বগত হাতিয়ার যুগিয়েছিল। এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, ফ্রান্সের দার্শনিক বিপ্লবটি ছিল যেন রাজনৈতিক

বিপ্লবের ভূমিকা, ফরাসী বস্তুবাদীরা স্বৈরতন্ত্রের ও গির্জার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীকে দিলেন একটা বিশ্বাসের প্রতীকচিহ্ন ও তাত্ত্বিক পতাকা। লেনিনের ভাষায় তাঁদের রচনাগুলি হলো, "তীক্ষ্ণ, প্রাণচঞ্চল ও শক্তিমান লেখা, প্রচলিত পুরোহিততন্ত্রকে তা ব্যঙ্গভরে ও খোলাখুলি ভাবে আক্রমণ করেছিল।"*

লেনিন ফরাসী বস্তুবাদীদের লেখাগুলিকে ধর্মীয় গুহ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অস্ত্রের ও গুলিবারুদের আয়ুধাগার বলে বিবেচনা করতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের তুলনায় দিদেরো, হোলবাশ ও হেলভেশিয়াসের বস্তুবাদ অনেক দূর এগিয়েছিল। এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ, ফরাসী বস্তুবাদীদের এই প্রত্যয় যে, প্রকৃতি একটি **ঐকৈক** সমূহ; স্বকীয় নিয়মের ভিত্তিতে স্বাভাবিক ভাবে তা বিকশিত হচ্ছে। সুতরাং এটা আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, হোলবাশ তাঁর প্রধান গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন, "দ্য সিষ্টেম অফ নেচার"। হোলবাশ লিখেছিলেনঃ "প্রকৃতিই সব কিছুর কারণস্বরূপ; তার অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ; তা নিত্যকাল বিদ্যমান থাকবে ও কাজ করবে; তা নিজেই নিজের কারণ; তার গতিক্রিয়া নিজের আবশ্যিক অস্তিত্বের আবশ্যিক ফল।"

ফরাসী বস্তুবাদের একটি বিশেষ কৃতিত্ব হলো, **জড়বস্তুর ও গতিক্রিয়ার ঐক্যকে** তা উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু গতিক্রিয়া যান্ত্রিক দেশগত স্থানচ্যুতি ছাড়া আর কিছু নয় এবং প্রকৃতির নিয়মাবলী চিরন্তন ও অব্যয়, এই দুই ধারণা পোষণ করে ফরাসী বস্তুবাদীরা তত্ত্ববিচারমূলক বস্তুবাদেরই অনুগমন করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশীয় বস্তুবাদ

মিখাইল লোমোনোসভ (১৭১১—১৭৬৫) এবং **আলেকজাণ্ডার রাডিশ্চেভ** (১৭৪৯—১৮০২), এই দুই মনস্বীর নামের সঙ্গে রুশীয় বস্তুবাদের জন্ম ও বিকাশ জড়িত। লোমোনোসভ জগদ্বিখ্যাত সূরিশ্রেষ্ঠদের অন্যতম—তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্, রসায়নশাস্ত্রী, ভূবিজ্ঞানী ও কবি। রাডিশ্চেভও খ্যাতনামা বিপ্লবী ও লেখক। দার্শনিক চিন্তায় উভয়েরই অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সর্বতোমুখী প্রতিভার বলে বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার দ্বারা লোমোনোসভ যে তথ্যরাজি আয়ত্ত করেছিলেন তারই উপর তিনি নিজের বস্তুবাদী মতবাদকে

* লেনিন, মার্কস্-এঙ্গেলস্-মার্কসিজ্ম্, পৃঃ ৫৭৩

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লোমোনোসভ কর্তৃক জড়বস্তুর নিত্যতা সূত্রটি আবিষ্কারের তাৎপর্যই সমধিক। এই সূত্র বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য দান করল কেননা এই নিয়ম থেকে এই সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয় যে, জড়বস্তু কদাচ সৃষ্ট বা বিনষ্ট হতে পারে না।*

লোমোনোসভ জড়বস্তুর পারমাণবিক ও আণবিক গঠনবিন্যাস তত্ত্বকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে, জড়বস্তুর গতিক্রিয়ার বিষয়ীভূত নিয়মগুলিকে এবং জাগতিক ঘটনার কারণগুলিকে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন আছে। কথাটা বিজ্ঞানের ও দর্শনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে লোমোনোসভ স্বকালের একজন অগ্রণী মনীষী ছিলেন। তিনি সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন এবং ভূদাসপ্রথার † তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতেন যে, রুশীয় জনগণের চিত্তে আলোক সঞ্চার এবং তাদের মুক্তিসাধন, এটাই হওয়া উচিত বিজ্ঞানের ব্রত। লোমোনোসভই ছিলেন রুশীয় দর্শনে বস্তুবাদী ঐতিহ্যের জনক।

রাডিশ্চেভ ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর বস্তুবাদী ও বিপ্লবী মনীষী। ভূদাসপ্রথার, জারীয় স্বৈরতন্ত্রের ও প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি নিজের শক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন। লোমোনোসভের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি রাশিয়ায় বস্তুবাদী ঐতিহ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন ও ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর দার্শনিক রচনাবলীতে তিনি দর্শনের মৌল প্রশ্নের বস্তুবাদী জবাব দিলেন। তিনি বললেন, মানুষের একটা আত্মা আছে এই ধারণা অসিদ্ধ। তাই রহস্যবাদ ও ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর লেখাগুলির গুরুত্ব সমধিক। মনস্বী ও বিপ্লবী রূপে রাডিশ্চেভ লেনিনের বিশেষ প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন।

---

* এই নিয়মের দার্শনিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তৃতীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† ভূদাসপ্রথা—আইনের বলে অব্যবহিত উৎপাদকেরা—কৃষকেরা ছিল ব্যক্তিগত বা দৈহিক ভাবে সামন্ত প্রভুদের আশ্রিত; শাসক শ্রেণীর স্বার্থে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল—সম্পাদক।

বার্কলি (১৬৮৪-১৭৫৩) ও হিউম (১৭১১-১৭৭৬)

বার্কলির ও হিউমের বিজ্ঞানবাদ

এঁরাই ছিলেন সাবজেকটিভ আইডিয়ালিষ্ট বা কেবল-বিজ্ঞানবাদী তত্ত্বাবলীর প্রতিষ্ঠাতা। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ধরণের তত্ত্বের খুবই প্রচলন ছিল। বিশপ বার্কলি বাহ্য-জগতের অস্তিত্বকে একরকম অস্বীকারই করলেন; তাঁর মতে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল শুধু মানুষ, অর্থাৎ জ্ঞাতা এবং তার চৈতন্য। তিনি বললেন, বস্তুসমূহের মনোনিরপেক্ষ সত্তা নেই, তাদের সত্তার তখনই উৎপত্তি হয় যখন মানুষ তাদের প্রত্যক্ষ করে—দর্শন, শ্রবণ ও অনুভূতির দ্বারা। যখন মানুষ তাদের প্রত্যক্ষ না করে তখন তারা অসৎ। বার্কলির মতে জ্ঞাতার চৈতন্যে ও সংবেদনেই জগতের অস্তিত্ব। "অস্তি মানেই হলো প্রত্যক্ষীভূত হওয়া। দ্রব্যসমূহ হলো সংবেদনের সমষ্টি।" কথাটার মানে দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞাতা অর্থাৎ মানুষ জগৎকে সৃষ্টি করে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, কেন এই ধরণের বিজ্ঞানবাদকে কেবল বিজ্ঞানবাদ বা জ্ঞাতৃগত বিজ্ঞানবাদ বলা হয়েছে। তাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করলে এটা অবশ্যম্ভাবী রূপে 'সোলিপসিজম' অর্থাৎ ব্যক্তিচৈতন্য-সর্বস্ববাদ হয়ে পড়ে; তার অর্থ এই যে, জ্ঞাতা রূপে একজন ব্যক্তিবিশেষই কেবল অস্তিত্বশীল এবং তিনিই সমগ্র বিশ্বের জনয়িতা।

বার্কলি ছিলেন বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদের আপসহীন শত্রু। সুতরাং বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, বস্তুবাদীরা তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালিয়েছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বকে তীব্র সমালোচনা ও পরিহাসের দ্বারা নস্যাৎ করেছিলেন। যেমন, দিদেরো বার্কলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "ক্ষ্যাপামির মুহূর্তে এক সজ্ঞান মহামহিম পিয়ানো কল্পনা করে বসল যে, সে-ই জগতের একমাত্র পিয়ানো এবং বিশ্বচরাচরের সকল সঙ্গীত তার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে।"*

জগৎ কেবল আমাদের চৈতন্যেই বিদ্যমান, কেবলবিজ্ঞানবাদের এই উক্তিকে আমাদের জীবন ও ব্যবহারিক কার্যকলাপ খণ্ডন করে। দৈনন্দিন কর্ম, উৎপাদক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, শুধু যে একজন প্রত্যাশীল মানুষ অর্থাৎ জ্ঞাতাই অস্তিত্বশীল তা নয়, দ্রব্য, ঘটনা ও মানবকুল সমেত সমগ্র বিশ্বেরও একটা বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। সামাজিক প্রযুক্তির সম্মুখীন হলে

* Diderot, Entretion entre d'Alembert et Diderot, Paris, Libraire Marcel Didier, 1951, p. ..0.

জ্ঞাতৃগত বিজ্ঞানবাদ নিবীর্য হয়ে পড়ে।

অন্যতম ইংরাজ দার্শনিক ডেভিড হিউম বিচার শুরু করলেন এইখান থেকে যে, মানুষের মনের কারবার সংবেদন নিয়ে, বাস্তবিক দ্রব্যসমূহ নিয়ে নয়। হিউমের মতে মানুষ নিজের সংবেদনের সঙ্গেই পরিচিত, বাহ্য জগৎ আছে কি নেই এবং তার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নের জবাব মানুষ দিতে পারে না। বার্কলি বাস্তব বিষয়-দ্রব্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু হিউম সে সম্বন্ধে শুধু সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। হিউম সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। সংশয়বাদী দার্শনিক চিন্তাধারা জগতের অস্তিত্ব ও তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান ও জ্ঞান সম্ভব, এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে।

লেনিন তাঁর **মেটিরিয়ালিজম্ ও এমপিরিও-ক্রিটিসিজম্** (বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষধর্মী—সমালোচনা) নামক গ্রন্থে বার্কলির ও হিউমের কেবলবিজ্ঞানবাদী দর্শনকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান দর্শনে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সংঘর্ষ

আমাদের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেছে যে, বস্তুবাদ প্রাচীন কালে যা ছিল সে তুলনায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার অনেক অগ্রগতি ঘটেছিল। তা সমাধান করেছিল অনেক ব্যাপকতর প্রশ্নের, বিজ্ঞানের সঙ্গে তা নিবিড়তর ভাবে যুক্ত হয়েছিল। এই যুগে ভাববাদ ও ধর্ম প্রচণ্ড ঘা খেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানের ও সামাজিক জীবনের বিকাশের ফলে তৎকালীন তত্ত্ববিচারমূলক চিন্তধারার পরাজয় আবশ্যক হয়ে পড়ল। জার্মান ক্লাসিকাল দর্শন, বিশেষ করে **হেগেল** (১৭৭০-১৮৩১) ও **ফয়েরবাখ** (১৮০৪-১৮৭২), এই দুই মনস্বীর দর্শন এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

হেগেল যে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন তা সবিষয় বিজ্ঞানবাদের পর্যায়ভুক্ত। এই তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতি ও সমাজের ভিত্তি হলো পরম তত্ত্ব বা জগদাত্মা, তা শাশ্বত, প্রকৃতিনিরপেক্ষ ও মানবনিরপেক্ষ।

হেগেল বললেন, জড়া প্রকৃতি পরমাত্মার অন্যতর প্রকাশ। তার মানে

ই যে, জগদাত্মা প্রকৃতিতেও বিদ্যমান কিন্তু অন্য রূপে—সদ্বস্তু, বিষয় রূপে। পরম তত্ত্বই জাগতিক বস্তুসকলের স্রষ্টা, তারা পরমাত্মার অন্য প্রকাশ মাত্র। বোধ হয় আপনারা লক্ষ করেছেন যে, এইখানটায় হেগেল ঈশ্বর কর্তৃক জগৎসৃষ্টির ধর্মীয় ধারণাটাকে গোপনে আমদানি করেছেন। তথাপি হেগেলের দর্শনে অনেক মূল্যবান ধারণার সাক্ষাৎ পাই। সব চেয়ে মূল্যবান হলো জগদাত্মার চিরন্তন গতিক্রিয়া ও বিকাশ সম্বন্ধে হেগেলীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ তাঁর বিখ্যাত দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব। আমরা পরে দেখব, মার্কস ও এঙ্গেলস্ এই তত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয়—পদ্ধতি যদিও বিজ্ঞানবাদী ভিত্তির উপর স্থাপিত, তবু তা মানবচিন্তার একটা বিরাট কীর্তি। দর্শনের ইতিহাসে হেগেলই সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বসমন্বয়ের নিয়মাবলীকে ও মূল-প্রত্যয়গুলিকে সূত্রবদ্ধ করলেন। অবশ্য তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানিক পদ্ধতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি কেননা তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি ও সমাজ নয়, পরমাত্মা এবং দার্শনিক ধারণা ও প্রত্যয়-গুলিই এই সকল নিয়ম অনুসারে বিকাশলাভ করে। হেগেলের কাছ থেকে প্রকৃতির দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব পাই না, পাই "বিশুদ্ধ চিন্তার" জগতে সংঘটিত ধারণা-প্রত্যয়ের দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব।

এই কারণে হেগেল কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজের বিকাশতত্ত্বকে দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বকে, নিজেই লঙ্ঘন করেছিলেন। দ্বন্দ্বসমন্বয় পদ্ধতির প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও হেগেল প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, এক্ষেত্রে কোনো বিকাশ নেই। হেগেলের মতে প্রাকৃতিক জগতে কিছুই নূতন নয়ঃ একই প্রক্রিয়ার চিরন্তন পুনরাবর্তনই প্রকৃতির নিয়তি।

মানবিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে হেগেল বিকাশকে স্বীকার করলেন শুধু অতীতে। তাঁর বিবেচনায় সামাজিক এস্টেটের উপর স্থাপিত প্রুশীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতেই সামাজিক প্রগতি শেষ সীমায় পৌঁছল।

আপনারা বলতে পারেন, দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি যখন কোনো কিছুকেই চিরন্তন অধিকারী ও অস্থিভূত বলে মানে না তখন হেগেল দ্বন্দ্বসমন্বয়বিৎ হওয়া সত্ত্বে কি করে প্রকৃতির বিকাশকে অস্বীকার করতে পারেন, কি করে তিনি সামাজিক বিকাশকে সীমার মধ্যে আটকে রাখতে পারেন? এটা কি একটা স্ববিরোধ নয়? নিশ্চয়ই। হেগেলের দর্শনে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবাদী তত্ত্ব (অর্থাৎ তাঁর

এই তত্ত্ব যে, প্রকৃতি ও সমাজ শুধু "পরম তত্ত্বের" অস্তিত্বের রূপভেদ মাত্র) এবং দ্বন্দ্বসমন্বয় পদ্ধতি, তথা, চিরন্তন বিকাশের নীতি ও তার সংহারক তত্ত্ববিচার-বিদ্যা, এদের বিরোধ বিদ্যমান। আপনারা বোধ হয় ইতিমধ্যেই ধরতে পেরেছেন, তত্ত্ববিচারমূলক দর্শনের খাতিরে হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি আপস করেছিল। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হেগেলের প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-রাজনৈতিক মতামত। তিনি যুদ্ধের জয়গান ও শান্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। "জার্মানরা ঈশ্বরাভিষিক্ত জাতি", এই ধরণের উগ্র জাতীয়তাবাদী কথাবার্তার জন্যও হেগেল দায়ী। এই সব ও অনুরূপ ধারণাকে পরে সাম্রাজ্যবাদের ভাবুকেরা লুফে নিয়েছিলেন। যাই হোক, হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি কিন্তু পরবর্তীকালের প্রগতিশীল দার্শনিক চিন্তার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটা হয়ে ওঠে মার্কসবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক উৎস। কিন্তু দেখা গেল যে, সামগ্রিক ভাবে হেগেলের বিজ্ঞানবাদী দর্শন, সকল বিজ্ঞানবাদের মতোই, মানবিক জ্ঞানের মহামহীরুহে একটি অফলা পুষ্প মাত্র।

হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদকে আক্রমণ করলেন লুডউইগ ফয়েরবাখ। জাল্পনিক জার্মান দর্শনের দীর্ঘকালব্যাপী প্রাধান্যের পরে ফয়েরবাখ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদী ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এটাই তাঁর মহত্ব। তাঁর দর্শনের উপক্রমণিকা হলো, যা কিছু অস্তিত্বশীল তার মুলে আছে প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকেই মানুষের ও তার চৈতন্যের উদ্ভব। বস্তুজগৎ বিজ্ঞানেরও একমাত্র ভিত্তি। ফয়েরবাখ বললেন, প্রকৃতিবিরহিত দর্শন শূন্যগর্ভ ও তুচ্ছ।

ফয়েরবাখ নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের[১] স্রষ্টা। ফয়েরবাখের মতে দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ এবং মানুষ তাঁর চোখে প্রকৃতিরই এক অংশ। দর্শনশাস্ত্র মানুষকেই অধ্যয়ন করবে, কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা মানুষকে যেমন দেহ ও আত্মা এই দুই স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করেন তেমন ভাবে নয়। ফয়েরবাখ বললেন, জড়দেহ ও আত্মা, এই দুইয়ে মিলে মানুষ এক ; সেই একীভূত মানুষের দেহ অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেকে চৈতন্যের জন্ম। এটাই ফয়েরবাখের নৃতত্ত্ববাদের বস্তুগত ভিত্তি। বিজ্ঞানবাদের ও ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই মতবাদ একটা হাতিয়ার যোগাল ; তবু, লেনিন দেখালেন, মতবাদটা প্রশংসনীয়-

১ নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদ—ইংরাজিতে অ্যান্থ্রপলজিক্যাল মেটিরিয়ালিজম (গ্রীক শব্দ "আন্থ্রোপস" থেকে—মানে মানুষ)।

হলেও সংকীর্ণ ও অনুপযুক্ত। কেননা মানুষকে তা শুধু জৈব প্রাণী রূপেই দেখে। কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে, সে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের ও ইতিহাসোৎপন্ন অবস্থার ফলস্বরূপ; এইগুলিকে বিচার করলে তবেই মানুষকে বোঝা সম্ভব। ফয়েরবাখ কিন্তু চাইলেন "অবস্থানিরপেক্ষ মানব" সম্বন্ধে তত্ত্ব-রচনা করতে। বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, সেটা হয়ে পড়ল প্রত্যক্ষ সামাজিক সম্পর্ক থেকে অবচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ মানবের তত্ত্ব।

ফয়েরবাখের নিরীশ্বরবাদ খুব বড় জিনিস ছিল। তিনি ছিলেন ধর্মের এক বিচক্ষণ সমালোচক; তিনি দেখলেন যে, মানুষই নিজের অন্তরের অনুভূতিতে দেবত্ব আরোপ করে ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে। ত্রাস, প্রেম, কৃতজ্ঞতা—মানুষের অন্তর্নিহিত এই সব অনুভূতির কর্তা হয়ে উঠলেন ঈশ্বর। কিন্তু ফয়েরবাখ সর্বপ্রকার ধর্মকে সমালোচনা ও বর্জন করার পরিবর্তে একটা নূতন ধর্মের সৃষ্টি করতে চাইলেন, "ঈশ্বরবিহীন" ধর্ম, প্রেমের ধর্ম। তিনি ধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন কিন্তু "ধর্ম" কথাটিকে বাদ দিতে পারলেন না, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটিকে প্রয়োগ করলেন। এটাই ফয়েরবাখের নিরীশ্বরবাদের অসঙ্গতি।

মোটের উপর ফয়েরবাখের সমগ্র দর্শন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির অভ্যুদয়ে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের দর্শনসৃষ্টির কাজে হেগেলীয় দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার সঙ্গে ফয়েরবাখীয় বস্তুবাদী মতবাদকেও ব্যবহার করেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বন্দ্বসমন্বয়—পদ্ধতি (হেগেল) এবং বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি (ফয়েরবাখ), এই দুইয়ের বিকাশে জার্মান ক্লাসিকাল দর্শন বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থায় এই দার্শনিকেরা একটা বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করতে সক্ষম হননি।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশীয় বস্তুবাদী দর্শন

রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রের বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি গত শতাব্দীর চল্লিশ দশক থেকে দানা বাঁধতে লাগল। ভূদাস প্রথার ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ষাট ও সত্তর দশকে চরম শিখরে উঠেছিল তারই ভাবাদর্শগত পতাকা ছিল এই বিশ্বদৃষ্টি। আন্দোলনটির ভাবতত্ত্বজ্ঞ ও অনুপ্রেরক

ছিলেন রুশীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা, যথা: ভিসারিয়ন বেলিনস্কি (১৮১১-১৮৪৮), আলেকজান্দার হার্জেন (১৮১২-১৮৭০), নিকোলাই চার্নিশেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯) ও নিকোলাই ডোব্রোলিউবভ (১৮৩৬-১৮৬১)।

হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয় বিদ্যা ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদ ছিল পশ্চিমের প্রাক্-মার্কসীয় দর্শনের উচ্চতর স্তরে উপনীত হওয়ার নিদর্শন। রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বিশ্বদৃষ্টি বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ওটা ছিল কৃষকবিপ্লবী গণতন্ত্রের বিশ্বদৃষ্টি। তার বিশিষ্ট আকৃতি-প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই হার্জেন ও চার্নিশেভস্কির রচনায়।

লেনিন লিখেছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ার তদানীন্তন সামাজিক অবস্থায় হার্জেন স্বকালের একজন মহামনস্বী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। হার্জেন হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতিকে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই পদ্ধতি "বিপ্লবের বীজগণিত।" লেনিন আরো দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমের ক্ষুদ্র বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের তুলনায় হার্জেন ছিলেন একজন বিরাট পুরুষ। লেনিন লিখেছিলেন: "হার্জেন এগিয়ে এসেছিলেন একেবারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কোঠায় কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এপারে এসে থেমে গিয়েছিলেন।"[১]

হার্জেনের মতে, প্রকৃতি ও জড়বস্তু "স্বয়ংসিদ্ধ রূপে" অর্থাৎ মানব নিরপেক্ষ ভাবে অস্তিত্বশীল। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে তারা বিদ্যমান ছিল এবং "মানুষের আবির্ভাবের পরেও মানুষ সম্বন্ধে তাদের কোনো মাথাব্যথা দেখা যায়নি।" বস্তুবাদের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে হার্জেন দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতিকেও সমর্থন করেছিলেন। তিনি বললেন, প্রকৃতি নিত্যগতিশীল ও নিত্য বিকাশমান অবস্থায় বিরাজমান। কাব্যোচিত ও উদ্দীপ্ত ভাষায় হার্জেন লিখেছিলেন: "তাকে (প্রকৃতিকে) তদ্রূপে অনুধাবন করুন, দেখবেন তা গতিক্রিয়াসম্পন্ন; তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করুন, তার জীবন চরিত পাঠ করুন, তলিয়ে দেখুন তার বিকাশের ইতিহাস—তখনই কেবল দেখতে পাবেন তার সর্বাঙ্গসঙ্গত চিত্র। চিন্তার ইতিহাস প্রকৃতির ইতিহাসেরই ক্রমান্বয়: মানবজাতিই হোক বা প্রকৃতিই হোক, কোনোটাকেই তার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিক থেকে না দেখলে বোঝা অসম্ভব।"

১লেনিন, *কলেক্টেড ওয়াক'স* খণ্ড ১৮, পৃঃ ২৬

যে সব অগ্রণী মনীষীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতির মিলনের কাল আগত, হার্জেন ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি নিজেও বস্তুবাদকে দ্বন্দ্বসমন্বয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি উভয়কে একটি অখণ্ড বিশ্বদৃষ্টিতে মেলাতে পারেননি ; কেননা স্বকালীন অবস্থাকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রগুলিকে উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি।

চার্নিশেভস্কি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বজনস্বীকৃত নেতা ও গুরু। লেনিনের ভাষায় তিনি "হার্জেনের তুলনায় অগ্রগতির পথে বিরাট পদক্ষেপ করেছিলেন। চার্নিশেভস্কি ছিলেন অনেক বেশি খাঁটি ও জঙ্গী গণতন্ত্রী, তাঁর লেখাগুলিতে বেজে উঠেছিল শ্রেণীসংগ্রামের সুর।"[১]

চার্নিশেভস্কির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তি হলো তাঁর বস্তুবাদী দর্শন। তাঁর বস্তুবাদের ধাঁচটা নৃতাত্ত্বিক। ফয়েরবাখের অনুগামী হয়ে তিনি মানুষকেই তাঁর দার্শনিক চিন্তাজগতের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রথম কথা হলো জীবমানবের একত্ব ও পূর্ণত্ব। এর মূলে আছে বস্তুগত ভিত্তি, জীবদেহের ঐক্য। মানবের সারসত্তার সন্ধান করতে গিয়ে চার্নিশেভস্কি দর্শনের মৌল প্রশ্নের বস্তুবাদী সমাধানে উপনীত হলেন ; তাঁর বিচারে মানবের "দেহই" প্রাথমিক, চৈতন্য ও চিন্তা গৌণ।

ফয়েরবাখের মতো চার্নিশেভস্কিরও নৃতাত্ত্বিক নীতিটি ছিল সংকীর্ণ ও অনুপযুক্ত। তবে যে সব সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থায় লোকেরা জীবন-ধারণ করে সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে চার্নিশেভস্কি ফয়েরবাখের তুলনায় বেশ কিছুদূর এগিয়েছিলেন। তাঁর মতে মানুষ শুধু জৈব প্রাণীই নয়। তিনি লিখলেন, মানুষের জীবনে ও সুখসম্পাদনে "বস্তুগত দিকটার (অর্থনৈতিক জীবনপ্রণালীর) বিরাট গুরুত্ব আছে।"

চার্নিশেভস্কি শুধু একজন বড় বস্তুবাদীই ছিলেন না, তিনি একজন উচ্চাঙ্গের দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্‌ও ছিলেন। তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে এই মহৎ চিন্তা : "ইতিহাস চলে মন্থরভাবে ; তবু তার সমস্ত চলাটাই ঘটে একটার পর একটা লাফ দিয়ে।" তাঁর রচনায় আর এক জায়গায় তিনি দ্বন্দ্বসমন্বয়ের

[১] লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ২০, পৃ ২৪৬

একটি প্রধান সূত্র প্রণয়ন করেছেন এই কথা বলে, যথা : "পরিমাণগত পার্থক্য গুণগত পার্থক্যে পরিণত হয়।"

রাশিয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের মতবাদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চরিত্রের পরিচয় পাই সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণায়। তাঁরা সমাজ-তান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচার করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের চিন্তাধারা ইউটোপীয় সমাজবাদের খাতেই বইত, যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কৃষক কমিউনের ভিতর দিয়েই রাশিয়া সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের বিজয়াভিযানে প্রলেটারিয়েট নামক সামাজিক শক্তিই যে কৃষকদের নেতা রূপে কাজ করবে, এই সত্যকে তখনও পর্যন্ত রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা ধরতে পারেন নি। তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, শুধু কৃষক কমিউনই সমাজতন্ত্রের বীজকোষ হতে পারে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশীয় মনস্বীদের ইউটোপীয় সমাজবাদ ছিল পশ্চিম ইউরোপের ইউটোপীয় সমাজবাদের থেকে অনেকটা আলাদা ধরণের। রাশিয়ার মনীষীরা এটা জানতেন যে, বিপ্লবী সংগ্রাম, বিপ্লবী গণ অভ্যুত্থান ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। তাই তাঁরা কৃষকদের আহ্বান করেছিলেন "কুঠার ধারণ করতে", অর্থাৎ বিপ্লবী সংগ্রামে ব্রতী হতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশে রুশীয় বস্তুবাদী দর্শনের ভূমিকাটা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু রুশীয় জীবনের পশ্চাৎপদ চরিত্রের দরুন এই দর্শনের প্রবক্তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের স্তরে পৌঁছতে পারেন নি। দর্শনের ইতিহাসে মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটা সত্যকার বিপ্লব সাধিত করল।

মার্কসবাদের আবির্ভাব—দার্শনিক বিপ্লব

ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টি রূপে মার্কসবাদ উদ্ভূত হয়েছিল। নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, যে সকল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী উদিত হয়েছিল, এইগুলিই মার্কসবাদের জন্ম দিয়েছিল। মার্কসবাদের আবির্ভাবের উপকারণ ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি পূর্বাবশ্যক আবিষ্কার—একথা দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে। মার্কসীয় দর্শনের

ভাবাদর্শগত পূর্বোপকরণ সৃষ্টি করার ব্যাপারে হেগেল ও ফয়েরবাখ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার আলোচনাও আমরা করেছি। আমরা দেখিয়েছি যে, মার্কসবাদ দর্শনশাস্ত্রের পূর্বকালীন শাখাগুলির সরল অনুক্রমমাত্রই ছিল না। মূলতঃ তা ছিল একটা নূতন তত্ত্ব, নূতন দর্শন।

খুব প্রগতিশীল প্রাক্-মার্কসীয় দর্শনেরও নানা ত্রুটি ছিল। কি কি ত্রুটি? স্মরণ করা যাক এবিষয়ে যা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রাক্-মার্কসীয় দর্শন ছিল যান্ত্রিক। অর্থাৎ তা বস্তুজগতের যাবতীয় ঘটনাকে যন্ত্রবিদ্যার নিয়মের স[ব] সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত। প্রাক্-মার্কসীয় দর্শনের প্রবক্তারা অ[…] মানুষকেও মনে করতেন একটা যন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, তা ছিল তত্ত্ববিচারমূলক। [দ্ব]ন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা তথা বিকাশতত্ত্ব তার ভিত্তিস্বরূপ ছিল না। উপরন্তু, প্রাক্তন [ব]স্তুর বাদীরা শুধু প্রকৃতিরই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতেন, সমাজজীবনের ঘটনাবলী চা[…] তাঁদের ব্যাখ্যাটা ছিল বিজ্ঞানবাদী। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদের দর্শন।। ছিল ধ্যানমূলক; এটা আর একটি ত্রুটি। তার প্রবক্তারা ত্তিনি মা[…] প্রযুক্তির ভূমিকাটা বুঝতে পারেন নি।

তাঁর [এ]ই সকল ত্রুটির ব্যাখ্যা কি?

ভি[…] আমরা দেখেছি, অতীতে বস্তুবাদ প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির স্বার্থকে প্রকাশ করত। যেমন ধরুন, বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় অভ্যুদয়ের কালে প্রগতিশীল ছিল; রাজাদের ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তা দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু তা নিজেই ছিল এক শোষক শ্রেণী। সুতরাং তার পক্ষে পুরোপুরি প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব ছিল না; যে দর্শন ছিল তার স্বার্থের দ্যোতক তাতে এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছিল। ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীরা এর এক দৃষ্টান্ত; তাঁরা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে চিরন্তন ও অবিনাশী মনে করতেন। মানব সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা তত্ত্ববিচারমূলক। সুতরাং প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদের ত্রুটিগুলির সামাজিক শিকড় ছিল।

একথা বলা হয়েছে যে, মার্কসবাদ নূতন সামাজিক অবস্থায় উদ্ভূত হয়েছিল। সামাজিক সম্পর্কের মূলগত পরিবর্তন সাধিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করছিল; তাই এক নূতন বিশ্বদৃষ্টি তার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিকাশ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাবকে সুগম করেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সৃষ্টি

করলেন তার পিছনে ছিল এইসব বিজ্ঞানের অভিনব তথ্য ও সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদের ত্রুটিগুলিকে অতিক্রম করা হলো। মার্কসবাদের জনকেরা মানবিক চিন্তার এক নূতন, বিরাট কীর্তির দ্বারা, দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার দ্বারা বস্তুবাদকে সমৃদ্ধ করলেন। দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যারও আমূল পরিবর্তন ঘটল :

মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা সৃষ্টি করলেন। তারই ভিত্তিতে তাঁরা সমাজের বিকাশকে ব্যাখ্যা করলেন এবং সৃজন করলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই ভাবে একটা সম্পূর্ণ নূতন দর্শনের উদয় ঘটল। দর্শনের ইতিহাসে এটা ছিল একটা সত্যকার বিপ্লব। উপরন্তু, মার্কস ও এঙ্গেলস দর্শনের সামনে উপস্থিত করলেন নূতন কর্তব্য : তাঁরা তাঁদের দর্শনকে করে তুললেন জগতের রূপান্তরের হাতিয়ার। **এই বিপ্লবী প্রকৃতিই মার্কসীয় দর্শনের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।**

প্রশ্নটিকে আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে দুই প্রকার মত সম্ভব, দুই পথে তার দিকে এগুতে পারি।

জগতের রূপান্তরের হাতিয়ার

দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাস করা হতো যে, দর্শনের কাজ শুধু জগৎকে ব্যাখ্যা করা ; জগৎকে পরিবর্তিত করার ব্যাপার নিয়ে দর্শনশাস্ত্র মাথা ঘামায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, অতীতে বস্তুবাদীরা এই ধরণের মত পোষণ করতেন। তাই মার্কস বলেছিলেন যে, তাঁদের বস্তুবাদের প্রকৃতিটা ছিল ধ্যানমূলক, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্যম। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডকে ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা। কিন্তু বিপ্লবীরা এই রকম একটা মতকে গ্রহণ করতে পারেন না। এই জন্যই **মার্কসীয় দর্শন জীবনের পরিবর্তনের ও রূপান্তর সাধনের জন্য জীবনে সক্রিয় ভাবে হস্তক্ষেপ করতে শিক্ষা দেয়।** কথাটা মার্কস এই ভাবে বলেছিলেন : "দার্শনিকেরা জগৎকে নানা ভাবে কেবল ব্যাখ্যাই করে এসেছেন ; কিন্তু আসল কথা হলো তাকে পরিবর্তিত করা।"[১]

[illegible]

[illegible]। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, মার্কসীয় দর্শন কর্মের পথপ্রদর্শক,

---

১ মার্কস এণ্ড এঙ্গেলস সিলেক্টেড ওয়ার্ক'স খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০৫।

শ্রমিক শ্রেণীর একটা সংগ্রামী হাতিয়ার। বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা সজ্জিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণী মার্কসীয় আদর্শকে তথা সমগ্র প্রগতিশীল মানবজাতির আদর্শকে সার্থক করে তোলার জন্য নির্ভীক যোদ্ধার মতো লড়াই করে। এইজন্যই মার্কসবাদের আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত থেকে প্রথম ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াল **মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা, তত্ত্বগত অস্ত্রকে যুক্ত করা এমন এক বাস্তব শক্তির সঙ্গে যে ওই অস্ত্রকে চালনা করতে পারবে; সেই শক্তি হলো শ্রমিক শ্রেণী, জনগণ।**

লেনিনবাদই আমাদের যুগের মার্কসবাদ

এই ঐতিহাসিক ব্রতে ভ্‌লাদিমির লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) স্বীয় জীবনকে উৎসৃষ্ট করলেন। একজন মহীয়ান তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী রূপে তাঁর প্রথম কাজ ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদকে যুক্ত করা। এটা সহজ কাজ ছিল না, কেননা মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর পশ্চিমের বহু লেবার পার্টির সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রেরণাকে বর্জন করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন মার্কসবাদকে অপরাপর তত্ত্বের ও দার্শনিক মতবাদের সমতুল্য একটা তুচ্ছ, "সাধারণ" তত্ত্বে পরিণত করতে। লেনিন মার্কসবাদের পতাকাকে উঁচু করে তুলে ধরলেন এবং তাকে সকল ঝঞ্ঝাবাত্যার ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে গেলেন অন্তিম জয়লাভ পর্যন্ত। **রাশিয়ায় লেনিন ও কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজবাদকে যুক্ত করার ঐতিহাসিক কর্ত্তব্যকে সিদ্ধ করতে সফল হয়েছিলেন।** লেনিনবাদ হয়ে দাঁড়াল কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের ভাবাদর্শগত হাতিয়ার।

মার্কসবাদ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তার ঐকান্তিক বিশুদ্ধি যাতে এতটুকুও নষ্ট না হয়, লেনিন সেজন্য লড়াই করেছিলেন: শুধু তাই নয়, তিনি মার্কসবাদের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞাগুলির আরো বিস্তারসাধন করেছিলেন। কেননা লেনিনের জীবনকাল ছিল এক নূতন ঐতিহাসিক যুগ, সাম্রাজ্যবাদের যুগ। এই যুগে সমাজে যে সব পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল তাদের সঙ্গে তাল দরকার হয়ে পড়ল মার্কসবাদের মুখ্য, মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে, তার বিপ্লবী মর্মবাণীকে অটুট রেখে মার্কসবাদের প্রধান প্রতিজ্ঞাগুলির অধিকতর বিকাশ। লেনিন এই কাজটা সম্পন্ন করলেন। তিনি সেই মহৎ শিক্ষার স্রষ্টা যার নাম

লেনিনবাদ ; লেনিনবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেটারীয় বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার অন্তর্বর্তী কালের ও সাম্যবাদ সৃষ্টির যুগের মার্কসবাদ।

আমাদের কালে লেনিনের নতুন, মহৎ অবদানকে বাদ দিলে মার্কসবাদ বলে কোনো কিছু থাকতে পারে না। সুতরাং মার্কসবাদকে লেনিনবাদ থেকে পৃথক করার, একটিকে আর একটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর সকল চেষ্টা (বুর্জোয়া দার্শনিকেরা ও সংশোধনবাদীরা বর্তমানে অবিকল এই চেষ্টাই করছেন) শুধু একটাই উদ্দেশ্যের সহায়তা করে অর্থাৎ জনগণকে বর্তমান যুগের সর্বোত্তম বিপ্লবী তত্ত্ব থেকে দূরে রাখতে চায়। মার্কসবাদীরা এই ধরণের অপচেষ্টার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে লেনিনের চিন্তা ও গবেষণা দর্শনশাস্ত্রের বিকাশে একটা সমগ্র পর্যায়, একটা গোটা যুগ। এই যুগের ব্যাপ্তি উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত থেকে আমাদের স্বকাল পর্যন্ত। মার্কসীয় দর্শনে লেনিনের নূতন অবদান কি কি ?

প্রথমতঃ, লেনিন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে অনেক সমৃদ্ধতর করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিজ্ঞান বহু নূতন আবিষ্কার করেছিল ; এইগুলিকে আমরা পরবর্তী আলাপে আরো সবিস্তারে আলোচনা করব। এই সকল আবিষ্কারের ভিত্তিতে লেনিন শুধু যে মার্কসবাদের উপর বিজ্ঞানবাদীদের আক্রমণকে প্রতিহত করলেন তাই নয় ; তিনি মার্কসীয় দর্শনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে সংবর্ধিত করলেন। জড়বস্তু তত্ত্বকে ও প্রমাবিজ্ঞানকে তিনি অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি দ্বন্দ্বসমন্বয়ের সূত্রগুলির ও মূলপ্রত্যয়গুলির যে বিস্তারসাধন করলেন তার তাৎপর্য সুগভীর।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে লেনিনের অবদান বিপুল। নূতন ঐতিহাসিক যুগের প্রয়োজনানুসারে লেনিন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে মার্কসবাদের মুখ্য প্রতিজ্ঞাগুলিকে আরো যথার্থভাবে সূত্রায়িত করলেন। এইভাবে লেনিন **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নূতন তত্ত্ব** রচনা করলেন। তত্ত্বটি পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে এবং সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের গঠনকার্যে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। অদ্যাবধি তত্ত্বটি শ্রমিক

শ্রেণীর ও তার অগ্রবাহিনীর, সমস্ত পৃথিবীর কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির কর্মসূচীর পথনির্দেশক।

লেনিন মার্কসীয় **শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বের** সমৃদ্ধিসাধন করলেন এবং শ্রেণীগুলির সংজ্ঞানিরূপ করলেন। তিনি **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে মার্কসীয় শিক্ষাকে** আরও বিকশিত করে তুললেন; সংশোধনবাদীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তিনি এই তত্ত্বের পক্ষসমর্থন করলেন। তিনি **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তত্ত্ব** প্রণয়ন করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে, সোভিয়েত সংস্থা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের এক নূতন রূপ।

সোভিয়েত রাশিয়ায় **সমাজতন্ত্রের ও সাম্যবাদের গঠনের জন্য** লেনিনীয় পরিকল্পনার তাৎপর্য ছিল সুবিপুল। সাম্যবাদের বাস্তব ও কারিগরী ভিত্তির রচনার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে যে বিরাট যোজনাসূচী গৃহীত হয়েছিল তার পিছনে ছিল লেনিনের এই সূত্র: "সাম্যবাদ হলো সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি ও সমগ্র দেশের বিদ্যুতায়ন, এই দুইয়ের যোগফল।"

লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ও অন্যান্য ভ্রাতৃস্থানীয় কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক পার্টির সর্বাগ্রগণ্য নেতাদের দ্বারা মার্কসীয় দর্শন আরো বিকশিত হয়ে চলেছে। তাঁদের তত্ত্বগত রচনা, পার্টির কংগ্রেসে ও কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে তাঁদের রিপোর্ট ও বক্তৃতা, তাঁদের ব্যবহারিক কাজকর্ম, এইগুলি কর্মব্রতী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টান্ত, সাম্যবাদের জন্য লড়াইয়ের নূতন অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশের দৃষ্টান্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ২০শ, ২১শ ও ২২শ কংগ্রেস মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে যে সকল নূতন অবদান করেছিল, তাদেরই গুরুত্ব সমধিক। উক্ত কংগ্রেসগুলির দলিলে এই সব মুখ্য প্রশ্নগুলির সৃষ্টিমূলক সমাধান পাওয়া যায়, যথা: আজিকার দিনে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব; সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাম্যবাদী সমাজে বিকশিত হওয়ার নিয়মাবলী; সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির একই সময়ে সাম্যবাদ পর্বে উত্তরণ; সাম্যবাদের বাস্তব ও কারগরী ভিত্তি সৃষ্টি করার উপায়; সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও নবমানবের শিক্ষন; পুঁজিবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক পর্বে রূপান্তরের বহুবিধ প্রকার; বর্তমান যুগের চরিত্র; আমাদের জীবিতকালে বিশ্বযুদ্ধকে নিবারণ করার সম্ভাবনা; এবং

অন্যান্য সমস্যা। সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেস সাম্যবাদী সমাজ-নির্মাণের মহৎ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল; এটাকে সঙ্গত ভাবেই বলা হয় একালের সাম্যবাদী ইস্তাহার।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, মার্কসীয় তত্ত্ব অবিরত বিকাশলাভ করছে। বাঁধাধরা বাসি গৎ মার্কসবাদের পক্ষে অসহ্য।

মার্কসবাদী সৃষ্টি-শীল চরিত্র

যদি কেউ জীবনের সকল অবস্থায় একই বাঁধা ছককে মেনে চলে তাহলে আমরা তার সম্বন্ধে কি বলতাম? অন্তত এইটু বলতাম যে, ব্যক্তিটি কেমন যেন একটু ছাঁচে ঢালা গোছের। এই ধরণের লোকের মনোভাবকে বলা হয় যুক্তিহীন মতান্ধতা। তাঁর কাছে প্রতিটি কথাই হলো একটা আপ্তবাক্য,এমন একটা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় তত্ত্বকথা যার কোনো অন্যথা হতে পারে না, যদিও বস্তুত জীবন অনেক দিন আগেই তার খণ্ডন করেছে। সকল ধর্মই এইরকম মতান্ধ হতে শেখায়। ধর্ম জোরের সঙ্গে বলে, চাই গির্জানিঃসৃত বাণীতে বিশ্বাস, গির্জার বাণীগুলি তর্কাতীত সত্য, এমন কি যদিও তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের ও সহজবুদ্ধির স্পষ্টতই বিরোধ আছে।

কোনোপ্রকার মতান্ধতার সঙ্গে মার্কসবাদ খাপ খায় না। যিনি যুক্তিহীন মতবাদের আশ্রয়ী তিনি বাস্তব সত্য সম্বন্ধে উদাসীন, "শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে" তিনি যা শিখেছেন তাইতেই তিনি বিভোর হয়ে থাকেন তাঁর অনুমতগুলো তিনি যাচাই করে দেখতেও চান না। মতান্ধতা জীবনের সব ঘটনাকে হুমড়ে মুচড়ে একটা প্রাণহীন ঠাটের মধ্যে ঢোকাতে চায়। এটা করতে গিয়ে তা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ ও বিপ্লবী চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করে। মার্কসবাদ কিন্তু বলে যে, সৃষ্টিকামী মন নিয়ে বস্তুজগতের সম্মুখীন হতে হবে। তার মানে এই যে, শাস্ত্র কি বলেছে তার দ্বারা চালিত হলে চলবে না, বরং কর্তব্যনির্ণয়ে নির্ভর করতে হবে জীবন ও প্রযুক্তির উপর, উপরন্তু আজকের দিনের প্রযুক্তির উপর।

লেনিন সেই সব মতান্ধ লোকেদের বিদ্রূপ করেছিলেন "তাঁদের শাস্ত্রই ধ্যান, শাস্ত্রই জ্ঞান, শাস্ত্রবাক্যের পুনরাবৃত্তিই তাঁদের কাজ, কি আছে ওইস শাস্ত্রবাক্যে এ বিষয়ে তাঁরা একান্তই অজ্ঞ।"১ লেনিন সেই ধরণের নেতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, "যাঁর মাথার মধ্যে উদ্ধৃতবচনের একটা বাক্স, সেটিকে

১ লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৯, রুশ সং, পৃঃ ৩৩২

তিনি কেবলই ফলাও করছেন ; কিন্তু যদি বইয়ে লেখা নেই এমন একটা নূতন অবস্থা উদিত হয় অমনি তাঁর সব গোলমাল হয়ে যায় এবং তিনি বই থেকে নির্ঘাৎ সেই উদ্ধৃতিটিই হাজির করেন যেটা নিতান্তই অপ্রযোজ্য।"১

সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি মতান্ধতার ঠিক বিপরীত। সৃষ্টিশীল মনোভাব নূতনতম অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনিই সৃজনশীল মনস্বী যিনি স্থাণুত্ব ও বাঁধা গৎ সইতে পারেন না, যিনি "শাশ্বত" সত্য, অন্ধ মত ও অপরিবর্তনশীল অবস্থাকে স্বীকার করেন না। প্রকৃত মার্কসবাদী তত্ত্ব ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, উভয় দিক থেকেই যা অভিনব ও প্রগতিশীল তার সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি সর্বদা চোখ মেলে থাকেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো কর্মক্ষেত্রে প্রাণপ্রাচুর্য এবং নূতনের জন্য সৃষ্টিশীল সন্ধান।

ঐতিহাসিক দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের দলিল ও সিদ্ধান্তগুলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে সৃজনশীল মনোভাবের এক নিদর্শন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন ঐতিহাসিক অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রধান প্রধান তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তগুলির অধিকতর বিস্তারসাধন আবশ্যক হয়ে পড়ল, যথা: সোভিয়েত রাষ্ট্র ; শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ; জাতি-সমূহের বিকাশ ও পারস্পরিক মৈত্রী ; শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এবং মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সামাজিক-রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও ও জনকল্যাণমূলক তারতম্যগুলির দূরীকরণ ; সাম্যবাদী সমাজগঠনের পদ্ধতি ইত্যাদি। নূতন অবস্থায় পার্টি মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের এই সকল মুখ্য সমস্যাকে যথা প্রয়োজনীয় ভাবে আলোচনা ও মীমাংসা করছে। সোভিয়েত সমাজে যাঁরা কাজ করছেন এবং যাঁরা তাঁদের শ্রমের দ্বারা সাম্যবাদের মহিমাময় সৌধের নির্মাণকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন, তাঁদের কাছে দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি একটা সত্যকার প্রেরণা।

এই সৃষ্টিশীল যাত্রাপথে কি ধরনের বিশ্বদৃষ্টি আবশ্যক? তত্ত্ববিদ্যা নয় কেননা আমরা দেখেছি, তা শুধু মতান্ধতারই জন্ম দেয়, বিকাশকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয় বিদ্যার চোখে জগৎ প্রতিনিয়তই গতিশীল, পরিণামী ও বিকাশমান ; কোনো তর্কাতীত, "শাশ্বত," "অব্যয়" শাস্ত্রবাক্য

---

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, পৃঃ ৩৩৫

তার কাছে অগ্রাহ্য। দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা নবায়নের অনুপ্রেরক। যেহেতু তা লেনিনের ভাষায়, মার্কসবাদের বিপ্লবী আত্মা, তাই মূলতঃ তা সৃষ্টিশীল।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আয়ত্ত করার অর্থ হলো তার জঙ্গী, বিপ্লবী প্রেরণার দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া, বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থায়, কার্যক্ষেত্রে, তাকে প্রয়োগ করার কৌশল অবগত হওয়া। মার্কসীয় তত্ত্ব রূপান্তরসাধক; তার এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি উদ্ধৃতিকে মুখস্থ করলে বা মার্কসবাদকে শাস্ত্রবচনমালায় পরিণত করলে চলবে না। কর্মের সহায়ক ও বড় বড় ব্যবহারিক কর্তব্যের সম্পাদনে পথপ্রদর্শক রূপে মার্কসবাদকে বুঝতে হবে।

তৃতীয় কথা

জড়বস্তু কী এবং কি রূপে তা বিরাজ করে ?

> সবিষয় অস্তিত্বে জগৎ বিদ্যমান ; জগতের প্রকৃতি ভৌতিক

আমাদের জীবন থেকে, আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক কার্যকালাপ থেকে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি যে, জগৎ মানুষের থেকে, তার চৈতন্য, সংবেদনা, কামনা বাসনা থেকে স্বাধীন ভাবে বহির্বিষয়ক অস্তিত্বে বিদ্যমান। বিজ্ঞান ও এই কথারই সমর্থন করে যখন তা প্রমাণ করে যে, জীবশরীর বা মানুষের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই পৃথিবী ছিল, অর্থাৎ তা ছিল তাদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই। জগতের এই বিষয়মুখ চরিত্র অর্থাৎ চৈতন্যবহির্ভূত ও চৈতন্যস্বতন্ত্রতার অস্তিত্ব থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, তা **বস্তুধর্মী**।

প্রশ্ন হতে পারে : যেহেতু সবিষয় বিজ্ঞানবাদীরা স্বীকার করেন যে, জগতের অস্তিত্ব মানবচৈতন্য-বহির্ভূত, এর থেকে কি বলা যায় না তাঁরা জগতের বাস্তব প্রকৃতিকে মানেন ? না, কখনই না। এ কথা সত্য যে ভাবগত বিজ্ঞানবাদীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে সবিষয় বিজ্ঞানবাদীরা স্বীকার করেন যে জগতের অস্তিত্ব মানুষের চৈতন্য বহির্ভূত। কিন্তু তা চৈতন্য নিরপেক্ষ একথা তাঁরা মানেন না ; তাঁরা মনে করেন চৈতন্য থেকেই জগতের উদ্ভব হয়েছে। বস্তুবাদী তত্ত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্টই এই যে, তা জগতের বাস্তব প্রকৃতিকে—**চৈতন্যবহির্ভূত ও চৈতন্যনিরপেক্ষ তার অস্তিত্বকে**—স্বীকার করে। লেনিনের বস্তু তত্ত্বের মূলে আছে এই মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞা।

অসংখ্য বস্তু ও ঘটনা পরিবৃত হয়ে আমরা বাস করি। গাছপালা, পাথর, সূর্য, বালি, জন্তুজানোয়ার, স্বয়ংক্রিয় লেদ, সমুদ্র, গ্রহতারা এবং এরা ছাড়া আরও অনেক কিছু—কিন্তু এদের সবগুলিকে একটি মাত্র শব্দ **জড়বস্তু** দিয়ে আমরা অভিহিত করি। হয়ত আপনাদের ভাবতেই অবাক লাগছে যে একটামাত্র শব্দ দিয়ে এত পৃথক এত ভিন্ন জাতীয় অসংখ্য ঘটনা ও পদার্থকে কি করে বোঝান যাবে। কেন যে যায় একটু ভাবলেই সহজে বুঝতে পারবেন।

জড়বস্তু সম্পর্কে লেনিনের ধারণা

ভেবে দেখুন, পৃথিবীতে কত ফুল আছে। অসংখ্য, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ফুল। কিন্তু আমাদের একটি মাত্র কথা আছে "ফুল" এবং ওই একটি কথা, গোলাপ, চাঁপা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি। এর চেয়ে আরও জটিল একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করুন আপনি একটি চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। আপনার হাতে একটি পেনসিল আছে, এবং আপনার পাশে আছে কলম, কাগজ, কালি। টেবিলের উপর আছে একটি টেবিলল্যাম্প এবং কাছেই আছে একটি বই-এর আলমারি। একটি মাত্র নামে আপনি কি বই, পেন্সিল, টেবিল ইত্যাদি বোঝাতে পারেন? নিশ্চয়ই পারেন, কারণ তারা সবই পদার্থ। "পদার্থ" কথাটি তাদের সবার উপর প্রযোজ্য। যুক্তিবিদ্যায় একে বলা হয় **প্রত্যয়**।

কিভাবে এই রকম প্রত্যয় রচিত হয়? যদিও সব ফুলে প্রভেদ আছে, তাহলে তাদের মধ্যে মিলও আছে অনেক। তাদের মধ্যে এই মিলের দিকটা তাদের সাম্প্রদায়িক প্রত্যয় "ফুলের" অন্তর্ভুক্ত করে। যে সব লক্ষণের ফলে একটি ফুল অন্য ফুলের থেকে পৃথক সেইগুলি এই প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, অপরপক্ষে কেবলমাত্র সেই লক্ষণগুলিই অন্তর্ভুক্ত হয় যেগুলি সব ফুলের সাধারণ লক্ষণ। আমরা ফুলে ফুলে প্রভেদের দিকগুলি বাদ দিই, কিংবা তথাকথিতভাবে সেইগুলি থেকে বিমূর্ত করি (যেন সেইগুলিকে "অগ্রাহ্য করি")। অতএব এই ধরণের প্রত্যয়কে **বিমূর্ত** বলা হয়।

অতএব **প্রত্যয়ে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন বস্তুর ও ঘটনার সাধারণ ও সারভূত লক্ষণগুলি, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে, প্রত্যয়ে তা প্রতিফলিত হয় না।**

হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, কোন কোন প্রত্যয় অন্যান্য প্রত্যয়ের থেকে

ব্যাপকতর ক্ষেত্রের বস্তু ও ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন "পদার্থ" প্রত্যয়টি "কলম" বা "টেবিল" প্রত্যয়ের থেকে অনেক বেশি ব্যাপক। শেষেরগুলি "পদার্থ" প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন : এমন প্রত্যয় কি আছে যা অত্যন্ত ব্যাপক, যার পরিধি সম্ভাব্যতার শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ? এরকম প্রত্যয় আছে। যদি এমন কোন প্রত্যয় থাকে যার মধ্যে সব রকমের বস্তু ও ঘটনা, একটা বালুকণা থেকে মানুষের মস্তিষ্ক পর্যন্ত সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত, তবে সেই প্রত্যয়ের পরিধি ব্যাপকতম, বলা যেতে পারে।

"জড়বস্তু" এই ধরণের প্রত্যয়। এই থেকে বলা যায় "জড়বস্তু" "ফুল" বা "পদার্থের" মত একটি প্রত্যয়, তবে তা অত্যন্ত ব্যাপক, যতখানি ব্যাপক হওয়া সম্ভব। সাধারণ প্রত্যয় থেকে এর তফাৎ এই যে, এই প্রত্যয় যে সাধারণ ও সারভূত বিশেষত্বগুলি প্রকাশ করে তা কোন এক শ্রেনীর পদার্থের নয়। জাগতিক সব পদার্থের ও ঘটনার—আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবার বিশেষত্ব তা প্রকাশ করে। দর্শন ব্যাপকতম পরিধির প্রত্যয় নিয়েই অনুশীলন করে। তাদের বলা হয় **দার্শনিক মূল প্রত্যয়। জড়বস্তু একটি মূলপ্রত্যয়।**

সমস্ত পদার্থের মধ্যে তাহলে কোন ধর্মগুলি সাধারণ ও সারভূত, কি কি অভিন্নতা তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ? এই গুণগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ এই যে, সব পদার্থেরই প্রকৃতি বাস্তব, বিষয়গতভাবে, অর্থাৎ মানুষের চেতনা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে তাদের অস্তিত্ব। তাদের সবারই এই এক ভিত্তি।

পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুর কি এইটেই একমাত্র গুণ ? না, তা নয়। তাদের সবার আরো একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ গুণ আছে। যেমন ধরুন, আমরা যখন গরম জলে হাত ধুই, আমরা গরম বোধ করি। আমরা যখন বনের গাছপালার দিকে তাকাই, আমরা অনেক রঙ দেখছি অনুভব করি, যেমন, বার্চ গাছের সাদা কাণ্ড, পাতার সবুজ রঙ। ফলত **যে সব পদার্থের অস্তিত্ব আমাদের থেকে স্বতন্ত্র, তাদের আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করার এবং অনুরূপ সংবেদন জাগিয়ে তোলার গুণ থাকে।**

পদার্থ ও ঘটনার ব্যাপকতম গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখন স্পষ্ট হয়েছে। জড়বস্তুর প্রত্যয় সম্পর্কে এখন আমরা সংজ্ঞা

নির্দেশ করতে পারি। মেটিরিয়ালিজ্‌ম এণ্ড এম্‌পিরিও-ক্রিটিসিজ্‌ম্ নামক গ্রন্থে লেনিন লিখেছেন: "জড়বস্তু একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয় যা বস্তুজগৎকে ব্যক্ত করে, যে বস্তুজগৎকে মানুষ তার সংবেদন দ্বারা জানতে পারে।... জড়বস্তু তাকেই বলে যা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে, সংবেদন জাগ্রত করে; জড়বস্তু আমাদের সংবেদনে পরিজ্ঞাত বিষয়ীভূত সদ্বস্তু ইত্যাদি।"১

তাহলে, জড়বস্তু তাই যা আমাদের ঘিরে রয়েছে, যা কিছু সবিষয় অস্তিত্বে বিরাজমান, অর্থাৎ বহিঃস্থিত সীমাহীন বাস্তব জগৎ, যা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর ক্রিয়া করে সংবেদন জাগ্রত করে।

আগের আলোচনা থেকে আপনাদের জানা আছে যে, প্রাচীনকালে (এবং শ'খানেক বছর আগে পর্যন্ত) কোন কোন বস্তুবাদীদের জড়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ছিল এই যে, সমস্ত পদার্থ বিশেষ একটি পদার্থ দিয়ে গঠিত। ডেমক্রিটাস যেমন পরমাণুকে মনে করতেন সমস্ত জড়বস্তুর প্রাথমিক ভিত্তি।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরমাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা ছিল, তা অবিভাজ্য, অবিনশ্বর ও চিরন্তণ। তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের "পরম উপাদান", তাই দিয়েই সমগ্র জগৎ গঠিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও এই মতের প্রচলন ছিল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জড়বস্তুর প্রাথমিক ভিত্তি সম্পর্কে এই রকম ধারণা কতখানি সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল।

কি এই সব আবিষ্কার?

প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পদার্থবিদ্ বেকেরেল দৈবাৎ ফোটোগ্রাফের ফিল্ম-এর একটি ঢাকা কাগজের কৌটোর পাশে কিছু আকরিক ইউরেনিয়াম রেখে দেন। কিছু কাল পরে তিনি লক্ষ্য করেন ফিল্মটা কালো হয়ে গেছে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আকরিক ইউরেনিয়াম থেকে অদৃশ্য রশ্মি বিকীর্ণ হয় এবং এই রশ্মি কাগজ ভেদ করে ফোটোগ্রাফের ফিল্ম কালো করতে পারে। এর থেকে সেই আশ্চর্য ঘটনার অনুশীলন আরম্ভ হল যার নামকরণ হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা।

---

১ লেনিন: কলেক্টেড ওয়ার্ক'স খণ্ড ১৪, পৃঃ ১৩০, ১৪৬।

বেশী দিন গেল না। নতুন একটি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হল। তার নাম দেওয়া হল রেডিয়ম। পরে এই "মহা বিপ্লবী" রেডিয়ম জগতে কম আলোড়নের সূত্রপাত করেনি।

রেডিয়ম থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি এমন কিছুর হদিস দিল যা, তখনো পর্যন্ত পরমাণু সম্পর্কে যা জানা ছিল তার একেবারে বিপরীত। দেখা গেল রশ্মিগুলি তিন প্রকারের সূক্ষ্ম কণিকায় গঠিত: আলফা (α) কণিকাগুলি ধন-তড়িৎবাহী, বিটা (β) কণিকাগুলি অথবা ইলেকট্রনগুলি ঋণ-তড়িৎবাহী, এবং গামা (γ) রশ্মি তড়িৎবিহীন। ইউরেনিয়াম পরমাণু দৃশ্য এই সূক্ষ্ম কণিকা-গুলিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু'হাজার বছরের অধিক কাল পর্যন্ত পরমাণু অবিভাজ্য, এই ধারণা সবাই পোষণ করত। বৈজ্ঞানিকেরাও প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন নিশ্চয় কোথাও কিছু ভুল হয়েছে।

কিন্তু কোথাও কোন ভুল হয়নি। পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যে সোজাসুজি বাতিল করতে হবে এই মত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। পরমাণুকে খণ্ডিত করা গেল। পরমাণু বিচূর্ণ হল। সেই সঙ্গে বিচূর্ণ হল অনেক পুরণো ধারণাও।

অন্যান্য আবিষ্কার থেকেও জড়বস্তু ও তার গুণাবলী সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা-গুলি মিথ্যা প্রমাণিত হল। যেমন, বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিখ্যাত পদার্থবিদ্ আলবার্ট আইনষ্টাইন দেখিয়ে দিলেন যে, গেলিলিও ও নিউটনের আমল থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে দেশ ও কাল সম্পর্কে যে ধারণা চলে আসছে তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আইনষ্টাইনের নতুন ভাবধারা থেকে **আপেক্ষিকতা তত্ত্বের** উদ্ভব।

নিউটনের সময় থেকে বৈজ্ঞানিকদের বিবেচনায় নিশ্চল বা সচল কোন বস্তুর ভর সর্বদাই স্থির ও অপরিবর্তনীয় থাকে। আধুনিক গবেষণায় কিন্তু জানা যায় ইলেক্ট্রনের ভর **স্থির থাকে না**, বেগের সঙ্গে সঙ্গে তাও **পরিবর্তিত হয়**।

অতএব, সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর অবিভাজ্যতা, ভরের স্থায়িত্ব, এবং দেশ ও কালের নিত্যতা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হল। লেনিনের কথা মত প্রকৃতি বিজ্ঞানে এই থেকে একটি বিপ্লবের সূত্রপাত হল।

ভাববাদী বুর্জোয়া দার্শনিকেরা এইসব আবিষ্কার নিজেদের কাজে লাগাতে দেরি করলেন না। তাঁরা এই যুক্তি দিলেন : যে অবিভাজ্য পরমাণু জড়বস্তুর মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য ছিল, দেখা যাচ্ছে তা খণ্ড খণ্ড হয়ে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অতএব বস্তুবাদ সৌধের মূল ভিত্তি এবং তার কেন্দ্রীয় পদার্থ-জড়বস্তু-আর টিঁকে থাকছে না।

অধিকন্তু ভর সব রকম দ্রব্যের ও জড়বস্তুর সারভূত গুণ বলে গণ্য হত। কিন্তু দেখা গেল, ইলেক্ট্রনের ভর তার বেগ অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। ফলতঃ, ভরের কিছু অংশ "অন্তর্হিত" হয়ে যায়। অতএব "জড়বস্তুও অন্তর্হিত হয়"। এই সব যুক্তি দেখিয়ে এই দার্শনিকেরা সিদ্ধান্তে এলেন : বস্তুবাদ দেউলিয়া হয়ে গেছে। যেহেতু এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় পদার্থবিদ্যার নবাবিষ্কৃত তথ্যাবলী, তাই ভাববাদী দর্শনের এই ধারার নাম দেওয়া হয় "ফিজিকাল আইডিয়ালিজম" বা ভৌত ভাববাদ। লেনিন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'মেটিরিয়েলিজম এণ্ড এম্-পিরিও-ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে এই নামকরণ প্রথম প্রচলিত করেন। ভাববাদীদের ধারণাগুলোকে লেনিন নির্মমভাবে নস্যাৎ করেন।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তবিক কি ঘটেছিল? নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছিল। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং এটমিক নিউক্লিয়াস-এর অস্তিত্বের কথা আগে জানা ছিল না। এই সব তথ্য থেকে আমাদের চোখে **জগতের প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক চিত্র**, বস্তুজগতের গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে গেল। কিন্তু এই সব নবাবিষ্কৃত তথ্য কি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে যে, ইলেক্ট্রন, এটমিক নিউক্লিয়াস ইত্যাদির স্বরূপ অবাস্তব? দেখা যাক।

জগতের প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক চিত্র

ইলেক্ট্রনের কি মানবস্বতন্ত্র, বিষয়গত অস্তিত্ব আছে, না, নেই? নিশ্চয়ই আছে। যেমন, বিদ্যুৎ; তা ইলেক্ট্রনের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রবাহ ছাড়া কিছুই নয়। এবং আমরা জানি মানুষের আবির্ভাবের আগেও বজ্রপাত হত।

কোন কোন ভাববাদী দার্শনিক এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ইলেক্ট্রনের স্বরূপ অবাস্তব, যেহেতু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর তার কোন ক্রিয়া নেই, যেহেতু তা অদৃশ্য। কিন্তু তা ঠিক নয়। ইলেক্ট্রন এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম কণিকা অত্যন্ত নিপুণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়। তাদের গতিপথের আলোকচিত্রও

নেওয়া যায়। অতএব আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর তারা ক্রিয়া করে, যদিও তা করে বিশেষ যন্ত্রের মারফৎ। অতএব এই কণিকাগুলির বিষয়গত অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর তাদের ক্রিয়াও আছে। অতএব তাদের স্বরূপ বাস্তব।

লেনিন এই জন্যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বস্তু লেশমাত্র "অন্তর্হিত" হয় নি। কেবল বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার ধারণা ছিল, জগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বা পরমাণুতে গঠিত। এখন আমরা অনেক বেশী জেনেছি, আমাদের জ্ঞান অনেক বেশী গভীর হয়েছে। আমরা আবিষ্কার করেছি যে, আরো ক্ষুদ্র কণিকার, ইলেক্ট্রনের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ইলেক্ট্রন পরমাণুর সবই অক্ষয়। এর অর্থ, বিজ্ঞানের সহায়তায় জগতের গভীর থেকে গভীরতর প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক ছবি প্রকট হবে, যেহেতু বস্তুর মূর্ত রূপের গুণ, অবস্থা ও গঠন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অধিক থেকে অধিকতর হতে থাকবে।

লেনিনের উক্তি সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুর গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন আবিষ্কার করেছে। প্রথমে কেবলমাত্র ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের কথাই জানা গিয়েছিল, কিন্তু এখন ৩০-এরও অধিক "মৌলিক" কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব, কেবলমাত্র এটমই নয়, ইলেক্ট্রন ও অপর কণিকাগুলিও **বাস্তবধর্মী**। বস্তুবাদের মোটেই "উচ্ছেদ" হয়নি।

সাবস্টান্স ও **ফিল্ড** বা **জড়বস্তু** ও **ক্ষেত্র**—বস্তুর এই দুটি মৌলিক রূপের অস্তিত্ব একটি প্রধান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিষয়। লেনিন দর্শনের দিক থেকে এই তত্ত্বের সত্যতা প্রতিপাদন করে গেছেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে জড়বস্তু বস্তুরই একটি রূপ, তা নিজস্ব ভর সমন্বিত (স্থিতাবস্থার ভর) বস্তু কণিকা দ্বারা গঠিত। তথাকথিত মৌলিক কণিকাগুলি তাদেরই অন্তর্গত।

ক্ষেত্র একটি বাস্তব গঠন বিন্যাস যা বিভিন্ন বস্তুসত্ত্বার মধ্যে পারস্পরিক যোগ সাধন করে এবং একটি বস্তুসত্ত্বা থেকে অন্য বস্তুসত্ত্বায় ক্রিয়া সঞ্চারিত করে। এইরূপ ক্ষেত্র তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র (তারই একটি প্রকারান্তর আলোক), মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, এবং এটমিক নিউক্লিয়াস'-এর সূক্ষ্ম কণিকাগুলির যোগসাধনকারী নিউক্লিয়ার ক্ষেত্র।

এই দুই প্রকারের বস্তুকে—জড়বস্তু ও ক্ষেত্রকে—পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কোন কোন অবস্থায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক রূপবিনিময় ঘটে। যেমন দুটি বস্তু কণিকা—ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের একটি জোড়—কয়েকটি নির্দিষ্ট অবস্থায় ফোটনে রূপান্তরিত হয়, যে ফোটন তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের কণিকা। এর মর্ম এই যে, বস্তুর এক ধরণের রূপ অর্থাৎ জড়রূপ—আরেক রূপে—আলোয় রূপান্তরিত হল; আলো মানে তড়িৎচুম্বকীয় কম্পন, যা তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রেরই নামান্তর। এর থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতিতে ভর, কোন অবস্থাতেই অন্তর্হিত হয় না।

লেনিনের কাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানেই যে, তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বস্তুবাদের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়ে দেন, তত্ত্ববিদ্যাগত বস্তুবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের গোলমাল করলে চলবে না। তত্ত্ববিদ্যার মতে অব্যয় ও অবিনশ্বর পরমাণু দিয়ে বস্তু গঠিত। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের প্রথম কথাই হচ্ছে বস্তুকে পরমাণুরূপ "পরম উপাদানে" পর্যবসিত করা যায় না; কিংবা তাকে কোন প্রকার "চিরন্তন" গুণমণ্ডিতও করা যায় না। বস্তুর মাত্র একটা গুণই নেই, তার গুণ অসংখ্য; জগতে যেমন বস্তুর বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, তেমন তাদের গুণেরও অন্ত নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সেই জন্যেই লেনিন লিখেছিলেন: "আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান প্রসব-যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে। তা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের জন্ম দিচ্ছে।"[১]

লেনিন আরও বুঝিয়েছিলেন যে, বিষয়ীভূত সদ্বস্তু বলে বস্তুর যে দার্শনিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে, তার সঙ্গে বস্তুর গঠনতত্ত্বের যেন বিভ্রান্তি না হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজ বস্তুর গঠন বিষয়ক প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা যথা, বস্তু এটমে বা ইলেকট্রনে গঠিত কি না, তাতে আরও সূক্ষ্ম কণিকা আছে কিনা। দর্শন কিন্তু অন্য প্রশ্নের মীমাংসা করে: এই জগতের, সুতরাং এইসব কণিকার, মানুষের চৈতন্যনিরপেক্ষ বিষয়গত অস্তিত্ব আছে কিনা। ফলত, বিজ্ঞান যে কোন নতুন "কণিকা" আবিষ্কার করুক না কেন (এবং তা নিত্য নতুন আবিষ্কার করে চলেছে) বস্তুবাদকে কখনই অগ্রাহ্য করা যাবে না, কারণ এই কণিকা-

---

১ লেনিন, *কলেক্টেড্ ওয়ার্কস্*, খণ্ড ১৪, পৃঃ ৩১৩

গুলিও বাস্তবধর্মী। তারা মানুষ ও মানবজাতি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় অস্তিত্বে বিরাজ করে।

অতএব **বস্তুর দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে জগতের প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক চিত্র বিষয়ক প্রশ্নটির বিভ্রান্তি যেন না হয়।** বস্তুর মূর্ত রূপের গুণ, অবস্থা ও গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণার, অর্থাৎ জগতের প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক চিত্র-রূপের নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে, যেহেতু বৈজ্ঞানিকরা জগৎ এবং তার গঠন বিন্যাস সম্পর্কে গভীর থেকে গভীরতর জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন। এর থেকে প্রতিপন্ন হয়, নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে জগতের প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক চিত্র-রূপ সম্পর্কে প্রাচীন জ্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, কিন্তু বস্তুর দার্শনিক প্রত্যয়, যার বিষয়বস্তু জগতের গঠন বিন্যাস নয়, তার বাস্তব অস্তিত্ব অভ্রান্তই থেকে যাচ্ছে। জগতের এই চিত্ররূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণার যতই পরিবর্তন হোক না কেন, কোন অবস্থায়ই তার দ্বারা বস্তুর অন্তর্ধান সমর্থিত হবে না। লেনিনের কথায় বলতে গেলে, যা অন্তর্হিত হয় তা হচ্ছে বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমারেখা। কিন্তু জগতের বাস্তব প্রকৃতি, বস্তুর বিষয়ীভূত সদ্বস্তুরূপ নতুনভাবে সমর্থন লাভ করে।

বস্তুতত্ত্ব ঈশ্বর বিশ্বাসকে খণ্ডন করে

কিন্তু ভাববাদীরা বস্তু সম্পর্কে এই ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এত উদ্‌গ্রীব কেন? ফরাসী ক্যাথলিক দার্শনিক আলফ্রেড অঁাসেল বলেন যে, মার্কসবাদে যা তিনি অত্যধিক অপছন্দ করেন তা হচ্ছে "বস্তুর দ্বন্দ্বসমন্বয়ী তত্ত্ব।" তাঁর মতে "ধর্ম প্রতিষ্ঠান মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যেত না, যদি জগতের উৎপত্তি ও বিকাশে ঈশ্বরের সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপকে মার্কসবাদ খামখেয়ালীভাবে বাতিল না করত; মার্কসবাদের যদি নিন্দা করতে হয়, তা একমাত্র তার বস্তুবাদের জন্য।" বোঝা যাচ্ছে, এইটেই মার্কসবাদী দর্শনের "গোড়ার গলদ।"

বস্তুতত্ত্ব কোনরকম ঐশী হস্তক্ষেপ স্বীকার করে না। জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে ধর্মীয় কল্পনাগুলি বস্তুতত্ত্বের বিচারে অর্থহীন। সব ধর্ম যে বিষয়ে একমত তা এই, বিধাতা "শূন্য থেকে" জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞান কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, প্রকৃতিতে শূন্য থেকে কোন কিছুরই উদ্ভব হয় না এবং নিশ্চিহ্নভাবে কোন কিছুই অন্তর্হিত হয় না। বিজ্ঞানে এই কথাটিই একটি বিশেষ সূত্রের আকারে বলা হয়, তা হচ্ছে ভরের নিত্যতার

সূত্র, কিংবা, প্রকারান্তরে, বস্তুর নিত্যতার সূত্র। বস্তুবাদ যে সিদ্ধান্তে এসেছে তাই একমাত্র সম্ভবপর সিদ্ধান্ত : **বস্তুর কখনও উৎপত্তি হয়নি, তা চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবেও। জগৎ চিরন্তন, এর কোন স্রষ্টা নেই।** বস্তুর চিরন্তনতা প্রতিপাদক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে চরমভাবে উৎসাদন করে।

বস্তুর চিরন্তনতা তত্ত্ব মার্কসবাদী দর্শনের শিক্ষার্থীদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগায়। তাঁরা প্রশ্ন করেন : "এ কেমন কথা, বস্তু চিরকাল রয়েছে ? কোন এক সময়ে তার কি উৎপত্তি হয় নি ?" এই প্রশ্ন শুনে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষ তার জীবদ্দশায় দেখে সব কিছুর শুরু হয়, শেষও হয়। সেইজন্যেই তার জিজ্ঞাসা, কে বস্তু সৃষ্টি করেছে ? বিজ্ঞান এর উত্তরে বলে : তা চিরকাল ধরেই আছে।

গ্রীক সভ্যতার পুরাকালেও হিরাক্লিটাস লিখে গেছেন যে, এই জগৎ কোন মানুষ বা ভগবান সৃষ্টি করে নি, এই জগৎ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণ কি ?

এর সপক্ষে তথ্যের অন্ত নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, **বস্তুর নিত্যতার সূত্র।**

একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা যাক। আপনারা উনুনে কাঠ জ্বালান। প্রথমে দেখলেই মনে হবে কাঠটা অন্তর্হিত হয়ে গেল, অবশিষ্ট রেখে গেল সামান্য একটু ছাই। কিন্তু জ্বলবার ফলে যা যা হয়েছে তা যদি যত্নে ওজন করা যায়, দেখা যাবে ওজন কমা ত' দূরের কথা, কিছুটা বেড়েছে। কারণ কাঠটা পোড়বার আগে তাতে যা যা জড়বস্তু ছিল, সেগুলিতে তা ত' আছেই, উপরন্তু জ্বলবার সময় বাতাস থেকে যা নিয়েছিল, তাও রয়েছে।

বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক লোমোনোজোভ এই ধরণের ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন দ্রব্য বা উপাদান নিশ্চিহ্ন করা যায় না, শূণ্য থেকেও তার আবির্ভাব ঘটে না। তিনি এই ধারণা বস্তুর নিত্যতার সূত্রে সূত্রবদ্ধ করেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাকৃতিক বিধান থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বর কর্তৃক শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টির ধর্মীয় পুরাকথা একেবারেই ভ্রান্ত। যদি আমরা ধরে নিই, এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই ছিল না অর্থাৎ বস্তুর

অস্তিত্বই ছিল না, তাহলে যার থেকে বস্তুর উৎপত্তি হবে, তাও ছিল না। কিন্তু যেহেতু বস্তু আছে, তার মানে কখনই এর উদ্ভব হয়নি, তা চিরকাল ধরে আছে এবং থাকবেও। বস্তু চিরন্তন ও অমর। বস্তুর চিরন্তনতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্বসৃষ্টির ধর্মীয় বিশ্বাসকে চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে।

উপরন্তু, যেহেতু পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতে বস্তুই সব কিছুর উৎস ও ভিত্তি, এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে না যার অস্তিত্ব বিষয়গত ও বাস্তবভাবে নেই এবং যা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা, ভৌত যন্ত্রের দ্বারা, কিংবা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুশীলনযোগ্য নয়। তাই যদি হয়, তাহলে দেবদূত বা দেবযোনি নিয়ে ধর্মীয় রূপকথার কিংবা দৈব অনুগ্রহের কোন সুযোগই তো নেই।

বাস্তবিক যদি দেবদূত থাকেই, তাহলে কোন না কোন ভাবে তারা দেখা দেয় না কেন? এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনগুলিও মানুষের পরীক্ষার আওতায় এসেছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে হোক, যন্ত্রপাতি দিয়ে হোক, কিংবা অন্য যে কোন উপায়েই হোক, দেবদূতদের ধরা যাচ্ছে না কেন? তাদের না দেখা গেল, তাদের "কার্যকলাপের" ফলাফলও তো দেখা যায় না। জগতে কি এমন কিছু আছে যার সম্বন্ধে একথা বলা যায়: এটি দেবদূতের কীর্তি? না, কিছুই নেই। ফলতঃ, ঈশ্বরই বলুন, দেবদূতই বলুন, "পরলোকই" বলুন, কিছুই নেই। গির্জা এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রতিপাদন করতে অক্ষম। সেই জন্যেই ভাববাদীদের কাছে, গির্জার মোহান্তদের কাছে জড়বস্তুর বস্তুবাদী প্রত্যয় এত ঘৃণ্য। সেই কারণেই "বস্তু অন্তর্হিত হয়েছে" বলে তারা এই সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যুক্তিতে পারে না বলে তারা বস্তু প্রত্যয়ের যথার্থ অর্থকে বিকৃত করে।

তারা যুক্তি প্রদর্শন করে: ধরে নাও জড়বস্তু অনন্তকাল ধরে আছে। তার থেকে বস্তুবাদের কোনই লাভ হবে না। সুদূর, বিপুল সুদূরের কথা কল্পনা করা যাক, যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব ঘটেনি, যখন শুধু আছে আকারহীন নিশ্চল এক ধরণের জড়বস্তু। তা এই অবস্থায় প্রায় অনন্তকাল ধরে রইল। কিন্তু এমন এক সময় এল যখন জড়বস্তুকে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত জড়বস্তু যদি নিশ্চল থেকে থাকে, তাহলে হঠাৎ কি করে তার মধ্যে গতির সঞ্চার হল? ভাববাদীরা এবং

ধর্মনেতারা বলেন, বস্তুর ভিতরে এমন কোন কারণ থাকতে পারে না যার থেকে এই পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্বভাবত প্রকৃতি ও জড়বস্তু থেকে পৃথক এবং তার বহির্ভূত এমন কোন শক্তি থাকতে বাধ্য যা এই জড়বস্তুকে তার নিশ্চল "সুপ্ত" অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলেছে। এই শক্তিই ঈশ্বর।

কিন্তু বস্তুর মধ্যে এই আবেগ সঞ্চারের জন্যে বাস্তবিক কি কোন উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন আছে?

জড়বস্তু গতিশীল

মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করুন গতি কি, তিনি সম্ভবত এই ধরণের কিছু একটা বলবেন: "গতি মানে স্থান বদল। যদি কোন পদার্থ এক জায়গায় থাকে, তবে তার গতি নেই। যেমন, একটা পাথর, তা স্থান পরিবর্তন করে না, যদি না কেউ তা ছুঁড়ে দেয়।" কিন্তু নিশ্চল পাথরটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। সব সত্ত্বেও, তার মধ্যে গতিক্রিয়া কাজ করে যাচ্ছে: এটম, মলিকিউল, ইলেকট্রন, প্রোটন, যা, আমরা জানি, সমস্ত পদার্থের মধ্যেই আছে, নিয়ত গতিশীল। একটা বাড়ির কথা যদি বলেন, তাও নিশ্চল নয়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তার সঙ্গে বাড়িটাও ঘুরছে। মনে করুন, আমরা একটা সভায় বসে আছি এবং একটুও নড়চড়া করছি না। তবু কিন্তু আমাদের দেহে রক্ত সংবহন হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দেহের মধ্যে জটিল গতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে; নতুন জীবকোষ তৈরি হচ্ছে এবং পুরণো জীবকোষ মরে যাচ্ছে বা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটাও গতিক্রিয়া, এর থেকে বোঝা যায় গতি সম্পর্কে যা ভাবা হয় তার থেকে সমস্যাটা অনেক বেশী জটিল।

লোকে একটা পাথরকে পড়ে থাকতে দেখে যতক্ষণ না তা ছুঁড়ে ফেলা হয়, দেখে একটা মোটরগাড়ি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না ড্রাইভার তা চালায়। মোটামুটি এই ধরণের যুক্তির উপর নির্ভর করেই ধর্মনেতারা তাঁদের অভিমত গড়ে তোলেন যে, জড়বস্তু নিশ্চল অবস্থাতে ছিল যতক্ষণ না একটা উচ্চতর শক্তি মানে ঈশ্বর তাতে "প্রথম আবেগ" সঞ্চার করেন। এমনকি নিউটনের মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকও বস্তুর নিজস্ব সত্তা থেকে তার গতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তাঁর মতে ঈশ্বর প্রকৃতিতে "প্রথম আবেগ" সঞ্চার করেন, ঈশ্বর "ঘড়িতে দম দিয়ে দেন" এবং তার পরেই গতিক্রিয়া জড়বস্তুর সহজাত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জড়বস্তুর এই রকম মৃত, নিশ্চল

অবস্থা কি সম্ভব? অন্যভাবে বলতে হলে: এমন সময় কি কখনো ছিল যখন শুধু জড়বস্তু ছিল অথচ গতিক্রিয়া ছিল না?

প্রায় দুশ বছর আগে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল গতির একটি মাত্র রূপ—দেশগত স্থানচ্যুতি। সেই সময় ধরে নেওয়া সম্ভব ছিল যে একটি পদার্থ নিশ্চল অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না কোন বাইরের শক্তি তাকে সেই অবস্থাচ্যুত করে। এই ধারণা তখন সমগ্রভাবে প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ ও জীববিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল গতির অনেক প্রকারভেদ আছে।

যেমন ধরুন, তাপ। দেখা গেল, অসংখ্য অণুর গতিক্রিয়ার ফলেই তাপ সৃষ্টি হয়, যেমন জলের ক্ষেত্রে। অণুর গতিক্রিয়ার ফলেই জল গরম হয়ে ওঠে। এটা যান্ত্রিক গতি নয়, তার থেকে অনেক বেশী জটিল ও নতুন ধরণের কিছু। বিদ্যুৎ প্রবাহ মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ। রাসায়নিক বিক্রিয়াও গতিক্রিয়া, আয়নের মিশ্রন, আরও বেশি জটিল প্রক্রিয়া। আগেই বলা হয়েছে, একটি জীবশরীরও সর্বদাই গতিশীল অবস্থাতেই থাকে। মানব সমাজে এমন সব প্রক্রিয়া চলেছে যার ক্ষান্তি নেই: সমাজ ব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে। মানুষেরা নিজেরাও বদলাচ্ছে।

এই সব থেকে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত? এই সিদ্ধান্ত যে **প্রকৃতিতে গতিক্রিয়ার অনেক প্রকারভেদ আছে।** প্রথমত, জড়বস্তু কণার বা বস্তুসত্ত্বার দেশগত স্থানচ্যুতি অর্থাৎ গতির **যান্ত্রিক** রূপ। দ্বিতীয়ত, তাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াগুলি, কিংবা গতির **ভৌতিক** রূপ। তৃতীয়ত, রাসায়নিক বিক্রিয়া, আয়নের মিশ্রণ, অর্থাৎ গতির **রাসায়নিক** রূপ। চতুর্থত, জীবদেহে যে সব পরিবর্তন ঘটছে, অর্থাৎ গতির **জৈবিক** রূপ। পঞ্চমত, গতির **সামাজিক** রূপ, অর্থাৎ, সামাজিক জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটছে সেগুলি।

অতএব, একথা বলা যেতে পারে না, গতি মানে শুধু পদার্থের দেশগত স্থানচ্যুতি, কারণ এই গতি কেবল এক ধরণের গতি। আমাদের বিচার্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক ও দার্শনিক অর্থে গতি কি, এই প্রশ্ন। এর জন্যে প্রথমে নির্ধারণ করা দরকার সর্বপ্রকার গতিক্রিয়ার গতিধর্মী প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এঙ্গেল্‌স্ লিখেছিলেন, গতি বলতে "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু পরিবর্তন ও প্রক্রিয়া

চলেছে সব কিছুই, এর অন্তর্গত সামান্য স্থান পরিবর্তন থেকে চিন্তা পর্যন্ত।"১ এর থেকে বলা যায় **বহির্বিষয়ে বা জগদ্ব্যাপারে, অর্থাৎ জগতে, জড়বস্তুতে যা কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তাই গতির অন্তর্ভুক্ত।**

জড়বস্তুর কি এমন অবস্থায় থাকা সম্ভব যখন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটবে না? কখনই না। এমন কি, সেই সুদূর অতীতেও যখন মানুষ, জীব জন্তু, জীবকোষ, কিছুই ছিল না, তখনও জড়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনক্রিয়া চলেছিল। বস্তুসত্তা অণু পরমাণুতে গঠিত এবং সর্বদা গতিশীল। অতএব অস্থিভূত, একেবারে নিশ্চল বস্তুসত্তা কখনই ছিল না। উপরন্তু, যদি অণু পরমাণু ও ইলেকট্রন থেকে থাকে, তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়াও না হয়ে পারে না। অতএব বস্তুর রাসায়ণিক গতিক্রিয়াও তখন ছিল।

তাহলে, সহজেই বোঝা যাচ্ছে, জড়বস্তু **কখনই এমন অবস্থায় ছিল না যখন তা গতিহীন নিশ্চল ছিল**। এই জন্যই আমরা বলি, **গতি বস্তুর, অস্তিত্বের, সত্তার একটি রূপ**। গতিক্রিয়া জড়বস্তুর একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ, কিংবা, দার্শনিকদের ভাষায়, জড়বস্তুর **ধর্ম**। গতিহীন বস্তু নেই, গতিতেই বস্তুর অস্তিত্ব।

আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। যখন একটা লেদ্ যন্ত্র চলতে থাকে, তার বিভিন্ন অংশ গরম হয়ে ওঠে। এর অর্থ গতিক্রিয়ার যান্ত্রিক রূপ (স্বতন্ত্র অংশগুলির ঘূর্ণন) গতিক্রিয়ার তাপ রূপে রূপান্তরিত হয়। ইঞ্জিনে এর বিপরীত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দহনের ফলে যে বাষ্প হয় তাই চাকায় গতি সঞ্চারের জন্য প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এইসব তথ্য সামান্যীকরণ করে বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, "শূন্য" থেকে গতিক্রিয়া সৃষ্ট হতে পারে না; তেমনি তা শূন্যেও বিলীন হতে পারে না। গতিক্রিয়া কেবলমাত্র একরূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাকে বলা হয় **শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তর** সূত্র (পদার্থবিদ্যায় শক্তি জড়বস্তুর গতিক্রিয়ার পরিমাপ)।

যদি কোন সময়ে জড়বস্তু গতিহীন অবস্থায় থাকত, তাহলে তার মধ্যে গতি সঞ্চারিত হত না। অতএব, **বস্তুর অস্তিত্বেই গতি নিহিত আছে,**

---

১ এঙ্গেল্স্: **ডায়ালেক্টিক্স্ অফ নেচার**, পৃঃ ৯২

এবং তার "প্রথম আবেগের" প্রয়োজন নেই। এই ধরণের "আবেগ" কখনও ছিলও না।

এর অর্থ এই নয় যে, দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ নিশ্চল অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। প্রকৃতিতে নিশ্চল অবস্থা আছে, তবে তা **আপেক্ষিক**। এর অর্থ জগদ্‌ব্যাপারে এমন কিছুই নেই যেখানে সব কিছুই নিশ্চল, যেখানে গতিক্রিয়া আদৌ নেই। আগেই এটা দেখানো হয়েছে।

যদি কোন বস্তুসত্ত্বা স্থির থাকে, তবে তা অন্য কিছুর আপেক্ষিকতায়েই স্থির। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মোটরে চড়ে যাবার সময় আমরা চলন্ত গাড়ির আপেক্ষিকতায় স্থির। কিন্তু পরম স্থিতি এ নয়, কারণ আমাদের দেহের ভিতরে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

স্থিতির দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ধারণা তত্ত্ববিদ্যাগত ধারণা থেকে আমূল আলাদা। **তত্ত্ববিদ্যার ধারণায় স্থিতি অর্থ সর্বপ্রকার গতির অভাব।** দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ এই ধারণার বিরোধী।

প্রকৃতিতে যার গুরুত্ব চূড়ান্ত তা স্থিতি নয়—যদিও স্থিতি আছে—তা হচ্ছে গতি, বিকাশ ও পরিবর্তন। বস্তুর ধর্ম হিসেবে গতির সার্বত্রিকতাকে অস্বীকার করার পরিণতি ঈশ্বর বিশ্বাসকে মেনে নেওয়া। সেই কারণেই আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিকেরা, বিশেষত নব্য টমবাদীরা,[১] এই অস্বীকৃতিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। উদাহরণ স্বরূপ, ফরাসী, নব্যটমবাদী ফাদার ক্যাল্‌ভেজ রাষ্ট্র করেন প্রকৃতির প্রয়োজক শক্তি ভগবান,তাই কেবলমাত্র তাঁরই দয়াতেই বিকাশ সম্ভব। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি জড়বস্তুর বা প্রকৃতির "প্রয়োজক শক্তির" কোনই প্রয়োজন নেই। গতিক্রিয়া তার অন্তর্নিহিত মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য গুণ। যা অনন্তকাল ধরে আছে তার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা অর্থহীন। জড়বস্তুতে কে গতি আরোপ করল এ প্রশ্ন অবান্তর, যখন গতিক্রিয়া তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তার অস্তিত্বেরই একটা রূপ। জড়বস্তুর অস্তিত্বের অন্য আর কি রূপ আছে?

দেশ এবং কাল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ

বস্তুসত্তামাত্রেরই ব্যাপ্তি আছে, আয়তন আছে, আয়তনের তিনটি মাত্রা— দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। তারা দেশস্থ বিশেষ অংশ দখল করে থাকে। উপরন্তু তারা পরস্পরের সঙ্গে দেশগত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, হয় কাছে, নয় দূরে, হয় উপরে, নয় নিচে, হয় ডাইনে, নয় বাঁয়ে। তার মানে দেশগতভাবেই তাদের অস্তিত্ব, অন্য কোন

১ নব্য টমবাদ আধুনিক ক্যাথলিকদের আনুষ্ঠানিক দর্শন।

ভাবে তারা থাকতে পারে না। কিন্তু, আমরা আগেই বলেছি, বিষয় মাত্রই বস্তুদ্বারা গঠিত। অতএব, বস্তু দেশস্থিত ছাড়া অন্য কোন ভাবে থাকতে পারে না। সেই জন্যে দেশের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে বস্তুর অস্তিত্বের একটি রূপ।

অধিকন্তু, পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় সব ঘটনাবলী অবিরাম পরিবর্তন, গতি ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি কিভাবে ঘটে? একটা সামান্য দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। ছেলেবেলা থেকে এখন পর্যন্ত মাঝে মাঝে যদি নিজের ছবি তুলে থাকেন, সেগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন, কালের প্রবাহে পরিবর্তন জমা হতে থাকে, বুঝবেন, সব রকম পরিবর্তনই কালসাপেক্ষ।

উপরন্তু, জগতের সব রকম পরিবর্তনই একটা বিশেষ ক্রম অনুসরণ করে; রাতের পরে আসে দিন, পুঁজিতন্ত্রের পরে আসে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। একটা ঘটনা আগে ঘটে, আরেকটা ঘটে পরে। তাদের সবারই নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল থাকে। ঘটনার এই পর্যায়ক্রম ও স্থিতিকাল ঘটে থাকে কালেরই পটভূমিতে।

অতএব, **জগতে যা কিছু ঘটে, তা কালেই সম্প্রসারিত হয়।** সেইজন্য, **কালও বস্তুর অস্তিত্বের একটি রূপ।** লেনিন লিখেছিলেন "এ জগতে গতিশীল বস্তু ছাড়া আর কিছুই নেই, এবং গতিশীল বস্তু দেশ ও কালের মধ্যে ছাড়া সচল থাকতে পারে না।"১

যদি দেশ এবং কাল, উভয়েরই সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় বস্তুর অস্তিত্বের রূপ বলে, তাহলে বলতে পারেন, এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, প্রভেদ থাকে। দেশ বস্তুর অস্তিত্বের সেই রূপ, যা বস্তুর অবস্থান, তার আয়তন ও মাত্রা নির্ধারণ করে। কাল কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব ও বিকাশের অপর একটি দিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করে—তা বস্তুর পরিবর্তনের **ক্রম** নির্ধারণ করে। পার্থক্যটি সহজবোধ্য। এর পরে দেশ ও কালের গুণ যে পৃথক, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দেশ এবং কালের সহজাত গুণগুলি তাহলে কি?

দেশের তিনটি মাত্রা। তার মানে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, এই তিনটি

---

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ১৪, পৃঃ ১৭৫

মাত্রা থেকে দেশের পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। **দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ তার এই তিনটি মাত্রা।**

আপনারা সবাই জানেন, কালে ঘটনার পরিবর্তন কেবলমাত্র একটি অভিমুখেই ঘটে, অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতে, কখনই তা এর বিপরীতাভিমুখী হয় না। "কালযন্ত্র" (Time Machine) যার দ্বারা কালের পশ্চাদভিমুখে যাওয়া যায়, তা একমাত্র উপন্যাসেই সম্ভব। আবার একবার আপনার ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারুণ্য থেকে বয়স্কতায়, একই অভিমুখে আপনার বিকাশ ঘটেছে। এই অভিমুখিতাকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তাহলে, **কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ তার অনিবর্তনীয়তা** (irreversibility)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কাল ও দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা এই দুটিকেই তবে বস্তুর অস্তিত্বের রূপ বলে নির্দেশ করছি কেন ?

বিষয় কালগত না হয়ে দেশগত হতে পারে না। যদি কোন বিষয় দেশের কোন স্থানে অবস্থান করে, সে তা করে একটি নির্দিষ্ট কালেই। একটি বিষয় স্থানে এবং কালে সংঘটিত হয়। রেলের একটা টাইমটেবল আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। ট্রেনটি অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক জায়গায় থামবে। ট্রেনটি যে স্থানে আছে সেই স্থানে তার পৌঁছোনোর সময়টা থেকে সেই স্থানটাকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কোথায় ? এবং কখন ?—এই প্রশ্ন দুটি অবিচ্ছেদ্য। তারা কোন ঘটনার কাল এবং দেশস্থ স্থান নির্দেশ করে।

অতএব, **দেশ এবং কাল অবিচ্ছেদ্য। কালহীন দেশের অস্তিত্বও যেমন নেই, তেমনি নেই দেশহীন কালের।** এবং যেহেতু বস্তুর অস্তিত্ব **দেশে এবং কালে,** তারা শুধু পরস্পরই **অবিচ্ছেদ্য** নয়, তারা **বস্তুর সঙ্গেও** অবিচ্ছেদ্য।

বলতে পারেন চরম শূণ্যতাও তো দেশ, যে "স্থানে" কোন কিছু নেই, যা **বস্তুহীন দেশ।**

অতীতে বাস্তবিকই লোকে বিশ্বাস করত এই রকম শূণ্য দেশ বা "শূণ্যতার রাজ্য" বলে কিছু আছে। ইদানীং কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রকৃতিতে এমন দেশ কোথাও নেই যা একেবারে শূ[illegible] [illegible] রুন, একটা নির্বাত নল, তার ভিতর থেকে যত কিছু গ্যাস ছিল

সব পাম্প করে বার করে দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পরমাণু, ইলেকট্রন ও অন্যান্য কণিকা থেকে যাবে। গ্রহান্তর্বর্তী দেশ আন্ত-র্নাক্ষত্র গ্যাস, ধুলো, ধ্বংসোন্মুখ ধূমকেতুতে ভরে থাকে, তারই মধ্যে দিয়ে উল্কাপিণ্ড, কণিকাণু ও আলোকরশ্মি ভ্রমণ করে। আর আমরা এও জানি যে, আলোকরশ্মিও জড়বস্তু।

যা বলা হল তার থেকে প্রতিপন্ন হয়, দেশের এবং কালের অস্তিত্ব বাস্তব। জগতের অস্তিত্ব মানবস্বতন্ত্র, এবং জাগতিক সত্তার রূপগুলিও বাস্তব।

দেশের এবং কালের অস্তিত্ব বাস্তব, এই তত্ত্বের উপর লেনিন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। এই তত্ত্ব দেশ কাল সম্পর্কে জ্ঞাতৃগত-ভাববাদী মতের বিরোধিতা করে, যে মতের সূচনা দেখতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হিউমএর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের জার্মান দার্শনিক কাণ্টের লেখায়। উভয়েই এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন, তা এই যে, দেশ ও কালের কোন বাস্তব সত্তা নেই। হিউমের বিবেচনায় দেশীয় কালিক সম্বন্ধগুলো অভিজ্ঞতাসূত্রে অর্জিত। কাণ্ট অবশ্য ধরে নিয়েছিলেন তারা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ হবার আগে থেকে আমাদের মনে অবস্থান করে। সেই জন্যে তিনি এইগুলির নামকরণ করেছিলেন স্বতঃসিদ্ধ মূলপর্যায়।

লেনিন তাঁর **মেটিরিয়ালিজম এণ্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম** গ্রন্থে দেশ কাল সম্পর্কে এই ধারণার মূলে যে হেত্বাভাস আছে তা ভালোভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। ম্যাখ্‌বাদীদের*১ মতও মূলত ভ্রান্ত, তারা কেবলমাত্র হিউম ও কাণ্টের জ্ঞাতৃগত ভাববাদকে জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কিছু করেনি। লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান দেশ কালের বাস্তব চরিত্রকে সমর্থন করে। আধুনিক ভাববাদীরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের, বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, যাতে তার দ্বারা দেশ কাল সম্পর্কিত জ্ঞাতৃগত-ভাববাদী ধারণাগুলো জাগিয়ে তোলা যায়। এই উদ্দেশ্যে তারা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' বা **আপেক্ষিকতা** তত্ত্বকেও বিকৃত করে।

---

*১ ম্যাখ্‌বাদ-দর্শনের প্রতিক্রিয়াশীল একটি ভাববাদী ধারা, তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অস্ট্রীয় পদার্থবিদ্ ও দার্শনিক আর্নষ্ট ম্যাখ্ প্রবর্তিত করেন।

দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত পর্যন্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। তাঁর মতে দেশ এবং কাল বস্তুসত্ত্বা থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে। দেশ সম্পর্কে ভাবা হত তা যেন প্রকাণ্ড ধরণের বাক্স, কিংবা, দেওয়াল, মেঝে বা ছাদহীন একটা সীমাহীন ঘর, যার মধ্যে সমস্ত পদার্থকে রাখা যায়। আমাদের চতুর্দিকের জগতটা যেন এই "বাক্সের" বা "ঘরের" মধ্যে থাকে। সেই জন্যে, নিউটন সিদ্ধান্ত করেছিলেন দেশ অনন্যসাপেক্ষ অর্থাৎ বস্তুস্বাধীন। তেমনি কালও অনন্যসাপেক্ষ এমন কিছু যা বস্তুস্বাধীন এবং বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই মত ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদের।

বিখ্যাত পদার্থবিদ্ আইনস্টাইন, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যাঁর আবিষ্কার, তিনি কিন্তু দেশ সম্পর্কে একেবারে অন্যরকম মনোভাব গ্রহণ করলেন। তিনি দেখালেন দেশ এবং কাল শুধু পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্তই নয়, তারা বস্তুর সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত এবং বস্তুর ধর্মের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন এক ও অনাপেক্ষিক কাল নেই। নিচের উদাহরণটি থেকে এর সত্যতা জানা যাবে।

পৃথিবীতে এবং অতিদ্রুতগতিতে ধাবমান রকেটে সময়ের প্রবাহ একইভাবে চলেছে, এর চেয়ে স্বাভাবিক ধারণা আর কী হতে পারে? কিন্তু, আসল কথা তা নয়। রকেটের দ্রুততা যদি আলোর কাছাকাছি হয়, তবে তার মধ্যে কালের প্রবাহ পৃথিবীতে কালের প্রবাহ থেকে অনেক মন্থর হবে। এইরকম একটি মহাকাশযানে ভ্রমণ করার কথা কল্পনা করুন। মনে করুন, সেই জাহাজে করে আমরা তিন বছর ভ্রমণ করলাম। তিন বছর পরে যখন আমরা পৃথিবীতে ফিরে আসব, আমরা অবাক হয়ে দেখব যে সেখানে ৩৬০ বছর পার হয়ে গেছে! এই ব্যাপারটা কল্পনা করা দুষ্কর। কিন্তু আসলে তাই সত্য। এর অর্থ পৃথিবীর এবং রকেটের দুয়েরই নিজস্ব কাল আছে। কাল আপেক্ষিক এবং তা গতিবেগের উপর নির্ভরশীল। যত দ্রুত বস্তুসত্ত্বা দেশে গতিশীল, তার পক্ষে কালের প্রবাহ তত মন্থর।

কার্যত কিন্তু স্থানও আপেক্ষিক। মনে করুন একটি ট্রেন প্রায় আলোকের দ্রুততায় একটি স্থির প্লাটফরমের সামনে দিয়ে চলে গেল। ট্রেনের ড্রাইভার প্লাটফরমটার যে দৈর্ঘ্য মাপবে, এবং প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে এমন কেউ যে দৈর্ঘ্য মাপবে, দুটো কি এক হবে? আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভিত্তিতে গাণিতিক

হিসাব থেকে দেখা যায়, দুটোর মধ্যে প্রভেদ থাকবে।

ট্রেনের যাত্রীরা দেখে প্লাটফরমটা ছোট হয়ে গেছে। যারা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকে তারা দেখে, যে ট্রেনটা হুস্ করে বেরিয়ে গেল, তাও দৈর্ঘ্যে ছোট। এটা চোখের ধাঁধা নয়, বাস্তব সত্য। সুতরাং দেশও আপেক্ষিক।

আধুনিক ভাববাদীরা এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও বিকৃত করার চেষ্টা করে। তারা বলে ঃ যেহেতু দেশ এবং কাল আপেক্ষিক, তাই তাদের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তারা জ্ঞানগত প্রত্যয় ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তা সত্য নয়। জড়বস্তু প্রসঙ্গে আমরা যে ধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, এটি তারই রকমফের। নতুন আবিষ্কারগুলি দেশ ও কাল সম্পর্কিত বস্তুবাদী ধারণা নিরাকরণ করেনি। তারা শুধু এই সম্পর্কে আগে যে তত্ত্ববিচারমূলক ধারণা প্রচলিত ছিল, তাই খণ্ডন করেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলতে গেলে, স্থানাঙ্কের প্রতিটি প্রণালীর নিজস্ব কাল আছে, যার সঙ্গে সেই স্থানাঙ্ক সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু কালের অস্তিত্ব বাস্তব, যেমন দেশের।

দেশগতভাবে জগৎ অসীম এবং কালগত ভাবে চিরন্তন

দেশ অসীম, কাল চিরন্তন। অতএব সর্বদিকে জগতেরও পরিব্যাপ্তি অসীম। এবং কালাঙ্কে এর কোন শুরুও নেই, শেষও হবে না।

এই সিদ্ধান্তটির গুরুত্ব আছে। যদি জগৎ অসীম হয়, তবে "প্রলয়" সম্পর্কে ধর্মীয় কাহিনীগুলি নিরর্থক হয়ে যায়। জগৎ যদি অনন্তকাল ধরেই থাকে, তবে ধর্মনেতাদের দৃঢ়োক্তি যে, এমন এক সময় ছিল যখন জগৎ ছিল না এবং ভগবান তা "সৃষ্টি" করেছেন, তা একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এই বিষয়টি নিয়ে তীব্র মতবিরোধ হয়েছে।

জগৎ এবং দেশ অসীম, এই বস্তুবাদী মতবাদ বিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র। এই ব্রহ্মাণ্ডে দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, কিলোমিটারে নয়, আলোকবর্ষে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার বেগে ধাবমান একটি আলোকরশ্মি এক বছরে যে দূরত্ব পরিক্রম করে তার দ্বারাই। জ্যোতির্বেত্তারা এখন সেই সব তারকার অনুসন্ধান করছেন, আমাদের থেকে যাদের দূরত্ব লক্ষ কোটি আলোকবর্ষেরও অধিক। তার অর্থ যদি কোন রকেট সেকেণ্ডে ৫০,০০০ কিলোমিটার বেগে চলে, তবে তারও এই ধরণের একটি তারকায় পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে।

রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় তা নক্ষত্রখচিত। এইগুলি যে নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, এবং সূর্যও যার অন্তর্ভুক্ত তাকে বলা হয় ছায়াপথ। তার মধ্যে ১,৫০০,০০০ লক্ষ তারকা আছে। কিন্তু এই ধরণের লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ-মণ্ডল আছে। বৈজ্ঞানিকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবীক্ষণ ও রেডিও টেলিফোন দ্বারা সেইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এর থেকে জগতের "প্রলয়" বিন্দুমাত্র আভাসিত হয়না।

অতএব জগৎ অনন্ত অসীম। তার যে জন্মকাল নেই, আগেই দেখান হয়েছে। সুতরাং ভাববাদীরা ও ধর্মনেতারা যে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, জগৎ একদিন শুরু হয়েছিল এবং একদিন তার শেষও হবে, এর কোন মূল্যই নেই।

বিজ্ঞান যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, সূর্য ও অন্যান্য তারকার শক্তি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন হয়, তখন ভাববাদীরা বলতে শুরু করল, যেহেতু প্রকৃতিতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, নিউক্লিয়াস-সঞ্জাত "ইন্ধন" ফুরিয়ে গেলে তারকারা সব আপনিই নিভে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। ভ্যাটিকান কর্তৃক আয়োজিত জ্যোতির্বিদদের এক সভায় এমনকি হিসেবও করা হয়েছিল ঠিক কোন সময় থেকে প্রলয় শুরু হবে ; ১০০,০০০ লক্ষ বছর পর থেকে। কিন্তু বিজ্ঞান এই সব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে, হাইড্রোজেনের "জ্বলে যাবার" প্রক্রিয়ার পাশাপাশি তার গড়ে ওঠাব বা পুনর্জন্মের প্রক্রিয়াও চলে।

"সুপার নোভা" তারকা* আবিষ্কারের পর, ভাববাদীরা এই আবিষ্কারকে ভবিষ্যৎ প্রলয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকেন। ফেটে গিয়ে এই তারকারা সাবানের বুদ্বুদের মত বাড়তে বাড়তে বাড়তে বিপুল আকার ধারণ করে। ভ্যাটিকান অনুগৃহীত বৈজ্ঞানিকেরা বলেন : সূর্যও একটি তারকা. তারও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তাহলেই "প্রলয়"। অপরপক্ষে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জ্যোতিষীয় কংগ্রেসে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দেওয়া হয় যে, কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরণের তারকারই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এবং সূর্য সেই পর্যায়ভুক্ত নয়। সুতরাং পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক কোন বিস্ফোরণের সম্ভাবনা নেই।

---

*যে সব তারকা হঠাৎ বিষ্ফারিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

"প্রলয়" সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী প্রমাণ করার সম্ভাবনাও লোপ পাওয়াতে,নানা ধর্মপ্রচারক সরাসরি প্ররোচনার পথ গ্রহণ করেছেন, কবে প্রলয় হবে তার সঠিক সময় পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছেন এবং তার দ্বারা "প্রলয়" সম্পর্কে ধর্মীয় নিশ্চয়তা যে নিতান্তই অমূলক তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

দেশ ও কালের বাস্তবতা ও চিরন্তনতা স্বীকার করা বস্তুবাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। যদি মনে করা হয়, বিশ্বজগতের দেশগত সীমা আছে, তাহলে যে প্রশ্ন অনিবার্যভাবে দেখা দেয়, তা এই: বিশ্বজগতের সীমার বাইরে তাহলে কী আছে? ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি বলে, সীমার বাইরে অতিপ্রাকৃত শক্তির রাজ্য। বিশ্বজগতের সীমার বাইরে দেবতা, দেবদূত ও "কৃপাপ্রাপ্ত"দের আবাসস্থল। এককথায়, তাই হচ্ছে পরলোক। বাস্তব লোক ছাড়া এইরকম কোন "পরলোকের" অস্তিত্ব থাকতে পারে কি?

বিজ্ঞান চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছে, অবাস্তব "পরলোকের" অস্তিত্ব নেই, হতেও পারে না। প্রকৃতপক্ষে যদি জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে কেবলমাত্র একটিই জগৎ এবং তা বাস্তব জগতই। এইজন্যে মার্কসবাদী দর্শন শিক্ষা দেয় যে **জগৎ ঐক্যবদ্ধ**। এর থেকে যেন এই অর্থ করা না হয়, আমরা যে জগতে বাস করি তার বাইরে আর কোন জগৎ নেই। বহুপূর্বে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক জিয়র্দানো ব্রুনো (১৫৪৮—১৬০০) প্রমাণ করে দেখান যে, জগৎ অসংখ্য। কিন্তু তারা সবাই বাস্তবধর্মী। এই অর্থে তারা সবাই একটি বাস্তব বিশ্বের অন্তর্গত। উপরন্তু, জগৎ ঐক্যবদ্ধ এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সমস্ত বিষয়, ঘটনা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক যোগ আছে, সেইজন্যে তারা সবাই মিলে অসম্পৃক্ত একটা বস্তুপুঞ্জ হয়নি, একীভূত একটি সমগ্রতা রূপায়িত হয়েছে।

জগতের ঐক্য

জগতের ঐক্যের সপক্ষে প্রমাণ কোথায়? এঙ্গেলস্ এর উত্তরে বলেন, প্রমাণ আছে দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও আয়াসলব্ধ বিকাশে। পুরাকালে মানুষের যখন সূর্যচন্দ্র গ্রহ তারা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল না, তারা ভাবত এই "স্বর্গলোক" (সূর্য, চন্দ্র, তারা) এই পার্থিব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই থেকেই দুই লোকের ধারণা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে অবশ্য

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রহস্যের আবরণ খসে যায় এবং দেখা যায় যে, "স্বর্গরাজ্য" আসলে আমরা যে জগতে বাস করছি তারই মত বাস্তব।

ধর্মীয় ও অতীন্দ্রীয় ধারণায় প্রথম জোরালো আঘাত হানেন **নিকোলাস কোপারনিকাস** (১৪৭৩—১৫৪৩)। তিনি এই মত উপস্থাপন করেন যে, পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে নেই, তা সৌর জগতের একটি গ্রহমাত্র। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, পৃথিবীকে "স্বর্গের" প্রতিপক্ষরূপে ধারণা করা চলে না এবং স্বর্গের কোন অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটন প্রমাণ করলেন, বস্তুবিজ্ঞানের যে নিয়মে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রম করছে সেই নিয়মেই চাঁদও পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবং অন্যান্য গ্রহরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। যখন একটি সোভিয়েট রকেট চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌঁছল, সেই ঘটনায় এই সত্য চূড়ান্তভাবে সমর্থিত হল যে, যে "মহাকর্ষ" শক্তি পৃথিবীর বুকে পদার্থকে "নামিয়ে আনে, সেই শক্তিই চাঁদের বুকে রকেটটিকে "নামিয়ে এনেছে"। পৃথিবীতে হোক, "স্বর্গলোকে" হোক, জগৎব্যাপী সমস্ত ঘটনা যে নিয়মে চলে সেই নিয়মগুলি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রযোজ্য, এই কি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়?

আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলিও পৃথিবী যে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থে রচিত, তাই দিয়েই রচিত। যে সব পদার্থ সুদূর গ্রহলোক থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় তাদের কাছ থেকেই আমরা এই খবর পাই, যেমন: উল্কাপিণ্ড। তাদের প্রধান উপাদান লোহা, যে রাসায়নিক মৌল পদার্থ পৃথিবীতে ব্যাপকভাবেই ছড়িয়ে আছে। এর থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এইসব "স্বর্গীয়দূত"দের মধ্যে অবাস্তব কিছুই নেই।

আর মহাকাশ যানগুলির পৃথিবী প্রদক্ষিণ সম্পর্কেও বা কি বলা যায়? ধর্মীয় ধারণা অনুযায়ী যেখানে "স্বর্গরাজ্য" বা "পরলোক" থাকার কথা তা তো তারা ঘুরে দেখে এল, কিন্তু মহাকাশযাত্রীরা কোন স্বর্গরাজ্য, দেবদূত, বা মহাপুরুষের তো দর্শন পাননি। কোন না কোন ধরণের "স্বর্গলোকের" অস্তিত্ব সম্পর্কে ধর্মীয় রূপকথার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট খণ্ডন পাওয়া দুষ্কর হবে।

জগতের ঐক্য স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; এই ঐক্যের প্রকৃতিও ঠিকমত জানা দরকার। এঙ্গেলস্ কর্তৃক এই প্রশ্ন বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করে লেনিন

লিখেছিলেন, জগতের ঐক্যতত্ত্ব উপাদান করতে হলে, হয় চিন্তার দিক থেকে, নয় তো, বিষয়ীভূত সদ্বস্তু বা জড়বস্তুর দিক থেকে অগ্রসর হওয়া যায়। যে কেউ চিন্তা বা চেতনার দিক থেকে জাগতিক ঐক্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করে, সেই সব গোলমাল করে ফেলে এবং শেষকালে ঈশ্বর বিশ্বাসে এসে পৌঁছোয়। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জার্মান দার্শনিক ডুরিং। তিনি বলেছিলেন : জগৎ একীভূত, যেহেতু আমরা সবকে এক বলে ভাবি। এঙ্গেলস এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, আপনারা যা খুশি তাই ভাবতে পারেন. কিন্তু যা নেই, তা, তাই বলে, বাস্তব হয়ে যেতে পারে না। জাগতিক ঐক্য চিন্তা থেকে প্রতিপাদন করা বিধেয় নয়, তা করা উচিত বিষয়ীভূত জগৎ থেকে, জড়জগৎ থেকে।

এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জগতে এমন কোন ঘটনা নেই যা গতিক্রিয়ার বা বিকাশের বা জড়বস্তুর ফল নয়। জড়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত সব কিছু, তার ক্রিয়া সর্বত্রগ এবং গতিশীল, ক্রিয়াশীল বস্তু বা তার ফল ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না। এরই অর্থ, একটি মাত্র জগৎ আছে এবং তা বাস্তব জগৎ। এই বিবেচনায় এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন, **জাগতিক ঐক্য আছে তার বাস্তবতায়।** প্রকারান্তরে বলা চলে, জগৎ একীভূত যেহেতু **তা বাস্তবধর্মী।** জগতের অস্তিত্ব মানবিক চেতনার বাইরে এবং চেতনা থেকে স্বাধীন। কিন্তু চেতনা বাস্তব চৈতন্য কি? আমরা এইবারে এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করব।

ভরসাস্থল। এর কারণ, ঠিক এই ক্ষেত্রেই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মহন্তরা তাঁদের কল্পনা অবাধে ছেড়ে দিতে পারেন। তাঁরা ভাবেন, "আমরা যা বলি, কে তাতে বাধা দিতে পারে? কেউই তো সাক্ষী নেই।" নয় শতাব্দী আগে পারস্যের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি ওমর খৈয়াম এই ভাবটিই প্রকাশ করে বলেন:

সত্যিই আশ্চর্য, নয়? কত লোক আমাদের আগে
পার হয়ে চলে গেছে জীবনের অন্ধ পরপারে,
ফিরে এসে কেউ তার দিল না তো পথের নিশানা,
পথের হদিস নিতে আমাদেরও যাত্রী হতে হবে।

"সাক্ষী" অবশ্য পাওয়া গিয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা পরে বলছি।

এখন প্রয়োজন আত্মিক ও বাস্তব, এদের সম্বন্ধের উপর ভাববাদী-ধর্মীয় ধারণার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। এই ধারণা নিম্নলিখিত চিন্তা দিয়ে গঠিত: ১। আত্মিক (চেতনা) বাস্তবের আগে থেকেই থাকে; ২। আগেরটি পরেরটি না হলেও থাকতে পারে, অর্থাৎ পরেরটির উপর তা নির্ভর করে না। বস্তুসত্তা "নশ্বর", বিনাশ্য, অথচ আদর্শ অমর, চিরন্তন।

দেখা যাক, এ কথা সত্য কিনা।

চিন্তা, সংবেদন, ভাব, অভীপ্সা সবই চেতনার অন্তর্ভুক্ত। তারা মানবিক সত্তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সংবেদন অনুভব করার কেউ যদি না থাকে, তাহলে সংবেদন নেই; ইচ্ছা করার কেউ না থাকলে, অভীপ্সা থাকে না। প্রতিজ্ঞা করার মত কেউ যদি না থাকে, প্রতিজ্ঞাও থাকে না। মানব বিবিক্ত, মানব বহির্ভূত ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা, সংবেদন নেই, তেমনি নেই চেতনা, মন ও চিন্তার অন্যান্য প্রকাশ।

বস্তু ব্যতিরেকে চেতনা আছে কি?

আপনারা জানেন, মানুষ তার চেতনা ও মন নিয়ে আবির্ভাব হওয়ার বহু আগে থেকেই প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ আছে। সুতরাং এর থেকে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয়, প্রকৃতি ও জড়বস্তু মুখ্য, এবং চেতনা ও চিন্তা গৌণ। প্রশ্ন হতে পারে: মানুষের আগে যেহেতু অন্যান্য জীব ছিল, তাদের কি চেতনা ছিল না? একথা সত্য, কোন কোন জীবের মধ্যে অপরিণত চেতনার আভাস আছে। হয়ত তাদের মধ্যে বর্ণের বা ঘ্রাণের কিছু কিছু অনুভূতি আছে।

হয়ত কিছু মাত্রায় কল্পনাও আছে। কিন্তু এই অপরিণত চেতনারও বিকাশ ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে। যখন পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে তখনই।

যা বলা হল তার থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, **প্রকৃতি** কেবল মানুষেরই আগে নয়; সামুদায়িক জীবের আবির্ভাবের আগে থেকেই **আছে**, অতএব **চেতনা থেকে স্বাধীন অস্তিত্বেই আছে**। প্রকৃতি তাই মুখ্য। কিন্তু প্রকৃতির আগে **চেতনার** অস্তিত্ব অসম্ভব। চেতনা তাই **গৌণ**। দর্শনের মৌলিক সমস্যার বস্তুবাদী সমাধানের ক্ষেত্রে এইটি অন্যতম প্রধান প্রমাণ। কিন্তু এইটেই একমাত্র প্রমাণ নয়। অন্য প্রমাণগুলির কিছু আপনারা জানেন আপনাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়।

বহু আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, দেহে কোন মারাত্মক ক্ষত হওয়ার ফলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়ঃ তার মানে চেতনা লোপ পায়। বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, অজ্ঞান হওয়া বা চেতনা লুপ্ত হবার কারণ মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা, হৃৎপিণ্ডের রক্তসংবহনপ্রণালীর প্রবল ব্যাধি, গুরুতর আঘাত অথবা রক্ত ক্ষরণের ফলে। তাহলে চেতনাকে নির্ভর করতে হয় দেহাভ্যন্তরে, মস্তিষ্কে বা নার্ভএ যা ঘটছে, তার উপরেই। একথা সবাই জানে, একজন মদ্যপ তার দেহযন্ত্রটাকে ক্রমশ নষ্ট করে ফেলেঃ তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবনতি ঘটে, যকৃৎ "অকেজো" হয়ে যায়, হজম-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে মদ্যপ তার মানবিক বিশেষত্বগুলি হারাতে থাকে, তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে, কখনও কখনও এমনও হয় যে তার চেতনা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। দেহের ক্ষতির ফলে চেতনারও ক্ষতি হয় বা চেতনা লোপ পায়।

আরো একটা দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকেই জানে, খুব ক্লান্ত হলে কিংবা ভালো বোধ না করলে চিন্তা করা কঠিন হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে একটু বিশ্রাম নিলে বা একটু শারীরিক ব্যায়াম করলেই বেশ ভালো বোধ করা যায়, তখন আবার পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করার সামর্থ্য ফিরে আসে।

তাহলে আমরা আবার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, জড়বস্তু ছাড়া চেতনা নেই এবং থাকতে পারে না। কিন্তু জড়বস্তু মাত্রই কি চিন্তা করতে সক্ষম? এর উত্তর যে 'না' হবে, আপনার চারদিকের জগৎটার দিকে একবার তাকিয়ে

ভর্তি হলাম।" একথা বলছেন ভি, ভি, চেরেপানভ, নিজের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা স্মরণ করে। ঘটনাটি ঘটেছিল এইভাবে।

গত যুদ্ধে চেরেপানভ নামে এক সোভিয়েত সৈনিক সাংঘাতিকভাবে আহত হন। ডাক্তাররা অভিমত দেন "দারুণ রক্তক্ষরণ, চরম মানসিক অভিঘাত।" হাসপাতালে তার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। তার চেতনা লোপ পেল। কিছুকাল পরে সেই ঘটনার বিবরণীতে এই লেখাটি লিপিবদ্ধ আছে দেখা যায়: "সাংঘাতিক রক্তক্ষরণ এবং আনুষঙ্গিক অভিঘাতের ফলে মৃত্যু, ১৯ ঘণ্টা ৪১ মিনিট, ৩রা মার্চ, ১৯৪৪"। রোগীটি মৃত বলে সাব্যস্ত হল। কিন্তু তারপরে শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক নেগোভ্স্কি হাসপাতালে আসেন। তিনি একদল ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগের হাস-পাতালগুলি পরিভ্রমণ করছিলেন। বিশেষ ধরণের একটি জটিল উপায়ে তাঁরা চেরেপানপভকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন। তার হৃদ্‌স্পন্দন আবার শুরু হল, আবার নিশ্বাসপ্রশ্বাস পড়তে লাগল।

যখন এই প্রাক্তন শবকে সবাই জিজ্ঞেস করল, তার কী ঘটছিল সে জানে কি না, সে তখন উত্তরে বলল: "হ্যাঁ, আমি জানি, আমাকে পরলোক থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমি তো মারা গিয়েছিলাম।" "পরলোকে কী দেখলে?" "আমার মৃত্যুর আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এবং অপারেশনের আগে পর্যন্ত আমার কোন জ্ঞান ছিল না। —আমার মৃত্যুকালে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।"

তাহলে, "পরলোক" থেকে একজন সাক্ষী ফিরে এল এবং সেখানে সে কিছুই দেখে আসে নি। মৃত্যু যদি আত্মার "পরলোকে" যাত্রা হয়, তাহলে চেরেপানভের পুনরুজ্জীবনের অর্থ হওয়া উচিত সেই লোক থেকে তার আত্মার "পুনরাগমন"। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই ধরণের কিছুই ঘটে নি।

এই দৃষ্টান্তটি ভালো করে বিবেচনা করে দেখুন। বাস্তবিক কী ঘটেছিল? জীবদেহটি বেঁচে ছিল, কাজ করছিল যখন, তার চেতনাও তখন সক্রিয় ছিল। তারপরে, সাংঘাতিক রক্তক্ষরণের ফলে মানব জীবটির কয়েকটি একান্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তি লোপ পায় এবং তার পরিণতিতে 'চেতনা'ও লুপ্ত হয়। লোকটি মারা যায়। কিন্তু তার চেতনা "পরলোকে" চলে যায় নি। তা শুধু এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলি লোপ পাওয়ার ফলে অন্তর্হিত হয়েছিল। পরে

ডাক্তারেরা নিছক বাস্তব পন্থায় তার দেহে অস্ত্রোপচার করেন এবং তারই ফলে তার চেতনা ফিরে আসে।

স্বীকার না করে উপায় নেই যে, চেতনা যে দেহনির্ভর, আসলে যে তা মস্তিষ্ক সঞ্জাত, এই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৃত্যুর ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই যে জীবন ফিরিয়ে আনা যায়, এই তথ্যের দ্বারা তা সমর্থিত হয়। এর বেশী দেরী হয়ে গেলে মস্তিষ্কে সেই সব প্রক্রিয়া শুরু হয় যার অবধারিত পরিণতিতে মস্তিষ্ক ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে আবার সক্রিয় করা যেতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ককে আর যায় না, তার ভিতরে ইতিমধ্যে তথাকথিত অনিবর্তনীয় প্রক্রিয়া-গুলি শুরু হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে চেতনা চিরতরে লুপ্ত, যেহেতু মস্তিষ্কের কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব, চেতনা যে বস্তুনির্ভর, এর সমর্থনে বিজ্ঞান আরো একটি যুক্তি দাখিল করল।

রুশদেশীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রী হের্‌জেন তাঁর এক লেখায় বলেছেন যে, দেহ বাদ দিয়ে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাও যা, আর একটা কালো বেড়াল তার কালো রঙটা পিছনে ফেলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, এই কথা বলাও তাই। একটা চড়ুই যেমন তার পাখা ছাড়া উড়তে পারে না, তেমনি দেহ ছাড়া আত্মাও টিকতে পারে না। দেহের ক্ষয় হয়। সেই সঙ্গে "আত্মার"ও অর্থাৎ চেতনার।

মস্তিষ্ক থেকে যে চিন্তার উদ্ভব তার প্রকৃতি কি রকম?

যে কোন একটা চিন্তা নিন, যে কোন একটা উক্তি, যেমন ধরুন, "আমি একটা ঝাউ গাছ দেখছি" অথবা "এই যোজনাসূচী শতকরা ১০৭ ভাগ কার্যকর হয়েছে"। এর থেকে দেখা যায় যে, আমাদের মনে যা আছে, তা ঝাউ গাছ নয়, ঝাউগাছ সম্পর্কে চিন্তা। যোজনাসূচী নয়, যোজনা সম্পর্কে চিন্তা। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা জগতে যে সব বস্তুর ও ঘটনার সংস্পর্শে আসছি, আমাদের মনে সেইগুলি সম্পর্কে ধারণা রয়ে যায়। চিন্তামাত্রই এইসব ধারণা। যেমন ধরুন, "বরফ সাদা" এই উক্তিতে "বরফ" ও "সাদা" শব্দ দুটিতে যে ধারণা নিহিত আছে, চিন্তা তার দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। এই ধারণাগুলি কোথা থেকে আসছে? তারা আসছে জীবন থেকে, বস্তুজগৎ থেকে। বরফ বাস্তবিকই সাদা। **বিষয় সমূহের অস্তিত্ব বাস্তব এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের**

চিন্তা বস্তুজগতের প্রতিফলন

ধারণার মূলে তারাই থাকে। ঝাউগাছটা প্রথমে আছে, তারপরে তা সম্পর্কে আমার ধারণা হয়। অতএব ধারণামাত্রই গৌণ। বস্তুজগৎ প্রথমে, তারপরে চিন্তায় তার প্রতিফলন। সেইজন্যে লেনিন চিন্তাকে বলেছিলেন বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবি, প্রতিফলন কিংবা ফটোগ্রাফ।

আমরা আগেই বুঝিয়ে বলেছি যে প্রকৃতি ও জড়বস্তুর অস্তিত্ব এমন সময়ে ছিল যখন চেতনা ছিল না, কারণ তখনও তার উদ্ভব হয় নি। মানুষের চেতনা তার জীবদেহের উপরে, তার নার্ভতন্ত্রের উপর নির্ভর করে। চিন্তার কাজটা করে মস্তিষ্ক যাকে বলা যেতে পারে চিন্তা ইন্দ্রিয়। চেতনা মস্তিষ্কের বৃত্তি। চেতনায় সত্তা প্রতিফলিত হয়; অতএব সত্তা বা অস্তিত্বই প্রাথমিক এবং চেতনা গৌণ ও উদ্ভূত।

অবর বস্তুবাদের সমালোচনা

এ-কথা বলে রাখা দরকার, চেতনার গৌণ প্রকৃতি স্বীকার করলেই সব হল না। এর আসল স্বরূপটা জানাও অত্যন্ত দরকার কারণ অনেক বস্তুবাদী আছেন যাঁরা চেতনার গৌণ প্রকৃতি স্বীকার করেন বটে কিন্তু এর স্বরূপ ঠিকমত বোঝাতে পারেন না। তাঁরা বলেন মস্তিষ্ক থেকে চিন্তার ক্ষরণ হয়, ঠিক যেমন যকৃৎ থেকে পিত্তর ক্ষরণ হয়। তাঁদের মতে, চিন্তা মস্তিষ্কের ক্ষরণ, মস্তিষ্ক তা প্রস্তুত করে এবং ক্ষরণ করে, ঠিক যেমন অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলো দেহের শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থ ক্ষরণ করে। যে-সব দার্শনিক এই মত পোষণ করেন তাঁদের বলা হয় ভালগার মেটেরিয়ালিস্ট বা অবর বস্তুবাদী, কারণ অত্যধিক সরল ও সমাচ্ছন্ন তাঁদের চিন্তা সম্পর্কে ধারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মতের প্রবক্তা ছিলেন জার্মান দার্শনিক কার্ল ভগ্ট এবং লুডভিগ বুখনার এবং ওলন্দাজ দার্শনিক জেকব মালেস্চট। এঙ্গেলস তাঁদের নাম দিয়েছিলেন বস্তুবাদের সস্তা ফেরিওয়ালা।

আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, এবং শুধু তাঁরাই নন। যেমন, কয়েকজন ইংরেজ চিকিৎসকও বড়াই করে বলেছেন যে, তাঁরা আত্মার "ওজন" বার করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা বলেন, আত্মার ওজন নাকি ৩০ গ্রাম। এই ধারণাও অবর পর্যায়ের কারণ এখানে চিন্তার সমগ্র জটিল পদ্ধতিটাকে স্থূলভাবে ৩০ গ্রাম জড়বস্তুর ওজনে পর্যবসিত করা হল। এক্ষেত্রে চেতনাকে জড়বস্তুর সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে।

কিন্তু তাই যদি হবে; তাহলে চেতনাকে দেখা যায় না কেন? এই রকম ধারণাটা নিয়ে শুরু করলে আমাদের কামনা বাসনা, ইচ্ছা, চিন্তা এইগুলির স্বরূপ বোঝা অসম্ভব। কারণ এইগুলি বস্তুধর্মী থেকে ভাবধর্মীই বেশি। এবং মনো-মরীচিকা শুধু অবাস্তবই নয়, তা এমন ব্যাপার নিয়ে হতে পারে প্রকৃতিতে যার অস্তিত্বই নেই। অবর বস্তুবাদীরা এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না।

ভাববাদীরা অবর বস্তুবাদকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। যেমন, সমকালীন বুর্জোয়া দার্শনিক হুইলরাইট এবং হস্‌পার্স এই মত পোষণ করেন যে, বস্তুবাদ কেবলমাত্র বাস্তব পদার্থকেই গ্রাহ্য করে এবং আত্মিক বিষয়, চেতনা বা মানবিক কামনা বাসনা---এইসবের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা ভগ্‌ট্‌, বুখনার ও মোলেস্‌চটের অবর বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বকে এক করে দেখেন। এর থেকে বেশী ভুল আর কিছু হতে পারে না। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের সঙ্গে অবর বস্তুবাদের কোন মিল নেই। মন ও চেতনার তাৎপর্য ও সারবস্তু সম্পর্কে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের ধারণা শুধু ভাববাদীদের বিরুদ্ধেই নয়, অবর বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

জড়বস্তুর সঙ্গে চেতনাকে এক করে দেখার জন্যে লেনিন অবর বস্তুবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, চেতনার প্রকৃতি বাস্তব নয়। তা শুধু বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবি, প্রতিরূপ। কিন্তু মস্তিষ্ক সাধারণ ক্যামেরার মত বস্তুজগতের প্রতিফলন বা আলোকচিত্র গ্রহণ করে না। বস্তুজগৎ মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয় এই অর্থে যে, মস্তিষ্কে বস্তুগুলিকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তাদের ভাবগত প্রতিরূপ। আমাদের চিন্তা সম্পর্কে মার্কস লিখেছিলেন: "ভাবনা মানবমনে বাস্তবজগতের প্রতিফলন এবং চিন্তার নানা রূপে রূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

আমরা জেনেছি, মস্তিষ্ক নামে অত্যন্ত জটিলভাবে সংগঠিত বস্তুর ধর্ম হচ্ছে চেতনা। মস্তিষ্কে যে প্রক্রিয়াগুলি হয়ে থাকে তাদের সঙ্গে চিন্তাকে গোলমাল করলে চলবে না। এই প্রক্রিয়াগুলিই চিন্তার বাস্তবভিত্তি। কিন্তু চিন্তা ব্যাপারটা মস্তিষ্কের মধ্যে যেসব শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া হতে থাকে তার চেয়ে

---

১ মার্কস---ক্যাপিটাল খণ্ড ১, পৃঃ ১৯।

অনেক বেশি জটিল ঘটনা। চেতনা, চিন্তা জড়বস্তুর গতিক্রিয়ার চরমতম প্রকাশস্বরূপ।

চিন্তা ও বাক

কখনও কখনও অযথার্থভাবে মানবেতর জীবদের মধ্যে "চিন্তা বলে যা নির্দেশ করা হয়, তার থেকে মানুষের চিন্তার আকাশ পাতাল প্রভেদ। বানরকে পরীক্ষা করে কৌতুহলজনক ফল পাওয়া গেছে। তাদের একটা আপেল দেওয়া হল কিন্তু তা তাদের নাগালের বাইরে। যেহেতু তাদের পথ রোধ করে রয়েছে একটা আগুন। বানরকে অবশ্য "শেখানো" হল যে, সে কাছাকাছি একটা জালা থেকে জল নিয়ে এসে আগুনটা নিভিয়ে দিতে পারে আর তারপর আপেলটাকে নিতেও পরে। এইভাবে সে আপেলটি নেয়ও। বানরকে তারপর নতুন এক অবস্থার মধ্যে ফেলা হল। আপেলটা রাখা হল একটা তক্তার উপর এবং তক্তাটা একটা পুকুরে ভাসিয়ে রাখা হল। আর জলের জালাটিকে সরিয়ে রাখা হল খানিকটা দূরে। বানরের কাজটা সেই একই : আগুনটা নিভিয়ে আপেল নেওয়া। বানর এবার জল হাতের কাছেই পেতে পারে, তক্তাটার চারপাশেই তা রয়েছে। কিন্তু তা না করে সে জলের জালা যেখানে আছে সেখান থেকে কষ্ট করে 'সেই' জল নিয়ে এল।

এই পরীক্ষা থেকে কী বোঝা যায়? এই যে, বানরদের "জল" সম্পর্কে নির্বিশেষ ধারণা নেই, জলের সাধারণ ধর্ম তাদের কাছে অজানা। বানরের চিন্তা তার চারপাশের পদার্থের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। উপরন্ত সরাসরি যোগ ছাড়া তাদের চিন্তা অসম্ভব। অতএব বানরেরা "চিন্তা করে" কেবলমাত্র তখনই যখন তাদের সামনে বস্তুগুলি থাকে। তখনই তাদের মধ্যেকার মৌলিক যোগসূত্র তারা আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু বিষয়গুলি তাদের সামনে না থাকলে তারা "চিন্তা" করতে পারে না।

অপরপক্ষে মানুষের চিন্তা গুণগতভাবে পৃথক। সে তার শ্রমের মধ্যে দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বিষয়ের সংস্পর্শে আসে এবং তার গুণাবলী অনুশীলন করে। সে লক্ষ্য করে জল, যে আধারেই থাক, পুকুরেই থাক, কুয়াতেই থাক, নদীতেই থাক, তার ধর্ম সর্বত্রই এক, যেমন তার আগুণ নেভাবার ক্ষমতা সব সময়েই আছে। এর থেকে তার মনে "জল" প্রত্যয়টি দানা বাঁধে। এই জল কোন বিশেষ স্থানের জল নয়, বরং আধার-নিরপেক্ষ

"জল"। এটি হচ্ছে বিমূর্ত প্রত্যয়। এই ক্ষেত্রে মানুষ প্রত্যক্ষ রূপগুলি থেকে, মূর্ত বস্তুগুলি থেকে বিমূর্ত করে তাদের অভিন্ন ধর্মগুলি এক এক করে বেছে নেয়। এইগুলিই আলোচ্য প্রত্যয়ের ভিতরকার বস্তুটিকে বিশিষ্ট করে তোলে।

যখন আমরা "গাছ" প্রত্যয়ের কথা বলি, তখন আমরা যে কোন গাছের যা সাধারণ গুণ তার কথাই বিবেচনা করি, যে বিশেষ গাছটি জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার গুণাবলীর কথা ভাবি না। প্রত্যক্ষ গাছ থেকে সাধারণ গুণগুলি আমরা বিমূর্ত করি। এইজন্যে এই প্রত্যয়কে বিমূর্ত প্রত্যয় বলা হয়। মানুষের চিন্তার এই বৈশিষ্ট্য, এই বিমূর্ত চরিত্র মানবেতর জীব লাভ করতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না?

আসল কথা হচ্ছে, শিশুকাল থেকে মানুষের মস্তিষ্ক বাকের অবধারিত প্রভাবে বিকাশলাভ করতে থাকে। যখন তার বয়স প্রায় নয় মাস, তখন সে বারে বারে 'মা' বলতে থাকে, এর থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় যে শিশুটি বহির্জগতে কি ঘটছে তার অর্থ বুঝতে শুরু করছে। এইটিই বা কি করে ঘটে? ঘটে দুটি কারণে: জীবন সম্পর্কে শিশুটির অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা এবং তার চতুর্দ্দিকের লোকদের কথা।

শিশু বল নিয়ে খেলা করে। সে আবিষ্কার করে বলটা গোলাকার ও নরম। অনেক রকমের বল নিয়েই সে খেলা করে, কোনটা হলদে, কোনটা সবুজ, কোনটা অন্য কোন রঙের কিন্তু প্রতিবারেই সে দেখে "এই বলটা"। ক্রমে "বল" শব্দটা তার মনে "সাধারণ বল" সম্পর্কে ধারণা জাগায়। এবারে সে "বল" প্রত্যয়টি জানতে পারে, এবং তা প্রকাশিত হয় একটি শব্দে। আমাদের চিন্তাগুলিও বাকের মধ্যে দিয়ে রূপ পায়। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, আমাদের চিন্তা বিমূর্ত, তা সাধারণ প্রত্যয়ের ভিত্তিতে জাগ্রত হয়।

কোন একটি বস্তুর প্রধান প্রধান ধর্ম সেই বস্তুটি থেকে আলাদা করে বার করে নেওয়া, বিমূর্ত করা, আমাদের দ্বারা কীভাবে সম্ভব হয়? কথা, বাক্ই তা সম্ভব করে। "বল" শব্দটি নির্দেশ করে যে, এর লক্ষ্যবস্তু সাধারণ বল, কোন একটি বিশেষ বল নয়। **বিমূর্ত চিন্তা বাকের সাহায্য ছাড়া প্রকাশ করা যায় না।**

শিশুকাল থেকে মানুষের চেতনা কথার, ভাষার, ভিত্তিতে গঠিত

হয়, কারণ তাদেরই মারফৎ আমাদের চিন্তার প্রকাশ হয়। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এমন একটি ব্যাপার ঘটে যা কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব: চিন্তা বাকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যায়। মানুষের চেতনাকে, তার চিন্তাকে বাক্ থেকে পৃথক করা যায় না। চিন্তার সঙ্গে ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য জৈব ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এঙ্গেলস্ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, স্পষ্টোচ্চারিত বাক্য সৃষ্টি হওয়ায় ফলেই বানরের মস্তিষ্কের পক্ষে ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিভাবে তা ঘটেছিল?

চেতনা ও বাকের সামাজিক প্রকৃতি

নিচের উদাহরণ থেকে আমরা এর যথার্থ উত্তর লাভে কিছুটা সাহায্য পেতে পারি। নেকড়ে বাঘ শিশুকে লালন করেছে, ইতিহাসে এমন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এইরকম একটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। একটা মাদী নেকড়ে একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। তার বয়স তখন তিন বছর পুরে হয়নি। কয়েক বছর পরে যখন তার সন্ধান পাওয়া গেল, দেখা গেল, মেয়েটি চারপায়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে. জান্তব আওয়াজ করছে এবং স্বভাবতই কথা বলতে পারছে না। শিশুটি যে প্রতি ব্যাপারে জন্তুদের অনুকরণ করছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু এর মধ্যে একটি আশ্চর্য ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। শিশুটিকে কথা বলানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। ছোট মেয়েটীর মধ্যে মানবীয় বিশেষত্ব, চেতনা, আর ফিরে এল না। নতুন জীবনের অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না এবং মারা গেল (এই ধরণের ঘটনা যতগুলি জানা গিয়েছে সব ক্ষেত্রেই শিশুগুলি শৈশবেই মারা গিয়েছে)

এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন জাগে। শিশুটী মানুষের স্বাভাবিক মস্তিষ্ক নিয়েই জন্মেছিল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই তার মস্তিষ্কও পরিণতি লাভ করছিল। তাই যদি হয়, তাহলে কি করে এমন হল যে, মেয়েটী তার চিন্তা করার ক্ষমতায় অত অপরিণত হয়ে রইল? আমরা আগে যা বলেছি তার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের জবাব আপনারা নিজেরাই সহজে দিতে পারবেন। স্পষ্টত মানবীয় চেতনা প্রকট হবার পক্ষে জীববিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক মস্তিষ্ক থাকাই যথেষ্ট নয়। সমাজে, সমূহের মাঝখানে বাসও যে করতে হয়। সমূহের

সত্তার বাইরে মানবীয় চিন্তার অস্তিত্ব নেই। সমাজে জীবন ধারণের ফলেই এর উদ্ভব হয়। চিন্তার তখনই আবির্ভাব ঘটে, যখন একপক্ষে তা প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে এবং অপরপক্ষে মানুষ তার শ্রমের মধ্যে দিয়ে, তার উৎপাদনী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে যুক্ত হয়। শ্রম থেকে মানুষের, মানব সমাজের সৃষ্টি। শ্রম ও উৎপাদনী কার্যকলাপের মারফৎ মানুষের মস্তিষ্ক ও তার চেতনা বিকাশ লাভ করে। সেই জন্যে মার্কস বলেছিলেন যে, চেতনার সূত্রপাত থেকেই তা সামাজিক উপজ এবং তা তাই-ই থাকবে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব আছে। চেতনা মানুষের সামাজিক জীবনের ফল। এটা সামাজিক ব্যাপার।

এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, সমাজের বাইরে চেতনা থাকতে পারে না। যেমন থাকতে পারে না বাক বা ভাষা। কেবলমাত্র শ্রমের প্রক্রিয়ার, উৎপাদনী কার্যের মধ্যে থেকে চিন্তার উদ্ভব হয় ও বিকাশলাভ করে। কারণ কেবলমাত্র মানুষ এই অবস্থাতেই সক্রিয়ভাবে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রকৃতির উপরে কাজ করে মানুষ তার চেতনাকে বিকশিত করে। কেবলমাত্র শ্রমাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ গভীর থেকে গভীরতরভাবে তার চেতনায় বস্তু প্রতিফলিত করে, তাদের তুলনা করে, লক্ষ্য করে, তাদের সাধারণ গুণ কী এবং তাই থেকে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় গঠন করে। ব্যবহারিক কার্যধারার মধ্যে দিয়েও মানুষ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও যোগ আছে তারও অনুশীলন করে। এইভাবে ক্রমশ বস্তু জগতের উৎপাদন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনাও বিকাশলাভ করল এবং চরমোৎকর্ষ লাভ করল।

"বানর থেকে মানব পর্যায়ে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা" নামক রচনায় এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন কি প্রক্রিয়ায় চিন্তা ও ভাষা আকার গ্রহণ করে। তিনি দেখান, কৌলিক মানবাকৃতি বানর থেকে মানব পর্যায়ে পরিবর্তনের প্রথম ধাপ হল ঋজু গতিভঙ্গী আয়ত্ত করা। এবং এই অবস্থা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু মানুষ শ্রমের প্রাকৃতিক উপকরণগুলি ব্যবহার করতে শুরু করল। এই উপায়ে মানুষের অগ্রপদগুলি মুক্ত হল ও শ্রমাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে উৎকর্ষ লাভ করতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের হাত হয়ে তা বিকাশ লাভ করল। হাত শুধু কাজ করার অঙ্গই নয়, তা কাজ করার ফলও বটে।

শ্রম কথাটির যথার্থ অর্থ ধরলে প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহারকে কিন্তু

পুরোপুরি শ্রম বলা চলে না। ইতিহাসের ধারায় শ্রমেরও বিকাশ ঘটেছে। যথার্থ শ্রম তখনই শুরু হল যখন মানুষ কৃত্রিম উপায়ে শ্রমের উপকরণ প্রথম সৃষ্টি করল। বানরও প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তা তৈরী করতে পারে না। প্রথম উপকরণ তৈরী হওয়া মানেই কিন্তু মানব সমাজের আবির্ভাব নয়। তাই থেকে শুধু সেই দীর্ঘ কর্মধারার সূত্রপাত যার পরিণতিতে বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়, অতএব চেতনা আকার লাভ করে। এই কালেই মানব ও মানব সমাজ তাদের নিজস্ব আকার লাভ করে।

এই কালেই বাকের উদ্ভব। আসল কথা হচ্ছে, মিলিতভাবে কাজ করার ও উৎপাদন করার পদ্ধতির মধ্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন-বোধ করল। এঙ্গেলস্ বলেন, এই প্রয়োজন থেকে তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ও বিকাশ-লাভ করে: বাণরের অপরিণত বাগ্‌যন্ত্র ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হতে লাগল, এবং মৌলিক যন্ত্রগুলিও স্পষ্টভাবে একটীর পর আরেকটী শব্দ উচ্চারণ করতে শিখল। এইভাবে, **ভাববিনিময়ের উপায় হিসেবে, মানুষে মানুষে যোগাযোগের মধ্যস্থ হিসেবে, চিন্তার বাস্তব আবরণ হিসেবে** ভাষা বা স্পষ্টোচ্চারিত বাকের উদ্ভব হল।

চিন্তার প্রকৃতি থেকেই ভাষা ও চিন্তার ঐক্য অবধারিত। কেবলমাত্র কথার মধ্যে দিয়েই চিন্তা যেন প্রকৃত চিন্তা হয়ে ওঠে। যতক্ষণ চিন্তা মানুষের মাথায় থাকে, মনে হয় তা যেন মৃত এবং তার কাছে অপর মানুষের প্রবেশ রুদ্ধ। সেইজন্যে মার্কস বলেছিলেন, ভাষাই চিন্তার অব্যবহিত বাস্তব রূপ। এর অর্থ, ভাষার বাস্তব আবরণের বাইরে চিন্তার অস্তিত্ব নেই। এমনকি যখন আমরা আমাদের চিন্তা সরবে প্রকাশ করি না, আপন মনে যখন চিন্তা করি, তখনও আমরা তাকে কথার সাজে, ভাষার সাজে সাজাই। আমরা ভাষার কাছে ঋণী। এই ভাষা আছে বলেই চিন্তা আকার পায় এবং অন্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। এবং লেখার সূত্রে তা এক কাল থেকে আরেক কালে প্রবাহিত হয়ে চলে।

এতৎসত্ত্বেও, আগে যা বলা হল তার থেকে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় চিন্তা ও ভাষা একই তাহলে খুব ভুল করা হবে। তারা এক ঐক্যবন্ধনে যুক্ত কিন্তু তারা অবিকল এক ঘটনা নয়। চিন্তা বস্তুজগতকে প্রতিফলিত করে। ভাষা কিন্তু অপর মানুষের কাছে ভাব প্রেরণ করার উপায়। চিন্তার সঙ্গে বস্তু-

জগতের সরাসরি যোগ। ভাষার সঙ্গে বস্তুজগতের যোগ সরাসরি নয়, চিন্তার মারফৎ। এর তাৎপর্য হচ্ছে, মস্তিষ্ক জগতের ঘটনাবলীর এবং তাদের মধ্যে-কার যোগগুলির "আলোকচিত্র গ্রহণ করে", এবং তারই ফলে আমাদের চিন্তা ও প্রত্যয় উদ্ভূত হয়। ভাষার সাহায্যে আমরা শুধু সেইগুলি অন্য মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিই। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি প্রায়ই দেখা দেয়। যদি চিন্তা বস্তুজগতের প্রতিফলন হয়, বা তার আলোকচিত্র নেয়, তাহলে উদ্ভট কল্পনা বা শূন্যবিহার, যার সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন বস্তুর সঙ্গে মিল নেই, তার কিভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব ?

বস্তুবাদ, স্বপ্ন এবং উদ্ভট কল্পনা

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃত্রিম মহাকাশযান যখন সৃষ্টি হয়নি, রকেট বিজ্ঞানের জনক, রুশ বৈজ্ঞানিক কন্‌ষ্টান্‌টিন্‌ সিওল্‌কোভ্‌স্কি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে "দৃঢ়নিশ্চয়" হয়েছিলেন। এর থেকে কি বোঝায় না যে, চিন্তা গৌণ নয়, মুখ্য ? এই ঘটনা কি বস্তুবাদের বিরোধী নয় ?

লেনিন উল্লেখ করেছিলেন যে, উদ্ভট কল্পনার অস্তিত্বের ফলে মানুষ অনি-বার্যভাবে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, পারিপার্শ্বিক বস্তুজগত থেকে স্বাধীনভাবেই চিন্তার উদ্ভব হয়। ভাববাদের গোড়া এইখানেই : এমন একটি ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে যার থেকে ভাববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব যে, চিন্তা বস্তুজগতকে বাদ দিয়ে, এমন কি তা অগ্রাহ্য করেও উদ্ভূত হতে পারে। দেখা যাক, এ রকম সিদ্ধান্তের কোন ভিত্তি আছে কিনা।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি স্মরণ যাক। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে লেনিন নূতন ধরণের একটি দল গঠন করতে উদ্যোগী হন। ঠিক এই সময়ে "**ইতিকর্তব্য কী ?**" নামক গ্রন্থে শ্রমিক নেতা সেই বিখ্যাত নির্দেশ দেন : "আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে।" লেনিন কিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন ? তিনি একটি শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ কথা সুবিদিত, কি রকম নিখুঁতভাবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এবং এই রকম দল খুব বেশিদিন আগেও গঠিত হয়নি। **জীবন** থেকেই, **বস্তুজগত** থেকেই লেনিনের স্বপ্নের, তাঁর অসম্ভব চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল।

সিওলকোভস্কির কল্পনারও গোড়া ছিল বস্তুজগতে, বাস্তব জগতের নিখুঁত গাণিতিক হিসাবে। তারই ভিত্তিতে, যার আসন্ন আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী,

তার তিনি চমৎকার কল্পনা করেন। মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশ অভিযানে প্রমাণিত হল সিওলকোভ্স্কির স্বপ্ন ও কল্পনা কত বাস্তব ছিল।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, স্বপ্নই বলুন, উদ্ভট কল্পনাই বলুন, তারাও বস্তুজগতের প্রতিফলন এবং কেবলমাত্র বাস্তব জগতের ভিত্তিতেই উদ্ভূত হয়। স্বপ্নের পাখা বস্তুজগতেরই দান।

তাহলে, একথা স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, বস্তুবাদ স্বপ্ন বা উদ্ভট কল্পনাকে কেবল যে নাকচ করে না, তাই নয়, অপরপক্ষে, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে তার ব্যাখ্যাও করে।

বস্তু এবং চেতনার পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সময় আরও একটি প্রশ্ন প্রায়ই দেখা দেয়। সেই প্রশ্নটি পরীক্ষা করা যাক।

বস্তুবাদ যদি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহলে কি তা এই সব মানবীয় গুণ, যেমন, অনুভূতি, উৎসাহ, অনুরাগ, অর্থাৎ মানুষের আত্মিক সম্পদ বলতে যা কিছু বোঝায়, তাও কি অস্বীকার করে না? আমরা বলতে অভ্যস্ত "কি রকম মনপ্রাণ দিয়ে বাজাচ্ছে," অথবা "সে তার মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে।" মনপ্রাণ যদি নাই থাকে তবে আর কী ঢালবে? এই প্রশ্ন অনেক সময় করা হয়। সমকালীন ফরাসী ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পিয়ের বিগো লিখছেন যে, বস্তুবাদ "আত্মিক মূল্য স্বীকার করে না," কারণ তার কাছে একমাত্র বাস্তব মূল্যই গ্রাহ্য। এ কথা কি সত্য? কখনই নয়। এ হচ্ছে বস্তুবাদের নামে কুৎসা। বস্তুবাদীরা আত্মাকে বিশেষ একটি অবাস্তব সত্তা হিসেবে স্বীকার করে না। কিন্তু তারা মানুষের আন্তরিক আত্মিক জগতকে অগ্রাহ্য করে না। তারা মানুষের আত্মিক সম্পদকেও অস্বীকার করে না। সেই লেখক নিম্ন পর্যায়ের লেখক, যে পাঠকের প্রাণে তার বক্তব্য পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করে না, যে তার অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে চায় না।

বস্তুবাদ ও মানুষের আত্মিক সম্পদ

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট জনসাধারণের কেবল পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে নয়, তাদের আত্মিক সম্পদের উন্নতির জন্যেও সর্বদা ব্যাপৃত। মানুষের চেতনা যে অবস্থার মধ্যে থেকে জাগ্রত হয় তার থেকে সেই চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; আমরা দেখেছি চেতনায় বস্তুজগৎ, জীবন, প্রতিফলিত হয়। মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির স্ফুরণ হবার উপযোগী অবস্থা, সাম্যবাদের

সংগঠকদের মধ্যে উচ্চস্তরের চেতনা জাগ্রত হবার উপযোগী অবস্থা কমিউনিষ্ট পার্টি প্রবর্তিত করে। সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে তাদের আদর্শের মহিমা ও উৎকর্ষ অত্যন্ত প্রিয়। অতএব, কী মর্মান্তিক মার্কসবাদের বুর্জোয়া "সমালোচকদের" এই অপপ্রয়াস, যাতে তারা সাম্যবাদকে মানুষের চরিত্রের আত্মিক ও মানসিক দিকগুলি অবহেলা করার দায়ে দায়ী করে। আজকালকার কমিউনিষ্ট বিরোধীদের এইসব মিথ্যাবাদের সমুচিত উত্তর পাওয়া যাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির নূতন কর্মসূচীতে। এই কর্মসূচীর প্রতি ছত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে, সোভিয়েট জনসাধারণের শিক্ষার জন্যে, সাম্যবাদের সংগঠকদের শিক্ষার জন্যে, কি রকম অসাধারণ যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

চেতনার সক্রিয় ভূমিকা

স্নতরাং সাম্যবাদ চেতনার গৌন প্রকৃতি স্বীকার করলেও মানুষের জীবনে তার ভূমিকার গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। এই প্রশ্নটি এবারে আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। স্বপ্নের অস্তিত্ব ও সুস্থ কল্পনাবিহারই প্রমাণ করে যে, চেতনা জগতের নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র নয়। এই দিক থেকে চেতনা যেন বস্তুজগৎকে অতিক্রম করে, সক্রিয়ভাবে তাকে প্রভাবিত করে এবং তাকে পরিবর্তিত করার পথ ও উপায় নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত জনসাধারণ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক রচিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার কথা ভেবে দেখুন। এক্ষেত্রে চিন্তা ও চেতনা বস্তুজগতকে ছাড়িয়ে যায়, বস্তুজগৎকে তার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ করে এবং সমগ্র জাতির জীবনে সৃজনের অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করে। চেতনা সক্রিয় চালকশক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে। সাম্যবাদের সাফল্যের জন্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করে। এই অর্থেই মার্কস বলেছিলেন যে, যখন কোন একটী ভাব মানুষের মন অধিকার করে, তা একটী বাস্তব শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এর মানে, মানুষ বিরাট আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে বিরাট কাজ করার ক্ষমতাও অর্জন করে। চেতনাই জগৎ সৃষ্টি করে, লেনিনের এই উক্তির অর্থ এইভাবেই বোঝা উচিত।

চেতনা বস্তুজগতকে যেমন প্রতিফলিত করে, সেইসঙ্গে চেতনা বস্তু জগতের পরিবর্তনকেও পরিচালিত করে। মনে করুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের কথা, যা আজকের দিনে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে একটী শক্তিশালী বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভাববাদীরা মানুষের চেতনার এই দিকটাকে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করেন। তাঁরা বলেন : যেহেতু চেতনা সক্রিয়, সুতরাং তা মুখ্য ও মৌলিক, চেতনাই মানুষের কর্মের পরিচালক। তাঁরা দাবি করেন যে, মানবীয় চেতনার সক্রিয় প্রকৃতি ভাববাদের জয়ের সূচক। কিন্তু সত্যিই কি তাই? চেতনা মানুষের কার্যকলাপ চালিত করে বলেই তা মুখ্য নয়। অপরপক্ষে, সব উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও কর্মের পরিকল্পনা চেতনা পায় বস্তুজগৎ থেকে, এই কার্যকলাপ থেকেই। আমরা আগেই তা দেখেছি।

মানুষের চেতনার ক্রিয়া সম্পর্কে যা বলা হল তা আধুনিক যন্ত্রশিল্পের অত্যাশ্চর্য একটী ঘটনা অনুশীলন করতে ও ঠিকমত বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। আপনারা কমপিউটার যন্ত্রের নাম শুনেছেন।

চিন্তা এবং যন্ত্র

তারা অত্যন্ত জটিল সব কাজ সমাধা করে : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারে, বিমানের পথ প্রদর্শক হতে পারে, রেলগাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি দাবাও খেলতে পারে। তারা এমন কিছু যুক্তিবিচার করতে পারে যা মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষত্ব। কখন রেলগাড়ির গতি কমিয়ে দেওয়া দরকার, তারাই তা স্থির করে, তারা কোন কোন প্রক্রিয়া "মনেও রাখে", এইরকম আরো অনেক কাজ তারা করে। মনে হয় যেন, ধাতব পদার্থ মানুষের মত চিন্তা করার অধিকারী হয়েছে।

কিন্তু এমন কোন যন্ত্র কি তৈরী করা সম্ভব যা মানুষের মস্তিষ্কের কাজ পুরোপুরি করতে সক্ষম? না, তা পারে না। একথা সত্য, যন্ত্র নিখুঁতভাবে অনেক কাজই করতে পারে, সেইজন্যে মানুষ তা কাজেও লাগায়। এই যন্ত্র এমন অনেক তথ্যও আবিষ্কার করতে পারে যা এর স্রষ্টারও জানা নেই। কিন্তু সব সত্ত্বেও তা মানবমনের সহকারী হয়েই চিরকাল থাকবে। মানুষ না থাকলে যন্ত্র "জড় ধাতু" বই কিছু নয়।

মানুষের মস্তিষ্ক যে কোন যন্ত্রের তুলনায় অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ কেন? যেহেতু তার উদ্ভব সামাজিক সম্বন্ধ থেকে। আমরা আগেই দেখেছি, চিন্তারও সামাজিক দিক আছে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া এইসব সামাজিক সম্বন্ধগুলির মতই জটিল। কিন্তু কোন "ইলেকট্রন মস্তিষ্কই" মানুষের আন্তরিক আত্মিক জগতকে, তার সক্রিয় প্রকৃতিকে", তার স্বপ্ন ও কল্পনা বিহারকে, তার সংকল্পের

প্রয়োগ ক্ষমতাকে, তার জটিল শিল্পজগতকে ফাটিয়ে তুলতে” পারে না।

আমরা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের কয়েকটা মৌলিক সমস্যার পরীক্ষা করলাম। সেগুলি আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে আমাদের মার্কসবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার সারমর্ম সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা দরকার। এই সারমর্ম তার সূত্রগুলিতে ও মূল প্রত্যয়গুলিতে প্রকট। এবার আমরা এইগুলি পরীক্ষা করব।

দ্বন্দ্ব সমন্বয় বিদ্যার মৌলিক সূত্র সমূহ।

পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ সূত্র

আমরা সচরাচর সূত্র কাকে বলি তা বোঝার জন্যে অত্যন্ত সহজ একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শূন্যে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে তা মাটিতে এসে পড়ে। ধনুক থেকে একটা তীর ছুঁড়ে দিলেও তাই হয়।

সূত্র কাকে বলে?

এই ঘটনাগুলির প্রকৃতি কি রকম? তারা যে ঘটছে, কেমন করে ঘটছে? প্রথমে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার, আমরা এমন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছি না যা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে, আমাদের ঘটনাগুলি **অবশ্যম্ভাবী, না ঘটে পারে না।** একটি বস্তু শূন্যে ছুঁড়ে দিলে, মহাকর্ষের টানে তার মাটিতে ফিরে আসা অবশ্যম্ভাবী। এর অর্থ, এক্ষেত্রে এমন একটা নিয়ম, একটি পারম্পর্য ও শৃঙ্খলা আছে যার কোন ব্যতিক্রম নেই। আমাদের ব্যবহারিক কার্যকলাপে আমরা যখন এই ধরণের ঘটনার সংস্পর্শে আসি, আমরা তখন বলি, এদের মধ্যে **নিয়ম নিয়ন্ত্রিত মৌলিক যোগ** আছে। এমন অনেক ঘটনার মধ্যে যোগ থাকে যা আমাদের গোচরীভূত নয়। যেমন, একটা কয়লার খনির সঙ্গে, আমরা বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাই তার সঙ্গে কী যোগ থাকতে পারে? আলো জ্বলে তাড়িত প্রবাহের দরুণ, তা তৈরী হচ্ছে ডায়নামো থেকে। ডায়নামোটা চলে বাষ্পচালিত টারবাইন-এ, টারবাইন চলে কয়লা খনি থেকে আনা কয়লায় বা অন্য কোন জ্বালানিতে। এইবারে, যোগটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কৃষি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্যে কাঁচামাল সরবরাহ করে, আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠান কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি, সার, বিদ্যুৎ প্রস্তুত করে। তাই সব নয়। কৃষি ও শিল্পের বিকাশের ফলে বিজ্ঞানকে

বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞান ব্যবহারিক জগৎ থেকে নূতন নূতন তথ্য লাভ করে সমৃদ্ধ হয়। বিজ্ঞান আবার কৃষির ও শিল্পের বিকাশকে প্রভাবিত করে। অতএব অর্থনীতির প্রধান প্রধান শাখাগুলি পারস্পারিক ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত থেকে বিকাশ লাভ করে।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে এবং আগে যা বলা হয়েছে তার থেকে দেখা যায় যে, **প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলী পারস্পরিক যোগযুক্ত, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।** একটি দ্রব্য আরেকটি দ্রব্যের উপর নির্ভর করে, এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয় কোন দ্রব্যের উপর, এবং এই প্রকার যোগসূত্রের, নির্ভরতার, বা তথাকথিত সম্বন্ধের, শেষ নেই। সেইজন্যেই এঙ্গেল্‌স বলেছিলেন যে, আমরা যখন প্রকৃতি বা মানব ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করি, বস্তুজগতের ঘটনা ও বিষয় সমূহের মধ্যে অগণিত অসংখ্য যোগসূত্র ও আন্তর-ক্রিয়া দেখতে পাই। সব যোগসূত্রই অবশ্য সমান তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়। আপতিক, পরিনামী যোগও যেমন আছে, যেমনি ধ্রুব, প্রগাঢ়, সারস্বরূপ, কিংবা তথাকথিত নিয়মনিয়ন্ত্রিত, যোগও আছে।

সূত্র ঠিক এই ধরণের প্রগাঢ় ও ধ্রুব সম্বন্ধগুলি প্রকাশ করে। লেনিন বিশদভাবে বলেছিলেন যে, ঘটনাবলীর মধ্যে যা সারস্বরূপ তাই সূত্রের অন্তর্ভুক্ত। তিনি লিখেছিলেন "সারস্বরূপ সম্বন্ধই সূত্র"[১]। অন্যভাবে বলতে গেলে, **সূত্র পরিদৃশ্যমান ঘটনা ও পদার্থের মধ্যে এমন সম্বন্ধ, যা আপতিক, বাহ্যিক, ক্ষণস্থায়ী, অবস্থাসঞ্জাত নয়, যা আন্তরযোগযুক্ত জগদ্‌ব্যাপারের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত।** সূত্র সব যোসূত্রগুলি প্রতিফলিত করে না, কেবলমাত্র সেইগুলি করে যেগুলি প্রধান এবং অবধারিত। সূত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ বলতে শুধু এইটুকুই বোঝায় না। সাধারণতঃ বলা হয় সূত্রের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

সূত্র সর্বাত্মক ও এর দ্বারাই সূত্রের প্রকৃতি বোঝা যায়, যথা, একটি

সবিস্তারক যোগ বিশেষ ধরণের কতকগুলি নয়, যাবতীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে সূত্র সম্পৃক্ত। যেমন, আর্কিমেডিস্‌এর তত্ত্ব যে কোন তরলপদার্থে নিমজ্জিত যাবতীয় বস্তুর উপরে প্রযোজ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, আর্কি-

---

[১] লেনিন: **কালেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ৩৮ পৃ ১৫৩

মেডিস'এর তত্ত্বে বিজ্ঞাপিত সম্বন্ধ (নিমজ্জিত বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাসের সঙ্গে অপসারিত তরলপদার্থের ওজন) সর্বতোগ্রাহ্য। এই প্রকার সূত্র মাত্রই; তা ঘটনাবলীর মধ্যে কোন সাধারণ কিছুকে প্রকাশ করে। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন: "সূত্র প্রকৃতির সার্বিকতার রূপ"[১] তাহলে, **যা অত্যন্ত প্রগাঢ় ও সর্ব্বময় তারই সঙ্গে সূত্র আমাদের পরিচয় ঘটায়।**

সূত্র যে যোগসূত্রকে প্রকট করে তা শুধু সর্বময়ই নয়, তা **মাত্রাত্মকও**। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূত্র যা বলে তা অনিবার্য আবিশ্যিকভাবে ঘটবেই। চলতি কথায়, "সূত্র" বা "বিধি" বলতে এমন নিয়ম বোঝায়, যাতে আইনগত বাধ্যতা আছে। কিন্তু যখন দার্শনিক অর্থে সূত্রের কথা বলি, আমরা তখন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিষয়গত বিধিনিয়মকে বুঝি, যা প্রকৃতির বিকাশধারাকে চালিত করে।

যেহেতু বস্তু ও ঘটনার অস্তিত্ব বিষয়গত, তাদের মধ্যে যোগসূত্র, অর্থাৎ যে নিয়মসূত্রে তাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাও বিষয়ীভূত। তাহলে, **সূত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ তার বিষয়মুখ প্রকৃতি।** এর তাৎপর্য, প্রকৃতির বা সমাজের বিকাশধারায় যে নিয়মানুবর্তিতা বর্তমান, তা মানুষের চেতনা বা অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে না। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা এর প্রমাণ। যেমন, মানব সমাজের উদ্ভব হওয়ার বহু আগে থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রগুলি কার্যরত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হয়েছে। কিন্তু যে নিয়মসূত্রে আমাদের গ্রহের গতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা এই গ্রহের মতই প্রাচীন। প্রকৃতির অন্যান্য নিয়মসূত্র সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

সামাজিক সূত্রগুলির প্রকৃতিও বিষয়াত্মক। লোকে তা সৃষ্টিও করতে পারে না, বরবাদও করতে পারে না, খেয়ালখুশিমত তা "রদবদলও" করতে পারে না।

ভাববাদী দার্শনিকেরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা নিয়মসূত্রের বিষয়মুখ প্রকৃতি অস্বীকার করেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট তাঁর সময়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রকৃতির নিজস্ব কোন নিয়ম নেই। সব কিছুই বিশৃঙ্খল, কেবল মানুষের মন প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা ও নিয়ম আরোপ করে। মানুষ যদি

১ এঙ্গেলস্‌, **ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌** অব্‌ নেচার: পৃ ১১০

না থাকত, নিয়ম বলে কিছুই থাকত না। আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিকেরা এই মতেরই পুনরুক্তি করেন।

তাঁদের যুক্তির ভিত্তি কী? কাণ্টের কথানুযায়ী আমরা যে মুহূর্তে কোন ঘটনা অনুধাবন করতে শুরু করি, আমরা আগে থেকেই নিয়মের সন্ধান করি। অতএব, বস্তুজগতের সংস্পর্শে আসার আগেই আমাদের মনে নিয়মের প্রত্যয় থাকে। আমাদের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তা ওতপ্রোত, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতে নিয়মের অস্তিত্ব নেই। এই কারণে কাণ্ট বলেছেন যে, নিয়মসূত্রের মূলপ্রত্যয়টি স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতার আগে থেকেই আমাদের বিচারবুদ্ধিতে তা বর্তমান। কিন্তু এই সব যুক্তি বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় টেঁকে না। বাস্তবিকপক্ষে, যেহেতু **আজকাল** লোকে জগতের বিকাশধারার অন্তর্নিহিত নিয়মের সন্ধান করে, তাই বলে কি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে, তারা **বরাবরই** সন্ধান করে এসেছে? আমরা আজকাল ব্যাকটিরিয়ার অনুসন্ধান করি, যাতে ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু তাদের অস্তিত্বই যখন মানুষ জানত না, তখন তারা তার সন্ধানও করত না।

যারা আদিম বর্বর তাদের জাগতিক নিয়মের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, তাই তারা তার সন্ধানও করত না। অতএব এই নিয়মগুলি তাদের "সহজাত" ছিল না। পরবর্তীকালে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ যখন ঘটনাসমূহের পারস্পারিক যোগের মধ্যে নিয়মের বিধান দেখতে পেল তখনই বস্তুজগতে তারা তার সন্ধান করল এবং সন্ধান করে আবিষ্কার করল। এর থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, নিয়ম মূলপ্রত্যয়ের প্রকৃতি স্বতঃসিদ্ধ, এই উক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার বিরোধী। প্রকৃতি ও সমাজের সূত্রগুলি যে বিষয়ীভূত, এই তার প্রমাণ।

অতএব, **পরিদৃশ্যমান জগতের ঘটনা ও বিষয়সমূহের মধ্যে যে সর্বময়, আবিশ্যিক এবং আপেক্ষিকভাবে ধ্রুব সম্বন্ধগুলি বর্তমান, সূত্র তাই প্রকাশ করে।**

সূত্রগুলি কি প্রকারের?

প্রকৃতির কোন এক ক্ষেত্রের বা কোন একটি বিশিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক ঘটনাসমূহের মধ্যে যদি কোন নিয়মসূত্র অপরিহার্য যোগসূত্র নির্ণয়

করে, তাকে বিশেষ সূত্র বলা হয়। এই ধরণের সূত্রের অনুশীলন করা হয় জীববিদ্যায়, পদার্থবিদ্যায় ও অপরাপর বিজ্ঞানে। যে নিয়মসূত্র প্রকৃতির সমুদয় ঘটনাপুঞ্জের বা সমাজের সমুদয় ঘটনাপুঞ্জের কিংবা চিন্ময় জগতের সমুদয় ব্যাপারের সার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, তাকে বলা হয় সাধারণ সূত্র। এই রকম সূত্র মহাকর্ষ সূত্র, যা প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। উৎপাদনের চূড়ান্ত ভূমিকা সূত্রটি সমাজেতিহাসের সর্বত্র কার্যরত। এইটিও সাধারণ সূত্র। কিন্তু যদি সূত্র এমন হয় যা প্রকৃতি, সমাজ, চিন্ময়জগৎ, সর্বক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের সার সম্বন্ধকে নির্ণয় করে। সেই সূত্র সার্বিক সূত্র। মার্কসবাদী দর্শন এই সূত্র গুলির অনুশীলন করে, সূত্রগুলি এই :

(ক) পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ সূত্র।

(খ) দুই বিপরীতের ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্র।

(গ) নাস্তিত্বের নাস্তিত্ব সূত্র।

কয়েকটি অত্যাশ্চর্য অবস্থান্তর

ধ্বনি থেকে অধিকতর দ্রুতগতিতে যেতে পারে এমন বিমান তৈরী করতে কিংবা একটি মহাকাশযান তৈরী করতে এমন সব উপকরণের দরকার হয় যা প্রাকৃতিক জগতে নেই। সেগুলি কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? যেমন কি উপায়ে আমরা একটি মিশ্রধাতু পেতে পারি যা ইস্পাতের চেয়ে কঠিন কিন্তু কাঁচের থেকে স্বচ্ছ। এই সমস্যা সমাধানের হদিস আমরা পাই রসায়ন থেকে।

বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, নূতন গুণসম্পন্ন পদার্থের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বৃহৎ অণুগুলিকে নূতন ভাবে সংযোগ করা দরকার। এর ফলে নূতন নূতন পলিমার বা বিপুল সংখ্যক পরমাণুবিশিষ্ট অণু কিভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবিত হল। দেখা গেল, কেবলমাত্র পরমাণু সংখ্যায় এবং অণুর গঠনে একটু বদল করে দিলে বস্তুর সমুদয় গুণাবলীর মধ্যে অভাবিত পরিবর্তন আনা যায়। দৃঢ় বস্তু স্থিতিস্থাপক হয়ে যায়, কঠিন নরম হয়ে যয়ে, অনচ্ছ স্বচ্ছ হয়ে যায়। **অণুর পরিমাণগত সংযুতি পরিবর্তিত করে রসায়নবিদেরা পদার্থের নূতন গুণ, নূতন ধর্ম সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন।**

এর থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, পরিমাণ ও গুণের মধ্যে কোন এক প্রকারের যোগ, এক প্রকারের নির্ভরতা আছে। এখানে কি কোন সূত্রের

আভাস পাওয়া যাচ্ছে না? বর্তমান আলোচনায় আমরা এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করব। প্রথমে দেখা যাক, পরিমাণ ও গুণ বলতে আমরা কী বুঝি।

গুণ এবং ধর্ম

প্রতিটি জিনিসের যেন একটা দেহাবয়ব আছে যার দ্বারা তাকে চেনা যায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন প্রতিটি বস্তুর—তা সে দোয়াতদানিই হোক, একটা গাছই হোক বা একজন মানুষই হোক—একটি **আভ্যন্তরিক অবচ্ছিন্নতা** আছে, অর্থাৎ **আকার, রূপ ও লক্ষণ** আছে, যা তার সংজ্ঞা নির্দেশ করে, যা, সে বিষয়ে যা সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য তা প্রকাশ করে এবং তার সার স্বরূপকে বিজ্ঞাপিত করে।

কেন বলি, এইটে পেন্সিল? যেহেতু, আমার সামনে কাঠ দিয়ে মোড়া একটা সরু সীসের দণ্ড রয়েছে, যা দিয়ে আমি লিখতে বা আঁকতে পারি। এরদ্বারা আমি জিনিসটির প্রধান প্রধান ধর্ম, তার আভ্যন্তরিক অবচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করলাম, এবং এইভাবে, যার দ্বারা এটা এই হয়েছে, অর্থাৎ এর গুণ প্রকটিত হল।

অতএব, গুণ এমন অবচ্ছিন্নতা যা সহজাত, অর্থাৎ যা বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোত, যা তার সারভূত লক্ষণগুলির সমাহার, এবং যা আছে বলেই বস্তু আপেক্ষিক স্থায়িত্ব অর্জন করে এবং অন্যান্য বস্তু থেকে পার্থক্য রক্ষা করে।

কিসের ভিত্তিতে আমরা গুণের বিচার করি? নূতন নূতন পদার্থের যে অত্যাশ্চর্য জগতের কথা একটু আগে বলা হয়েছে তার কথা স্মরণ করুন। একটি সরু সুতোয় একমণ ওজনের একটি জিনিস বাঁধা আছে। সুতোটির অপর প্রান্ত ঘরের উপরে সংলগ্ন একটি কপিকলের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে এনে টানা হচ্ছে। আমাদের স্বভাবতই মনে হবে "সুতোটা নিশ্চয় ছিড়ে যাবে," কিন্তু সুতোটা ছিঁড়ল না, তা ওজনটাকে টেনে তুলল। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি ছোট মেয়ে এক বোতল দুধ কিনে নিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে হঠাৎ বোতলটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল। কিন্তু পড়ে গিয়েও বোতলটা ভাঙল না, বলের মত তা লাফিয়ে উঠল।

যদি এই জিনিসগুলি দেখে থাকেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন: প্রতিটি ক্ষেত্রে এক একটি নতুন ধর্ম অর্জিত হয়েছে, প্রথম ক্ষেত্রে—এমন একটি সুতো যা ছেঁড়ে না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—এমন একটি কাঁচ যা ভাঙেনা। দেখেশুনে ঠিকই বলবেন যে, এই গুলি নূতন গুণসম্পন্ন পদার্থ। আপনি তাঁদের

নূতন ধর্ম দেখতে পেয়েছেন বলেই তাদের নূতন গুণ আবিষ্কার করলেন। আমরা সর্বদা এই ভাবেই চলি। যেমন, আমরা যখন ধাতুর প্রকৃতি পরীক্ষা করি তখন তার ধর্মগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি : যেমন, তার বর্ণ, তার পরমাণুর ওজন, তা কঠিন, না, নরম, তা অক্সিডাইজ হয় কিনা, ইত্যাদি। এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা তার আভ্যন্তরিক অবচ্ছিন্নতা অর্থাৎ তার গুণের কথা জানতে পারি।

অতএব, **ধর্ম বস্তুর একটি লক্ষণ, তার ও তার বৈশিষ্ট্যগুলির স্বভাবসূচক** একটি ধারকত্ব। বস্তুর এই সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিই তার গুণ। এর থেকে প্রতিপন্ন হয়, **গুণ ধর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়।**

একটি বস্তুর সাধারণত একটি নয়, অনেকগুলি ধর্ম থাকে। সুতরাং গুণকে ধর্মের সঙ্গে যেন এক করে দেখা না হয়। গুণ একটি আভ্যন্তরিক ঐক্য, ধর্মসমূহের সমাহার। এর থেকে বোঝা যায়, একটি বিচ্ছিন্ন ধর্মের দ্বারা কোন একটি বস্তুর গুণ বোঝান যায় না, তার সব ধর্মগুলি একত্রিত করেই তা বোঝান যায়।

পরিমাণ

বস্তু ও ঘটনার নিদর্শন কেবলমাত্র গুণই নয়, পরিমাণও। এটা বোঝা কষ্টকর নয়, কারণ বস্তুর গুণ সম্পর্কিত প্রশ্ন ছাড়াও (তারা নিজেরা কী) আমরা সর্বদাই তাদের পরিমাণ সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন বোধ করি (যেমন, সংখ্যা, আকার, আয়তন, ইত্যাদি।) এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, যেহেতু প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রেরই পরিমাণগত ও গুণগত অবচ্ছিন্নতা আছে।

বস্তু ও ঘটনার পরিমাণগত বিশেষত্ব অনেক প্রকারের। সেইজন্যে বিভিন্ন উপায়ে তার প্রকাশও হয়ে থাকে। যেমন, আমাদের কৌতূহল যদি কোন কারখানায় যন্ত্রের পরিমাণ সম্পর্কে থাকে, আমরা তা সংখ্যায় প্রকাশ করি ; ৩, ৪, ১০ ইত্যাদি। আমরা যদি শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করি, আমরা তা শতকরা হিসেবে বলি, তা সেই হিসেবে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে।

অতএব, **পরিমাণ বলতে আমরা বুঝি সংখ্যা, আকার, হার, আয়তন, অংশ ইত্যাদি দ্বারা সূচিত বস্তু ও ঘটনাবলীর অবচ্ছিন্নতা।**

যখন কোন বস্তুর গুণের বদল করা হয় তখন বস্তুটিই বদলে যায়। কিন্তু পরি-

মাণগত পরিবর্তনের ফলে বস্তুর পরিবর্তন কি অবশ্যম্ভাবী? এই ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

আপনারা হয়ত জানেন, নদীর খাত বন্ধ করে দেবার জন্যে কি করে বাঁধ তৈরী করা হয়, যাতে তার উপর জলবিদ্যুতের ষ্টেশন নির্মাণ করা যেতে পারে। লরি থেকে প্রকাণ্ড বড় বড় কংক্রিটের খণ্ড নদীর খাতে ফেলে দেওয়া হয়। খণ্ডগুলি সংখ্যায় এমনই যে সেগুলি নদীতে পড়ার ফলে জলের প্রবাহ রীতিমত কমে আসে! আরও কয়েকটা খণ্ড ফেলার পর জলপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আলাদা আলাদা খণ্ডগুলি থেকে একটি বাঁধ গড়ে ওঠে।

এখানে ব্যাপারটা কী ঘটল? যতক্ষণ পরিমাণগত পরিবর্তন একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ছিল, তাদের দ্বারা নূতন গুণ গঠন করা (এই ক্ষেত্রে বাঁধ) সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সীমায়, একটি নির্দিষ্ট **মাপে** পৌঁছনো গেল, তখন পরিবর্তন সমগ্র প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত না করে পারল না, অথচ প্রথমে মনে হয়েছিল, তার কোন প্রভাবই নেই।

মাপ কি?

মাপ

"মাপ" শব্দটি কোন কিছুর সীমা নির্দেশ কয়ার জন্যে, কোন কিছুর চৌহদ্দী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে, মাপ পরিমাণের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত। কিন্তু মাপ গুণের সঙ্গেও যুক্ত। এই তারতম্য বোঝা যাবে কি করে? নিচের দৃষ্টান্তটি কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

একটা পাথর খণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখুন। খণ্ডটা বড়ও হতে পারে, ছোটও হতে পারে, কিন্তু পাথর মাত্রেরই একটা বিশেষ আকার আছে। যদি তার কয়েক শত গজ উচ্চতা থাকত তাহলে তা কখনই পাথর খণ্ড হত না। সেটা তাহলে একটা পাহাড় হয়ে যেত। মাপ মানুষেরও স্বভাবসূচক। মানুষ লম্বা হতে পারে, **অথবা** মাথায় নানা রকমের হতে পারে। তাদের ওজনেরও তারতম্য হতে পারে। এ সব সত্ত্বেও, তাদের উচ্চতার, ওজনের একটা বিশেষ সীমা আছে। ১৫ ফুট লম্বা কিংবা এক টন ওজনের একটা মানুষ কেউ দেখে নি। এইরূপ মাপ (এক টন) বিশেষ গুণের (মানুষ) পক্ষে অসঙ্গত। সমস্ত বস্তুর পক্ষে একই কথা প্রযোজ্য। তাদের প্রত্যেকেরই এক একটা নির্দিষ্ট

গুণ আছে এবং তার সঙ্গে কমবেশী সঙ্গতি রেখে একটি বিশেষ পরিমাণও আছে। সব জিনিষের মধ্যেই সমানুপাত আছে।

উপরের থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, **মাপ বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত দিকগুলির মধ্যে একটি ঐক্য বা আনুরূপ্য**। যেহেতু বস্তুমাত্রই মাপ, তা সর্বদাই এমন একটি গুণ যার অনুরূপ বিশেষ পরিমাণ আছে। এই অনুপাতের, এই মাপের বিলোপ হতে পারে না, কারণ, বিলোপ হলে বস্তুটিরও অস্তিত্ব লোপ পাবে। একটি বস্তুর গুণ খেয়াল-মত যে কোন পরিমাণের সঙ্গে ঐক্যসম্বন্ধে থাকতে পারে না, অপরপক্ষে তার পরিমাণও খেয়ালমত যে কোন গুণের সঙ্গে ঐক্যসম্বন্ধে থাকতে পারে না। পরিমাণ এবং গুণ সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে একটি বিশেষ অনুপাতে বর্তমান থাকে এবং সেই অনুপাত তাদের মাপ সীমার অন্তর্ভুক্ত।

উপরে যা বলা হল তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে, যথা, একটি বস্তুতে যদি পরিমাণগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তনের ফলে তার গুণগত তারতম্য ঘটে না **যতক্ষণ তা মাপের সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকে**। এই সীমার মধ্যে বস্তু যেন পরিমাণগত পরিবর্তন সম্পর্কে নির্বিকার। কিন্তু যে মুহূর্তে মাপ সীমা পার হয়ে যায়, পরিমাণগত পরিবর্তন বস্তুর গুণগত অবস্থাকে প্রভাবিত করতে থাকে। **পরিমাণ গুণে উত্তরণ ঘটায়।**

পরিমাণের গুণে উত্তরণ

পরিমাণগত পরিবর্তন ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে সঞ্চিত হতে থাকে; প্রথমে প্রথমে মনে হয়, পরিবর্তনের ফলে বস্তুর গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রভাবিত হচ্ছে না। কিন্তু এই আপাত অবস্থা, হেগেল ঠিকই বলেছিলেন, একটা "ছল" মাত্র। এমন একটা সময় আসে যখন এই ছল ধরা পড়ে যায় এবং পরিমাণগত পরিবর্তন সঞ্চয়ের ফলে বস্তুর গুণের পরিবর্তন ঘটে। এর দৃষ্টান্ত আগে বলা হয়েছে। রসায়নবিদেরা যখন নূতন পরিমাণের গঠন করে তার নূতন ধর্ম নূতন গুণ আবিষ্কার করতে পারলেন, তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারের জন্যে নির্ভর করেছিলেন পরিমাণের গুণে উত্তরণ সূত্রের উপর।

একথা মনে রাখা দরকার যে, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে শুধু গুণগত পরিবর্তন হয়, তাই নয়, অপর পক্ষেও, **গুণগত পরিবর্তন থেকেও পরিমাণগত পরিবর্তন হয়**। নতুন গুণের আবির্ভাব কোন বস্তুর বা প্রক্রিয়ার

মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে। অতএব তার মধ্যে বিকাশের নূতন সূত্রও প্রকট হয়। এই সব নবগুণসমন্বিত বস্তু তাদের নূতন সূত্রগুলির সঙ্গে পরিমাণগত নূতন অবচ্ছিন্নতাও লাভ করে। অতঃপর নূতন একটি মাপের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উদ্ভিদপ্রজননকারীরা হয়ত একটি নূতন ধরণের উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন। তা হল একটি নূতন গুণ। কিন্তু এই নূতন ধরণ থেকে ফসলের পরিমাণ অনেক বেশী হল, তার মানে, তার পরিমাণগত নূতন বিশেষত্বগুলি দেখা দিল। এক্ষেত্রে **নূতন গুণগত পরিবর্তন থেকে পরিমাণগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিমাণ গুণে উত্তরণ করে এবং, বিপরীতভাবে, গুণও পরিমাণে উত্তরণ করে।**

অতএব, পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ সূত্রের সারমর্ম, প্রথমে অলক্ষ্যে ও সামান্য মাত্রায় পরিমাণগত পরিবর্তন ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে, ক্রমে তা এমন একটি স্তরে পৌঁছোয় যখন তার থেকে আমূল গুণগত পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে আগেকার গুণ বিলুপ্ত হয় এবং একটি নূতন গুণের উদ্ভব হয়, এই নূতন গুণ থেকেই আবার নূতন পরিমাণগত পরিবর্তন সূচিত হয়।

উল্লম্ফন

কিন্তু কি প্রকারে পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ সংঘটিত হয়? আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন কি করে জল বা দুধ ফোটে, কিংবা ডিম ভাজা হয়। প্রথমে জলটা একটু গরম হয়। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে ৬০°, ৭০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তখনও জল জলই থাকে। তা তার গুণ হারায়নি। কিন্তু যখন তাপমাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ১০০° সেন্টিগ্রেডে তোলা হয়, জল হঠাৎ ফুটতে শুরু করে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। তার মধ্যে তখন গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ঠিক একই ধরণের পরিবর্তন ঘটে যখন ডিম ভাজা হয়। ডিমের সাদা অংশ ও কুসুমটা হঠাৎ জমে যায়।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কিভাবে পরিমাণ গুণে উত্তরণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াটি ধীর ও ক্রমিক এবং পরিমাণগত ও প্রারম্ভিক পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি যথেষ্ট সঞ্চিত হলে আকস্মিকভাবে ও দ্রুতগতিতে গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই আকস্মিক পরিবর্তনকে **উলম্ফন** বলা হয়।

লেনিন উল্লম্ফনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন **ক্রমিকতার নিরোধ বলে**। এর অন্তর্নিহিত অর্থ, একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণগত ক্রমিক বিকাশ নিরুদ্ধ হয় এবং নূতন গুণে উত্তরণের সময় উপস্থিত হয়, যে উত্তরণ ধীর বা ক্রমিক নয়। নূতন গুণে উত্তরণই উল্লম্ফন। সেই কারণেই লেনিন উল্লম্ফনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন এই বলে যে, তা **বিকাশধারার পূর্ণচ্ছেদরূপে পুরনো থেকে নূতন গুণে চূড়ান্ত গতি পরিবর্তন**।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতে সর্বদা উল্লম্ফন সহযোগে নূতন গুণের আবির্ভাব ঘটে। অজৈব থেকে জৈব প্রকৃতিতে উত্তরণও এইভাবে ঘটে। জীবজগতের সমস্ত অভিব্যক্তি, অর্থাৎ এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে প্রাণীর বিবর্তনও উল্লম্ফন সহযোগে ঘটে। মানুষের সমাজেও অনুরূপ পরিবর্তন হয়। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে দাসপ্রথায়, দাসপ্রথা থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ, তেমনি পুজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সংঘটিত হয় উল্লম্ফন বা ক্রমিকতার নিরোধ দ্বারা।

নিরবচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার ঐক্যের ভিত্তিতেই বিকাশের আসল প্রক্রিয়াটি কাজ করে। একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অবাধ প্রক্রিয়াটি নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তখন উলম্ফনের ফলে নূতন গুণের উদ্ভব হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, উল্লম্ফন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। তার অর্থ, আগে আগে পরিমাণগত পরিবর্তন যা হয়েছে সমগ্রভাবে তাই উলম্ফনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অতএব, স্বভাবতই এই ঘটনার পশ্চাতে কোন "অলৌকিক ব্যাপার" নেই।

পরিমাণগত পরিবর্তন কিভাবে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ করে, এই প্রশ্নের উত্তর তাহলে এই : তা করে উলম্ফন সহযোগে এবং কেবলমাত্র উল্লম্ফন দ্বারাই। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্রমাগত এই ধরণের দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে আসি। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, বিকাশক্রিয়া দুটি পর্যায়ের

বিবর্তনের অভিব্যক্তিক ও বৈপ্লবিক প্রচার

মধ্যে দিয়ে অনুসৃত হয়, দুই প্রকারে সংঘটিত হয় : ধীর, অকিঞ্চিৎকর, পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এবং দ্রুত, মৌলিক, গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। প্রথমটি সর্বদা হয় পুরনো গুণের গণ্ডীর মধ্যে। এই পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত বস্তুর বা ঘটনার কোন মৌলিক পরিবর্তন নেই। এই অর্থে তাদের বলা যেতে পারে অভিব্যক্তিক পরিবর্তন।

অভিব্যক্তি—সরল, ক্রমিক, ধীর বিকাশ যাতে সুস্পষ্ট উল্লম্ফন কিংবা নুতন গুণে অবস্থান্তর নেই।

অপরপক্ষে যে বিকাশ প্রক্রিয়ায় প্রাচীনের সঙ্গে সম্পর্ক মৌলিক-ভাবে ছিন্ন হয়, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক সম্বন্ধের, বৈজ্ঞানিক ধারণার, প্রযুক্তি ইত্যাদির গুণগত পরিবর্তন, তাকে বলা হয় বৈপ্লবিক বিকাশ।

অতএব অভিব্যক্তি বলতে যা বোঝায় দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা তা অস্বীকার করে না, আরও করে না এই কারণে যে, সাধারণভাবে বিকাশ বোঝাতে, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে ঘটনার পরিবর্তন বোঝাতে, "অভিব্যক্তি" প্রত্যয়টি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। এই অর্থেই প্রাণীর ও উদ্ভিদ প্রজাতির অভিব্যক্তির কথা বলা হয়। লেনিনও প্রায়ই এই অর্থে "অভিব্যক্তি" প্রত্যয়টির প্রয়োগ করেছেন, যেমন, "অর্থ নৈতিক অভিব্যক্তির" কথা যখন তিনি উল্লেখ করেন।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, "অভিব্যক্তি" প্রত্যয়টিকে তত্ত্বজ্ঞানীরা প্রায়ই বিকৃত করে থাকেন। লেনিনের কথায়, দ্বন্দ্বসমন্বয়-বিদ্যা "অভিব্যক্তির প্রচলিত ধারণাকে" ঘোরতরভাবে বিরোধিতা করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এই ধারণা পোষণ করেন যে, বিকাশ কেবলমাত্র অভিব্যক্তিক পন্থাতেই সংঘটিত হয় এবং এই বিকাশ ধারায় উল্লম্ফন বা ক্রমিকতার নিরোধ বলে কিছু নেই। তাঁরা বলেন যে, জগতে পরিবর্তন শুধুই পরিমাণগত। বিবর্তন শুধুই বর্ধন, তা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতিতে গুণগতভাবে নুতনও কিছু নেই। এই মত হচ্ছে তথাকথিত প্রাকৃত অভিব্যক্তি-বাদের, যেহেতু এই মত অভিব্যক্তিকে স্থূল, প্রাকৃত ও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে।

সমাজ জীবনের ব্যাখ্যায় এই প্রাকৃত অভিব্যক্তিক মত বিশেষ ব্যাপকতা অর্জন করেছিল। এই ক্ষেত্রে বোঝান হয় যে, পরিবর্তন হয় সরল গতিতে, ধীরে ধীরে, অভিব্যক্তিকভাবে, সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে তা স্পর্শমাত্রও করে না। পুঁজিতন্ত্র ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্যে সংস্কারবাদীরা, অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী সমাজ-বাদীরা ও লেবার পার্টির সদস্যেরা, এই তাত্ত্বিক ধারণাকে কাজে লাগায়। তারা শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে না; তার জায়গায় তারা আংশিক সংস্কার ও ছোটখাটো সুবিধা আদায়ের সংগ্রাম চালাতে চায় যাতে পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তিমূল ঠিক থাকে।

সংস্কারবাদকে লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বুর্জোয়ার ছলনা, কারণ, সংস্কারমূলক বিধান রচিত হবার পরও আসল ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতেই থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে এই কথার সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। বেলজিয়ান সমাজবাদীরা যেমন অনেক বছর ধরেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন; কিন্তু তাঁরা সমাজতন্ত্রেয় প্রবর্তন করেননি। তাঁরা যে সব সংস্কার সাধন করেছেন তা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে অটুটই রেখে দিয়েছে। অন্যান্য যে সব দেশে লেবার পার্টি বা দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, সর্বত্রই একই ব্যাপার ঘটছে।

এই সব সংস্কারবাদী ছলনা, যার স্বরূপ বহু আগেই ব্যক্ত হয়েছে, আধুনিক সংশোধনবাদীরা আবার প্রচলনের চেষ্টা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশোধন-বাদী গেট্স বলেন যে, একালে সংগ্রাম হতে পারে কেবল ছোটখাটো সংস্কারের জন্যে, পরিবর্তনের প্রকৃতি অভিব্যক্তিক হতে বাধ্য, এবং সমাজতন্ত্রে পৌছবার একমাত্র পথ "শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম"।

লেনিন সংশোধনবাদীদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেন, যেহেতু তারা, তাঁর ভাষায়, বিজ্ঞানের নামে দার্শনিক অপব্যাখ্যার জলায় গুঁড়ি মেরে যায়, তারা বৈপ্লবিক দ্বন্দ্বসমন্বয়-বিদ্যার জায়গায় "সহজ" ও "প্রশান্ত" অভিব্যক্তিকে বসায়।

অতএব, সংস্কারবাদীরা এক ধরণের তত্ত্বজ্ঞানী যারা সামাজিক বিবর্তনের একটিমাত্র দিক, তার পরিমাণগত, অভিব্যক্তিক দিকটিই দেখে।

নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতবাদও তত্ত্ববিদ্যাগত, কিন্তু তাদের কারণ আলাদা : তারা বিবর্তনের অভিব্যক্তিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করে। তার বদলে তারা কেবলমাত্র উল্লম্ফনকে স্বীকার করে, যে উল্লম্ফনের পশ্চাতে কোন আয়োজন নেই, শক্তির ক্রমিক সমাবেশ নেই। লেনিনের লেখায় আছে যে, সংস্কারবাদ এবং ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক নৈরাষ্ট্রবাদ, উভয়কেই বুর্জেয়া বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর[১] প্রত্যক্ষ ফল বলে গণ্য করা উচিত, কারণ তারা বিকাশ ক্রিয়ায় অভিব্যক্তি ও বিপ্লবের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নটির সমাধান এক দিক থেকে করে থাকে।

প্রশ্নটির এইসব পক্ষাপাতদুষ্ট তাত্ত্বিক ভঙ্গীর প্রতিপক্ষরূপে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ প্রথমেই ধরে নেয় যে, **বিবর্তন প্রক্রিয়ার বৈপ্লবিক ও অভিব্যক্তিক**

১। লেনিন **কলেক্টেড ওয়ার্ক্স** খণ্ড ১৬, পৃঃ ৩৪৯।

দিক দুটির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র আছে। এই সম্বন্ধটি এমন যে, একটি ছাড়া আরেকটি প্রক্রিয়া কল্পনাই করা যায় না; পরিমাণগত, অভিব্যক্তিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে গুণগত, বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভবই হয় না এবং গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে নূতন মাপ, নূতন স্তর হতে পারে না, অতএব বিকাশই সম্ভব হয় না।" লেনিন লিখেছিলেন, এই বিভিন্ন প্রবণতাগুলি বাস্তব জীবনের, বাস্তব ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, ঠিক যেমন জীবনের, প্রাকৃতিক বিকাশধারার অন্তর্ভুক্ত মন্থরগতি অভিব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে দ্রুত উল্লম্ফন বা নিরবচ্ছিন্নতার ছেদ।"[১]

বিকাশ ক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক পরিবর্তনের পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু তা পুরনো গুণের পরিবর্তন সাধন করে না। এই জন্য উল্লম্ফনের, বিপ্লবের একান্ত দরকার, যা পুরনো গুণের আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারিক জীবনে ধীর, শ্রমসাধ্য প্রস্তুতির সঙ্গে মৌলিক গুণগত অবস্থান্তর যুক্ত করা একান্ত দরকার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ক্রমে ক্রমে, দৈনন্দিন সংগঠনিক কাজের মধ্যে দিয়ে গুণগত পরিবর্তন-গুলির জন্যে আয়োজন করে যাওয়াও দরকার।

কিন্তু যখন পুরনো গুণের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, তখন পুরনোর জায়গায় নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অত্যন্ত শক্তি-শালী বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের দরকার হয়। অধিকন্তু উল্লম্ফনের সঠিক মুহূর্তটি নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সেটি পরিকল্পিত কর্তব্যের বৈপ্লবিক সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল মুহূর্ত হয়। বৈপ্লবিক কার্যের মুহূর্তটি নির্ণয় করতে পারা মহৎ শিল্পবোধের পরিচায়ক। অক্টোবর বিপ্লব, সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পায়ন, তার কৃষির যৌথকরণ, যুদ্ধ পরবর্তীকালে তার অর্থনীতির পুনর্বাসন ও ক্রমোন্নতি, কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের জন্য লড়াই, সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাত্মকভাবে সাম্যবাদ গঠনের কাজ আরম্ভ করার জন্য পার্টি কর্তৃক নির্ধারিত সময়—সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি যে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ভার গ্রহণ করেছে, এই কয়টি তারই অসম্পূর্ণ তালিকা। এর প্রত্যেকটিই কমিউনিষ্ট পার্টি সঠিক মুহূর্তেই সম্পন্ন করেছে এবং তার জন্যে

১। লেনিন কলেক্টেড ওয়ার্কস খণ্ড ১৬, পৃঃ ৩৪৯।

তাদের প্রত্যেকটির পূর্বে সযত্ন প্রস্তুতিপর্বও গিয়েছে। সোভিয়েট জনসাধারণের সাফল্য অর্জনের নিশ্চয়তা এরই মধ্যে ছিল।

আমরা আগেই বলেছি, গুণ থেকে গুণান্তর উল্লম্ফনের ফলে হয়। এখন দেখা যাক উল্লম্ফন কত প্রকারের এবং তা কিসের উপর নির্ভর করে।

উল্লম্ফন অনেক প্রকারের। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উল্লম্ফন

যেসব দৃষ্টান্ত আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উল্লম্ফন অনেক প্রকারের। বানর থেকে মানুষে রূপান্তর নিশ্চয় একটি উল্লম্ফন। কিন্তু তা ঘটতে হাজার হাজার বছর লেগেছে। ফুটন্ত জলে আরেক রকমের উল্লম্ফন দেখা যায়। আগের দৃষ্টান্ত থেকে এটির পার্থক্য, এটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটে, অথচ আগেরটিতে মৌলিক পরিবর্তন প্রকট হতে তুলনায় অনেক দীর্ঘকাল লেগেছে।

উল্লম্ফনের প্রকার নির্ণয়ে সময় কারণটি একটি বড় অংশ গ্রহণ করে। যেমন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব বুর্জোয়া ক্ষমতার অবসান ঘটায় মাত্র কয়েকটি দিনের মধ্যে। বুর্জোয়া একনায়কত্বের উপর তা চরম আঘাত হানে। কিন্তু কৃষি যৌথকরণ, যা রুশ কৃষকদের সমাজতান্ত্রিকতায় বৈপ্লবিক রূপান্তর বলে পরিগণিত, ধাপে ধাপে, ক্রমিকভাবে, কয়েক বৎসর ধরে সম্পন্ন হয়েছে। এই তারতম্যের মূলে আছে দুটি ঘটনার প্রকৃতিগত পার্থক্য, এবং যে পরিবেশের মধ্যে তারা সংঘটিত হয়েছে তার প্রভেদ। এই কারণেই, নূতন গুণান্তরে উত্তরণের প্রকারে বা উল্লম্ফনের প্রকারে প্রভেদ।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটতে প্রায় বিশ বৎসর লেগেছে। লেনিন এই কালকে "**বৃহৎ উল্লম্ফনের**" যুগ বলে অভিহিত করেন। তিনি তাদের বিদ্রূপ করেন, যারা মনে করে, যেহেতু পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ উল্লম্ফন, তা তৎক্ষণাৎ ঘটে যাবে। প্রায়শই নূতন গুণান্তরে উত্তরণ চোখের পলকে ঘটে না, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নেয়। তা সত্ত্বেও তা উল্লম্ফন। নব গুণান্তরে এই প্রকার ক্রমিক উত্তরণের ক্ষেত্রেও ক্রমিকতার নিরোধ হয় এবং সামাজিক জীবনে প্রগাঢ়তম বিকাশের কাল দেখা দেয়। অতএব যে উল্লম্ফন প্রগাঢ়রূপে, দ্রুতগতিতে দেখা দেয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বস্তুর গুণগত অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, তার প্রতিপক্ষরূপে এমন উল্লম্ফনও আছে যা বস্তু বা গুণকে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত করে না।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, একটি গুণ থেকে গুণান্তরে উত্তরণের বিভিন্ন প্রকার অর্থাৎ **বিভিন্ন প্রকারের উল্লম্ফন বিবর্তমান ঘটনার প্রকৃতি এবং যে অবস্থার মধ্যে তার বিকাশ হচ্ছে এই উভয়ের উপর নির্ভর করে।** সামাজিক জীবনের দৃষ্টান্তে এর প্রকৃষ্টতা বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। সমাজ যেখানে বৈরভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত, পারস্পরিক শক্তির সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে উল্লম্ফন দেখা দেয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ-ধারায়, যেখানে বৈরভাবাপন্ন বিরুদ্ধ শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই, **উল্লম্ফন বা পূর্ণ গতি পরিবর্তন** তখনই ঘটে যখন প্রাচীনের উপাদানগুলি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নূতন গুণের উপাদান বর্ধিত হয়। এই ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন শুরু হয় নূতন নূতন গুণের সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে।

সোভিয়েট সমাজের সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তা অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের ইতিহাস। পূর্বে জারের আমলে যে রাশিয়া অর্থনীতি ক্ষেত্রে একটি পশ্চাদপদ দেশ বলে গণ্য ছিল, সেই রাশিয়া এখন শিল্পায়নে উন্নত ও মহাশক্তিশালী একটি দেশে, সমাজতন্ত্রের একটি অভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে। এবং এই উল্লম্ফন সাধিত হয়েছে ক্রমিক ভাবে, কোন সামাজিক আলোড়নের মধ্যে দিয়ে তা হয়নি। এর থেকে ধীরগতি পরিমাণগত পরিবর্তনের সঙ্গে মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের ঐক্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

সমাজতন্ত্রের অন্যতম বিরাট কীর্তি সোভিয়েট ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের দরুণ সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি বিদ্যায় জগতের অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করেছে। এটাও উল্লম্ফন, কিন্তু এও ক্রমিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে নিরক্ষরতা দূর করা হল, তারপর সোভিয়েটের গুণী মনীষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ শুরু হল এবং বিজ্ঞান চর্চার উন্নতির জন্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হল, এইভাবে একটার পর একটা কাজ এগিয়ে চলল। এই উল্লম্ফন পর্ব এখনও চলেছে। যে সব দেশে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও এই ধরনের উল্লম্ফন ক্রিয়া চলেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রবর্তনের কালও সামাজিক বিকাশ-ধারায় একটি উল্লম্ফন। এর সঙ্গে জড়িত সমগ্র সমাজকে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিয় জীবনের ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গুণগতভাবে

নূতন স্তরে উন্নয়ন করা। এই উল্লম্ফনও তৎক্ষণিক নয়। সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদে রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে, ধীরে ধীরে চলতে থাকে। শ্রম সম্পর্কে নূতন সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম অঙ্কুর, মানুষে মানুষে নূতন সম্বন্ধের প্রথম সঙ্কেত দৈনন্দিন জীবনেই জাগে ও বিকাশলাভ করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির নূতন কর্মসূচীতে যে কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে, তা সম্পন্ন হলে সমাজ এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে, যেখানে সাম্যবাদের যে লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে তা চূড়ান্ত প্রাধান্য লাভ করবে। এটি হবে একটি নব গুণাত্মক পর্ব, যেখানে সাম্যবাদী সমাজ প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্থিত হবে। এটি যথার্থভাবেই উল্লম্ফন যদিও তা সংঘটিত হতে পুরো বিশ বৎসর সময় লাগে। অতএব, সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশের দ্বন্দ্বসমন্বয় তত্ত্বে ক্রমিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে উল্লম্ফন ও বিচ্ছেদ ধারায় বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

সমাজতন্ত্রে বিকাশ ধারার মধ্যে দিয়ে এবং সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদে ক্রমিক পরিণতির মধ্যে দিয়ে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনগুলি দ্বন্দ্বসমন্বয়ী এক ঐক্য বন্ধনে গ্রথিত হয়ে যায়। সেই কারণেই এই সময়ে সংস্কারের তাৎপর্য একেবারে ভিন্নরকম।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট সরকার যে সব সংস্কার সাধিত করেছে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য আছে: তারা আর পরিমাণগত, প্রারম্ভিক প্রস্তুতি নয়, তারা সমাজ জীবনের বিকাশে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ নবগুণাত্মক উপাদান সরাসরি প্রবর্তিত করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, স্কুল ও উৎপাদনের মধ্যে যোগসূত্র জোরদার করার জন্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষার আরও উন্নতি বিধানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট থেকে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা সাধারণ "শিক্ষা" সংস্কার পর্যায়ভুক্ত নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নতি বিধান মূলত কর্মী ও উৎপাদন প্রয়াসের পরিচালক তৈরী করার প্রশ্নের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নটি জড়িত। এই কাজ বৈপ্লবিক কাজ, এই কাজের মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক কর্তব্যের সমাধান হবে। অতএব, **সংস্কারগুলির মধ্যেই নূতন এক বৈপ্লবিক উপাদান আছে।**

যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তা এই, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ সূত্র নূতন গুণগঠনের অন্তর্নিহিত কৌশলটি অর্থাৎ বিকাশপদ্ধতির মূল ভিত্তিটি প্রকট করে। কিন্তু তার চালক শক্তি, তার উৎস কী? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে দ্বন্দ্বসমন্বয় বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে—দুই বিপরীতের ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্রে।

ষষ্ঠ কথা

দুই বিপরীতের ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্র

কোন না কোন সময়ে আপনাদের সবাইকেই হয়ত এমন কোন উক্তির প্রতিবাদ করতে হয়েছে, যা আপনাদের কাছে বেঠিক বলে মনে হয়েছে। "আপনি নিজের কথার বিরোধিতা করছেন," এই কথা আপনি নিশ্চয় বলবেন, যদি আপনার বন্ধুর যুক্তিতে বিরোধিতা আবিষ্কার করেন। তার মানে, আপনি আপনার বন্ধুর অসঙ্গতিটা ধরে ফেলেন।

গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য বিরোধ

আমাদের চিন্তা কেবল তখনই নির্ভুল যখন তা বিরোধমুক্ত। আমি যদি দর্শনের একদল ছাত্র সম্পর্কে বলি : "ওরা পরীক্ষায় সবাই বেশ ভালো করেছে", এবং পরক্ষণেই সেই দলটি সম্পর্কে মন্তব্য করি "ওদের মধ্যে কেউ কেউ খারাপ করেছে", তাহলে আমার উক্তির প্রতিবাদ করে সঙ্গতভাবে আপনি বলতে পারেন : "আপনি একই লোক সম্পর্কে একই কালে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উক্তি কি করে করছেন? কেবল একটি উক্তিই ঠিক হতে পারে।" আপনি যদি তা বলেন, ঠিকই বলবেন।

এই বিরোধগুলিকে বলা হয় **রূপগত নৈয়ায়িক** বিরোধ। বিশুদ্ধ চিন্তার বিজ্ঞান—রূপগত ন্যায়শাস্ত্র—এই বিরোধগুলি প্রকট করে। যে সব চিন্তায় বা উক্তিতে বিরোধিতা থাকে, তা অসঙ্গত, অশুদ্ধ।

ন্যায়সঙ্গতভাবে কোথাও কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়, এই যুক্তির ভিত্তিতে আমরা কি বলতে পারি যে, সমাজ বা প্রকৃতিতে কোন প্রকারের বিরোধ থাকতে পারে না? এই প্রশ্ননিহিত বিষয়টি যাতে আরও বিশদভাবে বোঝা যায়, চলুন, দর্শনের ক্লাশে গিয়ে দেখে আসি, অধ্যাপক মহাশয় যখন রূপগত নৈয়ায়িক বিরোধের অগ্রাহ্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন কি ঘটেছিল।

শিক্ষক প্রশ্ন করলেন "ঘটনা ও বিষয়াবলীর মধ্যে বিরোধী দিক বা প্রবণতা বলতে কিছু আছে কি?"

ছাত্রদের মধ্যে একজন জবাবে বলল, "অবশ্যই নেই। আপনি তো এই মাত্র বললেন বিরোধ বলে কিছু থাকতে পারে না।"

"তাই যদি, তাহলে একটা দৃষ্টান্তের কথা মনে কর। মনে কর, কি করে পরমাণু গঠিত হয়। তাতে পজিটিভ-আহিত সূক্ষ্ম কণাও যেমন আছে, নেগেটিভ-আহিত সূক্ষ্ম কণাও আছে। তাহলে আমি পরমাণু সম্পর্কে যে উক্তি করছি তা বিরোধবাচক; তা একইকালে পজিটিভ বা পরাও বটে এবং নেগেটিভ বা অপরাও বটে। এবং এই তথ্য বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণসিদ্ধ।"

আপনারাও বলতে পারেন: এইমাত্র আপনি রূপগত-নৈয়ায়িক বিরোধের সম্ভাব্যতা পর্যন্ত অস্বীকার করলেন, অথচ আবার এখনই আপনি বিরোধ সম্পর্কে বলছেন, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণসিদ্ধ। কি করে তা হয়? প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল এবং এক কথায় তার মীমাংসা সম্ভব নয়। ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বিরোধের প্রশ্নটি বহুকাল থেকে চিন্তানায়কদের ভাবনার কারণ হয়ে এসেছে। যেমন, তত্ত্বজ্ঞানীরা রূপগত-নৈয়ায়িক বিরোধ অবিহিত ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রকৃতিতে কোন বিরোধিতা, বিপরীত গুণ, দশা বা সংজ্ঞার অস্তিত্ব অনুচিত। বহুপূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক জেনো প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, বিরোধমাত্রই, যেখানেই তার সন্ধান পাওয়া যাক, অসত্য, অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

কোন কোন আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী একই রকম। যথা, প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিণ দার্শনিক সিডনি হুক বলেন "বিরোধিতা যদি থাকে, তা বচনে কিংবা বিচারে কিংবা উক্তিতে, বস্তুতে বা ঘটনায় তা নেই।"[১]

কিন্তু পরমাণুর উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, বস্তুর মধ্যেই, প্রকৃতিতে, বিরোধের, বিপরীত দশার অস্তিত্ব আছে। মানব বা জীব দেহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন তার ভিতরে যুগপৎ দুইটি বিরোধী প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে;

১ সিডনি হুক, **ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্ এণ্ড সাইনটিফিক মেথড** পৃ ৭

ভিতরকার সেলগুলি একইকালে জন্মাচ্ছে ও মরছে। এই দুটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটি যদি বন্ধ হয়ে যায়, জীবদেহ তাহলে লয় পায়। প্রতি পদক্ষেপে এইরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। এই বিষয় নিয়ে আরও বিশদভাবে বলার অনেক সুযোগ পরে আমরা পাব। প্রকৃতির নিজের মধ্যে প্রচুর বিরোধ রয়েছে এবং তা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

কিন্তু বিরোধ থাকে কেন এবং থাকতে বাধ্যই বা কেন? এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বিশ্লেষণ করা দরকার, বিপরীত আখ্যায় আমরা কি বুঝি, এবং দেখা দরকার, দুই বিপরীত কখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমাদের নিত্যকার সাধারণ কথাবার্তার কথা ধরা যাক। "বিপরীত" কথাটি কি অর্থে আমরা ব্যবহার করি প্রত্যেকেই জানেন।

বিপরীত এবং বিরোধ

পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বিপরীত, তেমনই রাস্তার ডান দিক ও বাঁ দিক, এইরকম আরও বলা যেতে পারে। কোন এক ধরণের পদার্থসমূহের মিলের ও গরমিলের দিকগুলি মিলিয়ে ও তুলনা করে যখন দেখি, তাদের ধর্ম-গুলির বৈসাদৃশ্য এমন ধারা যে, আমরা একটিকে আরেকটির প্রতিবলরূপে দাঁড় করাতে পারি, আমরা এইরকম ক্ষেত্রে বলে থাকি, এই বিষয় বা ঘটনাগুলি বিপরীত: যথা, একজন ভালো লোক এবং একজন খারাপ লোক। আমরা কেন এই ব্যাপার বা ঘটনাবলীর একটিকে আরেকটির প্রতিবলরূপে দাঁড় করাই? কারণ একটি আরেকটিকে নিরাকরণ করে। ভালো যেন খারাপ থেকে, উত্তর দক্ষিণ থেকে, বাঁ ডান থেকে বিচ্যুত বা নিরাকৃত হয়। তাহলে **বিপরীত** বলতে আমরা বুঝি **এমন ঘটনাবলী বা ঘটনাবলীর এমন দশা যার একটি আরেকটিকে নিরাকরণ করে।**

অবশ্য, যদি দেখা যেত খারাপ ভালো থেকে এত দূরে অবস্থিত যে তাদের মধ্যে কোনই মিল নেই, তাহলে এই বিপরীতগুলির মধ্যে কোন প্রকার সংঘর্ষ, বৈর প্রতিরোধ, দ্বন্দ্ব বা গরমিল কখনই হত না। এক কথায় তাদের মধ্যে কখনো কোন বিরোধ হত না। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের ও মনো-ভাবের লোকেদের মধ্যে বিরোধ কখন জাগে? যখন তারা মিলিত হয় এবং কোনভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তা না হলে তারা কখনো পরস্পরে বাদপ্রতিবাদ করতে পারত না।

আমাদের এখানে একটি ব্যাপারের উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা

দরকার। এইটি আমাদের আগে ভালো করে বুঝে নিতে হবে, নইলে পরবর্তী যুক্তিগুলি অনুধাবন করা কষ্টকর হবে। হয়ত ধারণা হতে পারে, দুই বিপরীত যদি পরস্পরকে নিরাকরণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে মিল বলতে কিছুই থাকে না। লোকে অনেক সময় এইভাবে তর্ক করে : সাদা কালো নয়, দক্ষিণ উত্তর নয়, ঠাণ্ডা গরম নয়। এইটেই স্বাভাবিক মনোভাব। আপাতদৃষ্টে এইটেই নজরে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি বিষয়টি আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে, জীবনে, জগতে যে বিপরীত থাকে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই। তাদের বুঝতে হলে একমাত্র পারস্পরিক যোগেই বোঝা যায়।

আমরা আগেই দেখেছি যে পরা ও অপরা, পজিটিভ-আহিত সূক্ষ্মকণা এবং নেগেটিভ-আহিত সূক্ষ্মকণা একটি পরমাণুর মধ্যে বিদ্যমান। বলবিদ্যায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যুগপৎ বিদ্যমান : একটি নৌকোয় ধাক্কা দিয়ে আপনি যতটা বল প্রয়োগ করেন, নৌকোও আপনার উপর ঠিক ততটা বল প্রয়োগ করে। প্রতিক্রিয়াহীন ক্রিয়া নেই। রসায়নেও পরমাণুর সংযুতি ও বিযঙ্গের মত বিপরীতগুলি অবিচ্ছেদ্য।

পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিপরীতগুলির মধ্যে কোন না কোন ধরণের **সম্বন্ধ** সর্বদা থাকে। সেই কারণেই তাদের মধ্যে "দ্বন্দ্ব" "সংঘাত" "মতদ্বৈধতা"। **যেখানেই বিপরীতগুলি সংঘাতে লিপ্ত, যেখানেই তাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে বিরোধ নিয়ত দেখা দেবেই**, যেহেতু বিপরীত প্রবণতা, ভঙ্গি ও শক্তিগুলি সংঘাতে লিপ্ত হয়। অতএব, **বিরোধের সংজ্ঞা এই বলে নির্দেশ করা যায় যে, তা দুই বিপরীতের পারস্পারিক সম্বন্ধ। বিরোধের দশারূপে বিপরীত দেখা দেয়।**

যদি পদার্থের ও ঘটনাবলীর পরিবর্তন না হত, যদি তারা চিরকাল একইভাবে থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে বিপরীত বলে, পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক দশা বা প্রবণতা বলে, কিছুই থাকত না। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, তারা নিত্যকাল ধরে পরিণামী, বিকাশমান ও গতিশীল। এইজন্যে পদার্থের মধ্যে থেকে সর্বদা বিভিন্ন দশার প্রকট হয়, তাদের মধ্যে কিছু কালক্রমে জীর্ণ হয়ে স্থবির হয়ে যায়, কিছু নূতন ভাবে আবার জন্মগ্রহণ করে বিকাশ লাভ

করে। এক কথায়, **বিকাশমান প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা বিপরীত দশা, প্রবণতা ও শক্তি, অতএব বিরোধ, প্রকাশ পায়।**

বিপরীতগুলি কোন সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ?

আমরা দেখেছি বিপরীতগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে। এই যোগ এত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য যে তারা এই যোগ ব্যতিরেকে থাকতেই পারে না। আমরা এই যোগকে বলে থাকি **দুই বিপরীতের ঐক্য।** দুই বিপরীতের ঐক্য তত্ত্বজ্ঞানীরা এই ঐক্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে প্রতিটি বিপরীত সত্তা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তা থাকে না। একটা কারখানায় কিভাবে কাজ চলে, ভেবে দেখুন।

প্রতিটি কারখানায় তথাকথিত **ব্যয়ের** দিক, দ্রব্য ও অর্থ বিনিয়োগের দিক আছে। সেই সঙ্গে আবার তথাকথিত **আয়ের** দিক, দ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্তির দিকও আছে। কারখানাটি কি উপার্জন না করে শুধুই অর্থ ব্যয় করে যেতে পারে? অবশ্যই না। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় না করে কারখানা কাজ চালিয়ে যেতে পারে না। আপনি আয় এবং ব্যয়, এই দুই বিপরীতকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র করতে পারবেন না। তাদের মধ্যে ঐক্য ছাড়া কারখানার কাজ চালান কল্পনাতীত।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আগেই বলা হয়েছে, মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জীবনে দুইটি বিপরীত প্রক্রিয়া চলে; কিছু সেল জন্ম লাভ করে, কিছু ধ্বংস হয় বা মরে যায়। কিন্তু কল্পনা করুন, কেউ প্রস্তাব করল, দীর্ঘায়ু লাভ করার জন্যে সেলের মৃত্যু বা ধ্বংস (অনাত্তীকরণ) রোধ করা দরকার, যাতে নূতন সেল সৃষ্টি ও তাদের নব জন্মলাভ (আত্তীকরণ) অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহলে সেলগুলি কেবল জন্মিয়েই যাবে। এই রকম যুক্তির মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি থেকে যায়। আসল কথা হচ্ছে, দুইটি বিপরীত প্রক্রিয়া নিয়েই জীবন, তাদের একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। বিপরীত সত্তার একটিকে ধ্বংস করতে গেলে, আরেকটিও ধ্বংস হয়ে যাবে, তার মানে, জীবনই ধ্বংস হবে। জীবনপ্রক্রিয়া একই সঙ্গে অভেদাত্মক ও বিরোধী।

একালের দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা তত্ত্ববিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন, পুঁজিতন্ত্রের "ভালো" দিকও আছে, "খারাপ" দিকও আছে। যাকিছু "খারাপ" তার থেকে সমাজকে মুক্ত করার

জন্যে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, শুধু "ভালো" দিকটার বিকাশ সাধন করা হোক এবং "খারাপ"টাকে বর্জন করা হোক, তার ফলে, তাঁদের মতে, "জনকল্যাণ সমাজ" গড়ে উঠবে। এই যুক্তি সেই রকম, যা মানবদেহের পুরনো সেলগুলির ধ্বংস রোধ করে নূতন সেলের জন্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। যেমন জীবদেহে তা সম্ভব নয়, তেমনি বুর্জোয়া সমাজেও তা ঘটান সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে বিপরীত সত্তাগুলি পাশাপাশি নেই, তারা একীভূত। তারা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, বুর্জোয়া সমাজ তাদের উভয়কে নিয়ে গঠিত। সেইজন্য একটি দিক বাদ দিয়ে আরেকটিকে রক্ষা করা অসম্ভব। পুঁজিতন্ত্রের ক্রটিগুলিকে, তার "খারাপ" দিকটিকে দূর করতে হলে, পুঁজিতন্ত্রকেই দূর করা দরকার। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিপরীতগুলির ঐক্য বলতে তাহলে বোঝায় তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ এবং একীভূতভাবে একটি একক বিরোধাত্মক প্রক্রিয়ার গঠন। বিপরীত সত্তাগুলি পারস্পরিক অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ, এক থাকে যেহেতু অপরটি আছে।

বিপরীত সত্তাগুলির **অভেদত্ব** অর্থেও তাদের ঐক্যকে বোঝা দরকার। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, যথোপযুক্ত অবস্থায় বিপরীত সত্তাগুলির পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যা সিক্ত তাই শুষ্ক হয়ে যায়; যা শুষ্ক তাই সিক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বিপরীতগুলি স্থান পরিবর্তন করে, কারণ অনুরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। একটি তপ্ত পদার্থ তার প্রতিবেশে তাপ বিকীরণ করার পর শীতল হয়ে যায়। এই প্রকার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বিপরীতের পারস্পরিক রূপান্তর তত্ত্বের উপর লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, "**দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা**" থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তাই থেকে আমরা জানতে পারি, কোন অবস্থায় বিপরীতের অস্তিত্ব সম্ভব, কি ভাবে তাদের মধ্যে **অভেদত্ব** দেখা দেয় (কি ভাবে তারা অভেদ হয়) —কোন অবস্থায় তারা অভেদ হয়ে এক আরেকে রূপান্তরিত হয়।"[১]

বিপরীত সত্তাগুলি বিশ্লেষণ করে লেনিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, তারা আপেক্ষিক, অস্থায়ী ও ক্ষণিক। এর অর্থ, বিপরীত সত্তাগুলি যে অবস্থায়

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস** খণ্ড ৩৮, পৃঃ ১০৯

প্রকট হয় তার উল্লেখ ছাড়া বিপরীতের ঐক্যের কথা বলা যায় না। অবস্থার বদল হলে, ঐক্যও আর থাকে না।

ঐক্য যে আপেক্ষিক তার আরও প্রমাণ এই যে, বিপরীত সত্তাগুলি কখনও সম্পূর্ণ সমনুপাত হয় না। বাস্তবিক, অনাত্তীকবণ ও আত্তীকরণ সম্পূর্ণ সমনুপাত কি কবে হবে? কারণ তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া। তাবা অভেদ হয়ে পরস্পরের স্থান গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা করে না, অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে করে না, করে আপেক্ষিকভাবে।

আমরা এর আগে সংক্ষেপে বলেছিলাম যে, বিপরীত সত্তাগুলি সংঘাতে, পারস্পরিক দ্বন্দ্বে, লিপ্ত হয়। এই বিষযটি আবও বিশদভাবে পরীক্ষা কবে দেখা যাক।

বিপরীত প্রবণতাগুলির মধ্যে সংঘাতকে বলা হয তাদেব পাবস্পরিক সংঘর্ষ। যেহেতু প্রতিটি পদার্থের, প্রতিটি প্রক্রিযাব মধ্যে এই প্রকাব বিপরীত দিক আছে, তাদেব মধ্যে যে নিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষ চলে, তা বোঝা সহজ। কিন্তু কোন কারণে তা হয?

বিপরীতের সংঘর্ষ

বিপরীত প্রবণতাগুলিব মধ্যে সংঘর্ষ বাধে তার কারণ তারা যুগপৎ যেমন এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ তেমনি তাবা পবস্পবকে নিবাকবণ বা অস্বীকার কবে। এই অবস্থায, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও সংঘাত অনিবার্য। ফলতঃ, যেখানেই বিপবীত সত্তা ঐক্যযোগে বিধৃত, সেখানে তাদের মধ্যে সংঘর্ষও থাকবে। **বিপরীতের সংঘর্ষ বলতে বোঝা উচিত কোন একটি প্রক্রিয়ায় বা ঘটনায় প্রাধান্য লাভের জন্য বিপরীত সত্তাগুলির প্রতিটির স্বতন্ত্র "প্রয়াস"**।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, বস্তুজগতে বিপরীতেব সংঘর্ষ ও ঐক্য বাস্তবিকই আছে। বিকাশধারায এব মধ্যে কোনটি চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে? হেগেলের মতে বিকাশব্যাপাবে বিপরীতেব ঐক্য, অভেদত্বই প্রধান। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা হেগেলেব এই তত্ত্ব ব্যবহার করে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন যে, বুর্জোয়া সমাজে বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ সহজেই মিটে যেতে পারে এবং সামাজিক সঙ্গতির সম্ভাবনা আছে।

বাস্তবক্ষেত্রে বিপরীতের ঐক্য নয়, সংঘর্ষই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সংঘর্ষ মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত হয় না এবং বিপরীতের পারস্পরিক সম্বন্ধে এই

সংঘর্ষই প্রধান লক্ষণ। যেহেতু বিপরীত সত্তাগুলি পরস্পরকে নিরাকরণ করে, পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব। ফলতঃ বিপরীত প্রবণতাগুলির ঐক্য, অভেদত্ব যেকালে আপেক্ষিক, অস্থায়ী ও ক্ষণিক, সেইকালে, লেনিনের কথামত,তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ "অনাপেক্ষিক,যেমন বিকাশ ও গতিক্রিয়া অনাপেক্ষিক।১ এর অর্থ বিপরীতের সংঘর্ষ বিকাশের, গতিক্রিয়ার উৎস।

বিপরীতের সংঘর্ষ বিকাশের উৎস

বিকাশের উৎস, তার চালকশক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দার্শনিকদের চিরকাল কৌতূহল জাগিয়ে এসেছে। শুধু দার্শনিকেরাই নয়, যে কেউ এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেন যে, এই বিশ্বজগতে তথা এর প্রতিটি ঘটনায় ও প্রক্রিযায কিসেব থেকে গতির সঞ্চার হল, এই জিজ্ঞাসা তাঁকেও ভাবিত করে। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃতির বিকাশক্রিযার উৎস প্রকৃতির বাইরে—ঈশ্বরে, অধ্যাত্ম-শক্তিতে—সন্ধান করতে হবে। প্রকৃতিব বিকাশধারায প্রকৃত উৎসের হদিশ দিতে অক্ষম হযে তাঁরা ধর্মের আশ্রয গ্রহণ করেন।

কিন্তু প্রকৃতি বিকাশলাভ কবে কেন, এই প্রশ্নের ব্যাখ্যার জন্যে অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর করার কোন দরকার হয না। বিপরীতের সংঘর্ষেব মধ্যেই উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। লেনিন লিখেছিলেন, "বিপরীতের 'সংঘর্ষ'ই বিকাশ"।২

এই ব্যাপারটি বোঝার জন্য কযেকটি উদাহরণ নিযে দেখা যাক।

আমরা দেখেছি, পরিমাণগত পরিবর্তনের ক্রমিক সমাবেশের ফলে একটি নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি কিসের থেকে চালিত হয়? যেমন, যখন জল গরম করা হয, জলেব অনুগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। অনুগুলির আকর্ষণ শক্তি যার দরুণ জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে, ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে। স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছলে অনুগুলির আকর্ষণ শক্তি এতই দুর্বল হয়ে যায় যে, তা আর অনুগুলিকে একত্র ধরে রাখতে পারে না এবং তারই ফলে জল ফুটতে থাকে। এই সব ব্যাপারটা ঘটে দুটি বিপরীত প্রবণতার সংঘর্ষের ফলে: একদিকে অনুগুলির আকর্ষণ শক্তি অন্যদিকে,সেইগুলিকে বিকর্ষণ

---

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ৩৬০

২ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস** খণ্ড ৩৮, পৃঃ ৩৬০

কয়ের শক্তিসমূহ,যার ফলে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এই দুটি প্রবণতার মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে,যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যেকার বিরোধের বিশ্লেষণের সময় আসে: একটি উল্লম্ফন বিপরীতের ঐক্যে ছেদ টেনে দেয়। একটি নতুন গুণান্বিক অবস্থা তার নতুন বিরোধ নিয়ে আবির্ভূ' হয়: জল বাষ্পে পরিণত হয়। এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, **বিরোধের বিশ্লেষণ থেকে নতুন গুণ, বিকাশ, গতিক্রিয়া ও পরিবর্ত-নের সূচনা হয়।**

প্রত্যেকটা বিরোধের, তার আবির্ভাব, বৃদ্ধি (বিবর্ধন) এবং বিশ্লেষণ নিয়ে, বলা যেতে পারে, নিজস্ব ইতিহাস আছে। শেষ পর্যায় তখনই আসে যখন বিরোধের ক্রমিক বৃদ্ধির দরুণ বিপরীত প্রবণতাগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর থাকতে পারে না এবং সংঘাতের বিশ্লেষণ ঘটে।

যখন বুর্জোয়া সমাজের ক্ষযকারক বিরোধগুলির পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে, সেই বিরোধগুলির বিশ্লেষণের সময় উপস্থিত হয়েছে। বিপরীত প্রবণতাগুলির সংঘর্ষের ফলে এবং বিরোধগুলির বিশ্লেষণের ফলে সমাজ একটি উচ্চতর স্তরে উত্থিত হয়: পুরনো বুর্জোয়া সমাজের জায়গায় আসে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ। তাহলে, দেখতে পাচ্ছেন, **বিপরীতের সংঘর্ষ এবং তাদের বিরোধগুলির বিশ্লেষণ সমাজ বিকাশের উৎস।**

অতএব, দুই বিপরীতের **ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্রের সারমর্ম এই** যে, **পদার্থ ও প্রক্রিয়া মাত্রই সহজাত বিরোধী দশার লক্ষণাক্রান্ত। বিরোধী দশাগুলি যুগপৎ অবিচ্ছেদ্য ঐক্যে আবদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত। বিপরীতের এই সংঘর্ষই বিকাশক্রিয়ার চালকশক্তি, আভ্যন্তরিক উৎস।** লেনিন এই সূত্রটি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এটি দ্বন্দ্বসমন্বয় বিদ্যার সারমর্ম, সারাৎসার।

পরিদৃশ্যমান জগতে বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য বিরোধ আছে। বাহ্যিক ও আন্তর বিরোধ তাদের মধ্যেই পড়ে।

গত চল্লিশ বছর ধরে যখনই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে কিংবা যখনই ঔপনিবেশিক জনগণ তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম করার জন্য জাগ্রত হয়েছে কিংবা যখনই মেহনতী মানুষ শক্তিশালী শান্তির

আন্তর ও বাহ্যিক বিরোধ

আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে এগিয়ে এসেছে, বুর্জোয়া প্রচারকেরা 'ক্রেমলিনের চক্রান্তে'র কথা বলে এসেছে।

মেহনতী জনসাধারণের অধিকারের লড়াইকে এইভাবে "ব্যাখ্যা" করা স্বভাবতই হাস্যকর। এই ব্যাখ্যা সামাজিক ঘটনার কারণকে,যে দেশে তা ঘটছে, সেই দেশের ভিতরে সন্ধান করে না, সন্ধান করে বাইরে অন্যত্র। বিপ্লবকে চালান দেওয়া যায় না। আন্তর শক্তি এবং সেই শক্তির কারণরূপ উৎস না থাকলে বিপ্লব ঘটতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীতে ঠিকই বলা হয়েছে, বিপ্লব ফরমাস মত তৈরি করা যায় না। পুঁজি-বাদের আন্তর ও আন্তর্জাতিক গভীর বিরোধের ফলেই তার উদ্ভব হয়। বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী অন্য মানুষকে নিজেদের 'সৌভাগ্যের' ভাগ দিতে পারে না, যদি দেয় তাহলে বিজিত আদর্শেরই ক্ষতিসাধন করা হয়। কমিউনিষ্টরা বরাবরই 'বিপ্লবকে চালান' দেওয়ার বিরোধী। একই সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতিবিপ্লব চালান করার প্রয়াসকে ঘোরতররূপে বাধা দেয়।

যে যে কারণের পরিণামফল পুঁজিবাদের বিলোপ, সেই কারণগুলি প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে সন্ধান করতে হবে, দেশে মুষ্টিমেয় এক-চেটিয়া পুঁজিবাদীদেব স্বার্থ সমগ্র জাতির স্বার্থের সঙ্গে অসামাধেয় বিরোধী-তায় সংক্ষুব্ধ।

আমরা এতক্ষণ যে বিরোধগুলির কথা বললাম, সেগুলি **আন্তর** বিরোধ, যেহেতু তারা ঘটনা বা প্রক্রিয়ার **ভিতর** থেকে জাগে। এর থেকে স্বতন্ত্র আরো এক প্রকারের বিরোধ আছে, তা **বহির্বিরোধ** বা **বাহ্যিক বিরোধ**। এই বিরোধ ঘটনা ও প্রক্রিয়ার পারস্পরিক বিরোধ। **আন্তর বিরোধই চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে।**

লেনিন দেখিয়ে গেছেন যে, **প্রকৃতির মধ্যেই তার বিকাশের উৎস নিহিত আছে**, ভাবলোকে, অধ্যাত্ম শক্তিতে কিংবা ঈশ্বরে তার সন্ধান করে লাভ নেই। প্রকৃতির গতি তার **স্বকৃত গতি**। তার বিকাশ **স্বকৃত বিকাশন** এবং তা সম্ভবপর হয় **আন্তর বিরোধগুলিকে পরাস্ত করে।**

এর দ্বারা কিন্তু বোঝায় না যে, দ্বন্দ্ব সমন্বয়বিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিরোধের তাৎপর্য অস্বীকার করে। প্রতিটী বস্তু, ঘটনা ও প্রক্রিয়া বহির্জগতের সঙ্গে অসংখ্য সূত্রে সম্বন্ধযুক্ত। অতএব, তাদের ভিতরে যা ঘটছে কেবলমাত্র

তারই নয়, তাদের সত্তার বাইরে যা ঘটছে তারও কিছুটা প্রভাব তাদের উপরে এসে পড়ে। এই ব্যাপারের একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জাপানী জঙ্গী-বাদীদের সঙ্গে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধ ছিল। তার পরিণতিতে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধল, এবং সেই যুদ্ধের ফলে চীনা জনগণের পক্ষে তাদের পীড়ন-কারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং গণবিপ্লবকে জয়মণ্ডিত করার সুবিধা হয়ে গেল। কিন্তু এক্ষেত্রেও চূড়ান্ত ভূমিকা ছিল আন্তর বিরোধের, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ পুঁজিবাদী এবং চীনা জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে বিরোধ।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, **আন্তর বিরোধ সেইগুলি যা বস্তুর সারসত্তার অন্তর্গত, এবং বাহ্যিক বিরোধ সেইগুলি যা বিভিন্ন বস্তুর ও প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কজাত।**

বিষয়ীভূত সদ্বস্তুতে আমরা প্রতি পদক্ষেপে বিরোধের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা এ কথাও বলেছি যে, আমাদের চিন্তা যেন সঙ্গত ও বিরোধবিহীন হয়। অতএব প্রশ্ন হতে পারে: আমাদের চিন্তায় বিষয়ীভূত বিরোধকে কিভাবে প্রতি-ফলিত করা উচিত।

জীবনে বিরোধ এবং চিন্তায় তার প্রতিফলন

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন আগে থেকেই লক্ষ্য করে আসছেন যে, আলোকেব কোন কোন ধর্ম তরঙ্গ সঞ্চার সূত্র মেনে চলে। অপর ধর্মগুলি কিন্তু কণিকার (করপাস্‌ল্) গতিক্রিয়া সূত্রগুলি মানে। এই ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই আলোকতত্ত্বের উদ্ভব হয়—তরঙ্গ তত্ত্ব ও কণিকা তত্ত্ব।

দীর্ঘকাল ধরে বৈজ্ঞানিকেরা বিতর্ক করেছেন; এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কোনটি আলোকের যথার্থ প্রকৃতির অনুরূপ, আলোকের সার স্বরূপ কী। তাঁরা এই বলে বিতর্ক করেন, হয় আলোক কণিকাপ্রবাহ, নয়ত, তরঙ্গগতি। আলোকের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী প্রকৃতি, তা যে একই যোগে তরঙ্গগতি এবং কণিকাপ্রবাহ হতে পারে, বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতেব আগে তা প্রমাণ করা যায় নি।

অতএব, যদি কোন ঘটনা বিরোধাত্মক হয়, তাহলে আমাদের চিন্তায় তার প্রতিফলন, সেই বিষয়ে আমাদের বিচার, বিরোধাত্মক হবেই।

তত্ত্বজ্ঞানীরা প্রায়শই বিপরীত প্রবণতাগুলিকে পৃথকভাবে, এককে অপর

থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সংশোধন-বাদীরা যেমন বলে থাকে, স্বাধীনতা এবং নিয়মানুবর্তিতা বিসদৃশ বিপরীত। হয়, স্বাধীনতাকে রাখতে হবে, তাহলে পার্টি'তে নিয়মানুবর্তিতা শিথিল হয়ে যায়। নয়ত, নিয়মানুবর্তিতাকে রাখতে হবে, সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে না, এবং সেই কারণে পার্টি'তে গণতন্ত্রও থাকে না। মার্কসবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়ী শিক্ষার উপর নির্ভর করে লেনিন কমিউনিষ্ট পার্টি' সংগঠনের প্রথম সূচনাতেই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন যে, নিয়মানুবর্তিতা গণতন্ত্রের স্বভাববিরুদ্ধ নয়, তা গণতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, অঙ্গাঙ্গীযোগে বিরাজ করে।

লেনিন নতুন ধরণের পার্টির অবিচল সাংগঠনিক নীতিগুলিকে বিশদরূপ দান করে 'ডিমক্রেটিক সেণ্ট্রালিজম্' বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রবদ্ধতার নীতি প্রণয়ন করেন। এইক্ষেত্রে উচ্চতম পর্য্যায থেকে নিম্নতম পর্য্যায়ে পার্টি সংস্থা-গুলি নির্বাচন অধিকার মারফৎ গণতন্ত্রকে ব্যপকভাবে কার্যে পরিণত করে। পুরোপুরি স্বাধীন অবস্থায পার্টির সদস্যরা গুপ্তভোট দিয়ে তাঁদের মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এইভাবে কমিউনিষ্টদের অভিপ্রায়ের প্রকাশ গণতান্ত্রিক উপায়েই প্রকট হয়। গণতন্ত্রের প্রভাব আরও এক ব্যাপারে প্রকট। উচ্চতর পার্টি সংস্থাগুলিকে তাদের কার্যকলাপের জন্য কমিউনিষ্টদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। কমিউনিষ্টরা তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করে এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করে। এই হচ্ছে একটি দিক।

কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া, সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার কাছে সংখ্যালঘুর নতি-স্বীকার ছাড়া, কেন্দ্রায়িত নেতৃত্ব ছাড়া দৃঢ় শক্তিশালী পার্টি অসম্ভব। লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রবদ্ধতা সূত্রের দ্বিতীয় দিক এই ব্যাপারে নিশ্চিত করে। কেন্দ্র অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্টির ও রাষ্ট্রের উচ্চতর সংস্থাগুলি, পার্টির ও রাষ্ট্রের সমগ্র কর্ম ও জীবন-ধারাকে চালিত করে; তাদের সিদ্ধান্ত অবশ্য পালনীয়। কারণ তা না হলে নিয়মানুবর্তিতাও থাকে না, কাজের বা ইচ্ছার ঐক্যও থাকে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীতে তাই বলা হয়েছে "ব্যাপকতম গণতন্ত্রের সঙ্গে একযোগে থাকা উচিত মেহনতী মানুষের নিয়ম পালনে বন্ধুতামূলক অথচ অবিচল নিষ্ঠা; গণতন্ত্রের এই নিয়মনিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য

উৎসাহ দান করা এবং উচ্চ পর্যায় থেকে ও নিম্ন পর্যায় থেকে তা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।"১

জীবনে যদি প্রায়শই বিরোধ থাকে, যদি বস্তুজগতকে সম্যক বোধগম্য করার জন্য তাদের সমন্বয় প্রয়োজন হয়, তাহলে বুঝতে হবে দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব ঘটনা বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে একদেশদর্শিতা গ্রাহ্য করে না। আমাদের কাজে বা বিচারে নমনীয়তা অপরিহার্য।

"সব দিক থেকে, সার্বিক নমনীয়ত, যে নমনীয়তা বিপরীতের মধ্যে অভেদকে আবিস্কার করে—তাই বস্তুর সারসত্ত ২ লেনিন এইকথা লিখেছিলেন।

প্রত্যয়ের নমনীয়তা সম্পর্কে লেনিন

এই ব্যাপারটি কি ভাবে বোঝা যাবে? যেমন, ধরা যাক, দুটি প্রত্যয় দৃঢ়সঙ্কল্পতা এবং কার্যকুশলতা। যদি কেউ তর্ক করে: 'সংকল্পে অটল থাকা উচিত, এক্ষেত্রে কার্য কৌশলের কোন সুযোগ নেই,' তবে বুঝতে হবে, সে অনমনীয় এবং ভুল ও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করছে। আসলে, যথার্থ নেতার মধ্যে দৃঢ়সঙ্কল্পতা ও কার্যকুশলতার এই দুয়েরই সমন্বয় থাকা দরকার।

দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব অবশ্য সবরকম প্রত্যয়ের নমনীয়তা অনুমোদন করে না। যে এই প্রত্যয়গুলি জ্ঞাতৃগতভাবে প্রয়োগ করে, তার মানে, জীবনে যা বাস্তবিকভাবে আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করে না, প্রয়োগ করে নিজস্ব কামনা বাসনা অনুযায়ী, সে গুরুতর ভুল করে। লেনিনের লেখায় আছে "নমনীয়তার জ্ঞাতৃগত প্রয়োগ 'একলেকৃটিসিজম বা সার সংগ্রহবাদ এবং 'সফিস্ট্রী' বা কূটন্যায়। নমনীযতার বিষয়মুখ প্রয়োগ, অর্থাৎ যে প্রয়োগে বাস্তব প্রক্রিয়ার সর্বদেশিকতা ও ঐক্য প্রতিফলিত হয়, তাই দ্বন্দ্বসমন্বযতত্ত্ব, তাই জগতের চিরন্তন বিকাশের অভ্রান্ত প্রতিফলন।"৩

লেনিন এখানে যে সারসংগ্রহবাদের কথা বলেছেন তার অর্থ কি? নানারূপ বিরোধী ও বিজাতীয় তত্ত্ব, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বেচ্ছানুরূপ সংযোগকে বলা হয় সারসংগ্রহবাদ। যেমন, যদি কোন দার্শনিক এই বলে শুরু করেন যে, "বস্তু থেকে অধ্যাত্মশক্তির উদ্ভব হয়" এবং কিছু পরে বলেন "অতএব,

১ দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৫২

২ লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্ক'স খণ্ড ৩৮, পৃঃ ১১০   ৩ ঐ পৃ ১১০

অধ্যাত্মশক্তি স্বাধীন," তাহলে তা হবে বিজাতীয় মতবাদের—ভাববাদী ও বস্তুবাদী মতবাদের—সারসংগ্রাহক মত।

দেখতে পাচ্ছেন, সারসংগ্রহবাদীও বিরোধী শক্তির সংযোগ সাধন করেন, কিন্তু তিনি তা করেন বস্তুজগতে যা আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নয়, তার বিরোধিতা করে। তার ফলে যা দাঁড়ায়, তা, লেনিনের কথামত, "সারসংগ্রহবাদী খিচুড়ি"। সারসংগ্রহবাদের দৃষ্টান্ত সমকালীন দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের ভাবাদর্শ। এই সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতি ও ভাবাদর্শের দিক থেকে বুর্জোয়াদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থল। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীতে বলা হয়েছে "তারা পুরনো সুবিধাবাদী ধারণাগুলির সঙ্গে 'সাম্প্রতিক' বুর্জোয়াতত্ত্বগুলির সারসংযোগ সাধন করে।"[১]

কূটন্যায়ও সমান অবৈজ্ঞানিক। এই আখ্যাটি আপাত নির্ভুল কিন্তু মূলত ভ্রান্ত যুক্তি সম্পর্ক প্রয়োগ করা হয়। ভ্রান্ত যুক্তির মূলে আছে যুক্তিধারার আদি বচনগুলির, হয় ইচ্ছাকৃত ভুল নির্বাচন, নয়ত কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা।

জগদ্ব্যাপারের বিশ্লেষণ গভীরভাবে ও "সর্বাত্মকভাবে" করতে হলে সম্ভাবের একান্ত দরকার, এই ব্যপদেশে কূটনৈয়ায়িকরা খেয়ালখুশীমত সম্ভাবের সন্ধান এমন জায়গায় করেন যেখানে তার অস্তিত্ব নেই। যেখানে সোজাসুজি স্পষ্টভাবে "হাঁ" কিংবা "না" বলা উচিত, সেখানে তাঁরা "যদিও একদিক থেকে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে…তথাপি, অপরপক্ষে, একথাও মানতে হবে যে…" এই নীতি অনুযায়ী "পক্ষে" এবং "বিপক্ষে" সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করার চেষ্টা করেন। জীবনের সঙ্গে, বস্তুজগতের সঙ্গে তাঁদের চতুর বুদ্ধির মারপ্যাঁচের কোন সম্পর্ক নেই। লেনিন বলেন যে, কূটনৈয়ায়িকদের প্রত্যয়ী নমনীয়তার প্রকৃতি জ্ঞাতৃগত এবং তা বস্তুজগতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন। কূটনৈয়ায়িকদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই। প্রমাণের কেবলমাত্র বাহ্যিক আভাস নিয়েই তারা ব্যাপৃত।

লেনিন বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদীদের, বিশেষত সংশোধনবাদীদের কূটন্যায় ও সারসংগ্রহবাদকে সর্বদা নির্মমভাবে খুলে ধরতেন। সংশোধনবাদীরা নিজেদের প্রায় মার্কসবাদী বলে জাহির করেন। কিন্তু তাঁরা মার্কসবাদের

---

১ দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫০১

অসংখ্য ব্যতিক্রম আবিষ্কার করেন: যথা, "মার্কসবাদ ভালোই, তবে তা পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতেই প্রযোজ্য, পশ্চিমী দেশগুলিতে তার কোনো সার্থকতা নেই।" কিংবা "আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে, কিন্তু পুঁজিবাদী কাঠামোর ভিতরে থেকে"। এই বিপরীত সর্তগুলিকে মেলানো আগুনের সঙ্গে জলকে মেশানোর মতই দুষ্কর।

অতএব, দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব সারসংগ্রহবাদ ও কূটন্যায়ের বিপরীত, প্রধানত যেহেতু এইগুলির পরিণামফল নীতিজ্ঞানহীনতা, অন্যপক্ষে দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের পক্ষে নীতিজ্ঞানের প্রতি অনুসারিত্ব ও গভীর নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে তার কার্য পদ্ধতি গড়ে তোলে।

আপনি প্রশ্ন কবতে পাবেন, "প্রত্যয়ের নমনীয়তা ব্যাপারটার তাহলে কি হল। বিপবীত প্রবণতাগুলিব ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে বিপরীত মতবাদের, যেমন, বুর্জোয়া মতবাদ ও প্রলেটারীয় মতবাদের মধ্যে ঐক্য হবে না কেন?"

আপস নয়, জয়

এইরূপ প্রশ্ন করার অর্থ ভুলে যাওয়া যে, বিপরীতগুলি শুধু ঐক্যবদ্ধ হয়েই থাকে না তারা সংঘর্ষেও লিপ্ত থাকে এবং এই দ্বিতীয় অবস্থাটাই প্রধান। সংঘর্ষ আছে বলে ধরে নিতে হবে তাদের মধ্যে একটি জয়ী হবে। লেনিনের লেখায় আছে, হয় বুর্জোয়া নয়ত প্রলেটারীয় বিশ্বদৃষ্টি জয়ী হবে। সেইজন্যে প্রলেটারীয় ভাবাদর্শকে জয়ী করার জন্য সক্রিয় সংগ্রাম অপরিহার্য। কিন্তু আপসের ভিত্তিতে নয়, একমাত্র নীতির ভিত্তিতে রচিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করেই এই জয়লাভ সম্ভব। সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সম্পর্কে লেনিন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "আমার এমনই ভাগ্য; একটার পর একটা সংগ্রামী অভিযান চালিয়ে যেতে হচ্ছে—রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে, তুচ্ছতার বিরুদ্ধে, সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে সমানে এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এবং এই কারণে অপব্যাখ্যাকারীদের তরফে ঘৃণার অবধি ছিল না। কিন্তু, সে যাই হোক, আমি আমার এই ভাগ্যের বিনিময়ে অপব্যাখ্যাকারীদের সঙ্গে 'আপস', কিছুতেই চাইব না।"১

১. লেনিন সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩৫, রুশ সং ২০৯

লেনিনের এই কথাগুলি বিশেষত তাঁরা যেন মনে রাখেন, যাঁরা কখনো কখনো নিম্নলিখিতভাবে তর্ক করতে প্রবৃত্ত হন: "নিজস্ব নীতি থেকে সামান্য পিছিয়ে যাওয়ায় তেমন কোন ক্ষতি হয় না। আমরা তাহলে আমাদের ভাবাদর্শগত প্রতিপক্ষদের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করতে পারি। বিবাদ বিসংবাদ চালিয়ে লাভ কি? "কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রথম দৃষ্টে যা সামান্য সুবিধাদান বলে মনে হয়, তাই প্রায়শই অসঙ্গেয়র মধ্যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টার নীতির দিকে বা পশ্চদপসরণ নীতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। নীতি বিষয়ক সংগ্রামের মাঝপথে থেমে যাওয়া অসম্ভব।

নীতিগত বৈসাদৃশ্যগুলি সুসঙ্গত মার্কসবাদী ভিত্তিতেই মীমাংসা করতে হবে। লেনিন সর্বপ্রাকর আপসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। একমাত্র সংহত একনিষ্ঠ সংগ্রাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদের, সাম্যবাদের আদর্শের, জয় অবশ্যম্ভাবী করতে পাবে। মার্কসীয় তত্ত্বের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য লেনিনের মতই আপসহীন হওয়া দরকার, সেই সঙ্গে বিশেষ ভাবে একথাও মনে রাখা দরকার যে, মার্কসীয় নীতিকে জয়যুক্ত করবার সংগ্রাম মার্কসবাদী দ্বান্দ্বসমন্বয়-বিদ্যার বৈপ্লবিক প্রকৃতি থেকে এবং, বিশেষত, বিপরীতের ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্র থেকে উদ্ভুত। দুই নীতির মধ্যে একটি জয়ী হয়, উভয়ের আপস হয় না।

আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন জাগছে: নীতির প্রতি এই দৃঢ় আনুগত্য কি নমনীয়তাকে, আপস নিষ্পত্তিকে নিরাকরণ করে না? না, তা করে না। প্রতিটি ব্যাপারেই তার একান্ত প্রয়োজন আছে। যে দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে পারেনি, একমাত্র সেই বলতে পারে: "শুধুই সংগ্রাম, আপস নিষ্পত্তি কখনো নয়।" এ হচ্ছে তত্ত্ববিচারমার্গের কথা।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সর্বপ্রকার আপসনিষ্পত্তির বিরোধিতা করে না, কেবলমাত্র সেইগুলির করে যেগুলিতে বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক প্রশ্নগুলি থেকে পিছিয়ে আসা বোঝায়। যদি দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীর কমিউনিষ্টদের কাছে প্রস্তাব করে: "আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলতে রাজি আছি যদি তোমরা প্রলেটারীয় বিপ্লবের মার্কসবাদী তত্ত্বকে বর্জন কর," তাহলে এই ধরণের "আপসনিষ্পত্তি" অবশ্যই অগ্রাহ্য হবে। কমিউনিষ্টরা কিন্তু ফ্যাসিষ্টবাদের ও সর্বপ্রকার প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সোস্তালিষ্ট ও কমিউনিষ্টসহ সর্বপ্রকার মেহনতী

[illegible] মিলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এই মিলন প্রোলেটারীয় [illegible]তির বিরোধিতা করে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির এবং সোভিয়েট সরকারের যে নীতির লক্ষ্য বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাজ্যের সহ-অবস্থান, সেই নীতির দ্বারা নিশ্চয় এই বোঝায় না যে, তার ফলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সব বিরোধের অবসান হবে এবং কমিউনিষ্ট ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মধ্যে একটা আপসে আসা সম্ভব হবে।

এই ভাবাদর্শগুলির মধ্যে বৈভিন্ন্য অসন্ধেয় এবং তা এই থাকবে। কিন্তু তার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগ রুদ্ধ হয় না। রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের স্বার্থে পারস্পরিক সুবিধাদান এক কথা এবং সাম্যবাদী ভাবাদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বকীয় প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন নীতিগত ব্যাপারে সুবিধাদান অন্যকথা। এখানে কোন সুবিধাদানের কথা উঠতেই পারে না। নীতির প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠার অর্থ সর্বপ্রকার অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবিনশ্বর ধ্যানধারণার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, এবং যে কোন প্রকার শত্রুর আক্রমণ থেকে ধ্যানধারণাগুলিকে রক্ষা করার সামর্থ লাভ করা। অতএব নমনীযতা এবং নীতির প্রতি নিষ্ঠা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী যোগে সংযুক্ত।

এখন আমাদের পুঁজিবাদের অধীনে এবং সমাজতন্ত্রের অধীনে সামাজিক লক্ষণগুলি পরিস্কার করে ব্যাখ্যা করা দরকার। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গ শুরু করছি।

সবের বিরোধ ও নিবে'র বিরোধ

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় অনেক বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল। শ্রমিক পুঁজিবাদীদের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠকারীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়াও "কেন্দ্র" ও "দূরবর্তী অঞ্চলগুলির" মধ্যে, অর্থাৎ জাতিগুলির মধ্যে, পারস্পরিক বিরোধ বিদ্যমান ছিল। এই সংঘর্ষগুলির মীমাংসা, এই বিরোধগুলির নিষ্পত্তি, কি উপায়ে সম্ভব? এর একমাত্র সঠিক উত্তর কমিউনিষ্ট পার্টিই দিতে পেরেছিল: বুর্জোয়া-জমিদারীতন্ত্রকে সবলে উচ্ছেদ করে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারা।

বিশ দশকের শেষাশেষি। অগ্রগামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা জয়লাভ করে

দেশে বহুদিন হল কায়েম হয়েছে কিন্তু পুরনো রাশিয়ার অপ্রীতিকর উত্তরাধিকারের রেশ তখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে। অগ্রগামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অনুন্নত অবস্থার বিরোধ বাধল। এই বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় কি? পার্টি এর উত্তর দিল: শিল্পায়ন দ্বারা।

দেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রগতিশীল উন্নতমনা ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গলের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা সাম্যবাদকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে অকুণ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁদেরই সঙ্গে, হয়ত তাঁদের সঙ্গে একই কর্মপ্রয়াসে, অলস, মাতাল এবং এই ধরণের পশ্চাৎগামী লোকও আছে। এই হচ্ছে প্রকৃত বিরোধ। এই বিরোধের মীমাংসা কি করে হবে? পার্টির উত্তর: **শিক্ষার ও ভুল-ত্রুটির সমালোচনার মারফৎ পশ্চাৎগামী লোকেদের চেতনার স্তর সবচেয়ে অগ্রগামী লোকদের চেতনাস্তরে উন্নীত করে।**

অতএব, বিরোধ নিষ্পত্তির অনেক উপায় আছে। এর কারণ, বিভিন্ন বিরোধের বিভিন্ন বিশেষক লক্ষণও আছে। এইজন্য সেইগুলি নিরাকরণের পদ্ধতিও সমানভাবে বৈশেষিক হওয়া দরকার। পুঁজিবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ এক কথা এবং অগ্রগামী শ্রমিক ও পশ্চাৎবর্তী শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ অন্য কথা। প্রথম ক্ষেত্রের বিরোধ আপসহীন শ্রেণীগত বিরোধ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বিরোধ দুই সহকর্মীর মধ্যে বিরোধ। এইজন্যে বিরোধগুলি নিরাকরণ করার ভঙ্গিগত পার্থক্য। প্রথম ক্ষেত্রে, নিরাকরণ করার উপায়—শ্রমিক বিপ্লব দ্বারা পুরনো ব্যবস্থার সবলে উচ্ছেদ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বন্ধুভাবে সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা। প্রথম ধরণের বিরোধকে বলা হয় **সবৈর বিরোধ,** দ্বিতীয় ধরণের বিরোধকে বলা হয় **নির্বৈর বিরোধ।** সবৈর বিরোধ সেখানেই হয় যেখানে অসন্ধেয় স্বার্থের সংঘর্ষ বাধে।

জীবজগতে অসন্ধেয় স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, এ কথা বলা চলে না। হিংস্রক ও অহিংস্রক প্রাণীদের মধ্যে বৈরিতা প্রায়ই ভীষণ সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। তৎসত্ত্বেও, মুখ্যত সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই সবৈর ও নির্বৈর বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধগুলি যে যে অবস্থায় প্রকট হয়েছে সেই সেই অবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী কোন উপায়ে ও পন্থায় সেইসব বিরোধের

হনিষ্পত্তি হয়, সে সম্পর্কে কেবলমাত্র এ ক্ষেত্রেই কিছু বলা সম্ভব। শত্রু-ভাবাপন্ন সামাজিক শক্তি ও শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ থেকে সমাজে সবৈর, অসঙ্কেয় বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধগুলির পরিণাম জমিদার ও কৃষককের মধ্যে, বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে, ঔপনিবেশিক জনসাধারণ ও সাম্রাজ্য-বাদীদের মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব।

পুঁজিবাদী সমাজের একটি দৃষ্টান্ত থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন করা যেতে পারে। প্রথমত, একথা মনে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় সামুহিক, যৌথ শ্রমের ফলে, ব্যক্তিগত শ্রমের ফলে নয়। যেমন ধরুন, একটা ট্রাক্টর প্রস্তুত করতে হলে শ্রমদান করতে হয় খনিমজুরকে, পার্শ্ববর্তী কারখানার ইস্পাতকারক শ্রমিকদের, এমন কি, তাড়িত উৎপাদন কেন্দ্রের শ্রমিকদেরও, যে তাড়িত উৎপাদন কেন্দ্রটি হয়ত কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত, অথচ তাই থেকেই কারখানায় তাড়িতশক্তি সরবরাহ হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমশিল্পে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিস সামাজিক শ্রমের ফল। এর থেকে বোঝা যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সামাজিক চরিত্র অর্জন করেছে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনে সমগ্র সমাজের অংশগ্রহণ যদি প্রয়োজন হয়, তার দ্বারা কি এই বোঝায় যে, শ্রমজাত ফলের উপর সমগ্র সমাজের অধিকার থাকে? এর সঠিক উত্তর, না, তা থাকে না। শ্রমের ফল তাদেরই করায়ত্ত থাকে, যারা কারখানার, জমির, খনির, মালিক, অর্থাৎ পুজিবাদীরা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা। এর থেকে বলা যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পুজিবাদী প্রকারের সঙ্গে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের বিরোধ থাকে। এই বিরোধ পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধ। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরে—সাম্রাজ্যবাদে—এই বিরোধ বিশেষভাবে প্রকট হয়।

বুর্জোয়া সমাজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরও তা টিকে আছে। সামাজিক উন্নতির পথে তা আজ অন্তরায়। উৎপাদন এমন বিপুল আকারে বৃদ্ধি-লাভ করেছে যে, একমাত্র সুপরিকল্পিত পথেই তা সফলভাবে চালান যেতে পারে। কিন্তু পুজিবাদী ব্যবস্থায় তা সম্ভব না; সম্ভব নয় তার কারণ পুজি-বাদী ব্যবস্থায় প্রাধান্য লাভ করে ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রতিযোগিতা-

শ্রেণীক সংঘর্ষ, এক পুজিবাদীর সঙ্গে অন্য পুজিবাদীর, এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। এই ধরণের পরিচালনার ফলে উৎপাদনে দেখা দেয় অরাজকতা অর্থাৎ পরিকল্পনার অভাব এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এর ফলে, পুজিবাদী সমাজে অত্যুৎপাদনের সংকট একটি নিয়তকালিক ঘটনা। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, পণ্যদ্রব্য কেনবার অবস্থা অধিকাংশ লোকের থাকে না। এই কারণে উৎপাদন হ্রাস করা হয়, তার ফলে বেকারদশা আরও বেড়ে যায়। পুজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনকে সংকটের পর সংকট পার হয়ে যেতে হয়। তাহলে, দেখতে পাচ্ছেন, **পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধ উৎপাদনের অরাজকতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়।** এইরকম অবস্থার মধ্যে সামাজিক উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না।

অন্যান্য যেসব বিরোধ পুজিবাদী সমাজের ক্ষয়কারক এবং সেই সমাজকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, মৌলিক বিরোধ সেই সব বিরোধের বাস্তব ভিত্তি। এই ধরণের বিরোধের দৃষ্টান্ত শ্রেণীতে শ্রেণীতে—বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপান এবং জার্মানী বৃটেন ও ফ্রান্সের মত ইওরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের বাজার থেকে তারা এই দেশগুলিকে আবার উৎখাত করছে। এর অনিবার্য ফল এদের সবার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ গুরুতররূপে বৃদ্ধি। পশ্চিম জার্মানী এবং জাপান আমেরিকারও বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সবের পরিণতি পুরাতনের পুনরুজ্জীবন এবং সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ ও সংঘাতের নতুন জটের আবির্ভাব।

গভীর-বৈরিতা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে সেই সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে যেসব দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে। আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং লাটিন আমেরিকার জনগণ সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের সঙ্গে কোন প্রকার আপস করতে নারাজ এবং তারা তাদের মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুঁজির সঙ্গে শ্রমের বৈরিতা, জনসাধারণের সঙ্গে একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধ, বিবর্ধমান জঙ্গীবাদ,

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংহতি লোপ, সন্ত প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রাচীন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির বিরোধ এবং—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের দ্রুত বৃদ্ধি ও বিস্তার—এরা সাম্রাজ্যবাদের জীবনীশক্তি শুষে নিয়ে তাকে দুর্বল করে তার বিনাশ ও ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে। আন্তর বৈরিতায় বিদীর্ণ পুঁজিবাদের এই হচ্ছে উলঙ্গ সত্যরূপ এবং এই বৈরিতার পরিণাম সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের বিলয়।

সবৈর বিরোধগুলির নিষ্পত্তি কি করে হয়? তাদের বিকাশের সাধারণ লক্ষণ বিরোধের বৃদ্ধি ও গুরুতররূপ ধারণ এবং এর থেকেই বিপরীত দশা ও প্রবণতাগুলির মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।

অতএব **সবৈর বিরোধগুলি শত্রুভাবাপন্ন সামাজিক শক্তি, স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও মতবাদগুলির মধ্যে বিরোধ এবং এই বিরোধই সংঘাত ও দ্বন্দ্ব সংঘটিত করে: সামাজিক বিপ্লব ও তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।** সামাজিক সম্বন্ধের কাঠামোর মধ্যবর্তী থেকে কোন বৈরিতার নিষ্পত্তি হয না। নিষ্পত্তি করতে হলে, বৈপ্লবিক উপায়ে এই সম্বন্ধগুলির বিলোপসাধন প্রয়োজন।

এর থেকে কিন্তু এই বোঝায না যে, সবৈর বিরোধনিষ্পত্তির প্রকার ও পদ্ধতি সর্বদা একই থাকে। যে অবস্থায় নিষ্পত্তি বা বিশ্লেষণ ঘটে সেই অবস্থার উপর তা নির্ভর করে। অতএব, বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের সবৈর বিরোধের বিশ্লেষণ দেখা যায়।

সবৈর বিরোধ থেকে নির্বৈর বিরোধের পার্থক্য এইখানে যে, নির্বৈর বিরোধগুলি সামাজিক শক্তিসমূহ ও প্রবণতাগুলির মধ্যে বিরোধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একইকালে ঐকান্তিক সাধারণ স্বার্থও থাকে। যথা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগামী অংশের সঙ্গে পশ্চাৎ-গামী অংশের বিরোধ।

নির্বৈর বিরোধযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজে এমন কোন বিরোধী প্রবণতা নেই যা তীব্র ও গভীর হযে শত্রুপর্যায়ভুক্ত বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। অপরপক্ষে, যেহেতু সাধারণ মৌলিক স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীগুলি ঐক্যবদ্ধ, সেইজন্য বিরোধগুলির উপশান্ত ও নিবৃত্ত হবার প্রবণতা থাকে। সেই কারণে, এই ধরণের বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি সবৈর বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি থেকে পৃথক,

ঠিক যেমন এই দুই ধরণের বিরোধগুলিও নিজেদের মধ্যে পৃথক। নির্বৈর বিরোধগুলির নিষ্পত্তি সামাজিক বিপ্লব ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের দ্বারা হয় না, তা হয় শিক্ষা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা দ্বারা, এবং সাম্যবাদী গঠন-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত অন্য কোন পদ্ধতি দ্বারা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরোধগুলি কমিউনিষ্ট পার্টি যথাসময়ে প্রকট করে এবং সেইসঙ্গে তা নিষ্পত্তির বাস্তব পন্থারও নির্দেশ দেয়। সেইজন্তে তারা কখনই শত্রু-পর্যায়ভুক্ত শক্তি ও স্বার্থের অসন্ধেয় সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে না, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বার্থগত ঐক্য বর্ত্তমান।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সবৈর বিরোধ নেই বলে কোন বিরোধই নেই, একথা বলা চলে না। লেনিনের লেখায় আছে, বিরোধ নেই এই রকম সম্পূর্ণ, পরম মিলন কখনই হতে পারে না, "এমন একটু গরমিল সর্বদাই থাকবে, যেমন গরমিল প্রকৃতির ও সমাজের বিকাশে সর্বদাই থাকে।"[১] কিন্তু সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় যে বিরোধগুলি দানা বাঁধে সেগুলি নির্বৈর বিরোধ এবং বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই তার সার্থক সমাধান সম্ভব।

অতএব, বিপরীতের ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্র বিকাশের আন্তর উৎসটি প্রকট করে। কিন্তু এই বিকাশ প্রক্রিয়াটি কিভাবে হয়? তা কি সরল রেখায় হয়, কিংবা তা আরো জটিল প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় প্রাচীনের ধ্বংস ও নবীনের আবির্ভাব ঘটে? পরবর্তী কথায় আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেব।

১ লেনিন: সিলেক্টেড ওয়ার্কস তিন খণ্ডে পৃ ৭৫৫

সপ্তম কথা

অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্র

কোন কিছুর অনস্তিত্ব বললে আমরা কি বুঝি? আপনার যদি দর্শন পাঠ না করা থাকে, তাহলে আপনি প্রায় অবধারিত নিম্নলিখিত মত উত্তর করবেন।

"অনস্তিত্ব প্রমাণ করা অর্থ কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার, অগ্রাহ্য বা বাতিল করা বোঝায়! যখন আমরা বলি "আমি স্বীকার করি না, আমি দোষী," তখন আমি বোঝাতে চাই, আমি একটি অভিযোগ অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করছি।

এই প্রসঙ্গে আপনার সম্ভবত মনে পড়তে পারে যে, ব্যাকরণে "নাই" নঞর্থক শব্দ বোঝায়, এবং নঞর্থবাচক রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে "না" শব্দের সাহায্য গ্রহণ করে।

শব্দটির এই "নাস্তিকারক" অর্থ বাস্তবিকই আছে। কিন্তু শব্দটির আরো একটি অর্থ আছে এবং এই দ্বিতীয় অর্থের আন্তর বিষয় অনেক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী বিবরণ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

অনস্তিত্ব কি?

বার্দ্ধক্য, ধ্বংস, মৃত্যু প্রাকৃতিক ঘটনা। এই ঘটনাগুলি আমাদের মধ্যে ও চতুর্দিকে আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি। আপনার খুশিমত যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনার কথা ধরতে পারেন। তার শুরু আছে, অর্থাৎ, কোন এক সময়ে তা আবির্ভূত হয়েছে, তা বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং শক্তি অর্জন করে, শেষে বয়োবৃদ্ধি হলে অকেজো হয়ে যায়। **লুডভিগ ফয়েরবাক অ্যাণ্ড দি এণ্ড অফ জারমান ক্লাসিকাল ফিলসফি** নামক গ্রন্থে এঙ্গেলস লিখেছেন যে, দ্বন্দ্বসমন্বয়তন্ত্রের কাছে এমন কিছু নেই যা অজর অমর, যা অপাপবিদ্ধ ও শর্তনিরপেক্ষ। সবকিছুই অনিবার্য অনস্তিত্বের, তিরোভাবের ছাপ বহন করছে। এর থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। একমাত্র সত্য যা টিকে থাকে তা হচ্ছে আবির্ভাব তিরোধানের

নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াপ্রবাহ, অধস্তন থেকে উর্দ্ধতম পর্যায়ে ক্ষান্তিহীন উৎক্রান্তির প্রক্রিয়া।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই অর্থে **অনস্তিত্বের সারমর্ম বলতে বোঝায়, বাস্তব জগতে নব রূপায়ণের, প্রাচীন ঘটনার তিরোধানের, এবং নবীন ঘটনার আবির্ভাবের, ক্ষান্তিহীন প্রক্রিয়া। প্রাচীনের স্থান নবীন কর্তৃক পূরণই প্রাচীনের অনস্তিত্ব।**

বলতে পারেন : যেহেতু ঘটনামাত্রই বয়োবৃদ্ধি ও মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে, এর থেকে প্রতিপন্ন হয়, আগে হোক, পরে হোক, ধীরে ধীরে সমস্ত জগতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, অনস্তিত্বের, গতায়ু ঘটনার বিলোপ সাধনের, প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার বা রূপ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রমাত্রই অকেজো হয়ে যায় এবং তাকে বাতিল করতে হয়। অনস্তিত্বের যে সাধারণ, নিত্য ব্যবহৃত অর্থের কথা আগে বলা হয়েছে, এ তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি কিন্তু আরো একটি জটিলতর নির্ভরতাসূত্রের কথা জানেন।

ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতি কেবল প্রত্যক্ষ দেহগত অর্থেই অকেজো হয়ে যায় না, প্রধানত "নৈতিক" অর্থেই তা অকেজো হয়ে যায়। তার মানে, উন্নত ধরণের ও অধিক উৎপাদনক্ষম যন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে আগেকার যন্ত্র প্রাচীন হয়ে যায় এবং তার মূল্য হ্রাস পায়, কারণ একই ধরণের যন্ত্র সস্তায় প্রস্তুত হতে থাকে কিংবা আরও উন্নত ধরণের যন্ত্রের সঙ্গে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয়।[১]

একটি যন্ত্রকে যদি নিছক ধ্বংস করা হয়, এই প্রকার অনস্তিত্ব ক্রিয়ার দ্বারা নতুন বিকাশের উপযোগী কোন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় না। জীবনের ক্ষেত্রেও এই প্রকার অনস্তিত্বের আমরা সাক্ষাৎ পাই, এমনকি কোন কোন অবস্থায় তা অপরিহার্যও হয়ে দাঁড়ায়। নাৎসী আক্রমণের প্রথম কয়েক বৎসরে সোভিয়েট জনসাধারণ বাধ্য হয়ে তাদের কলকারখানা, বাড়িঘর, খামার পুড়িয়ে ফেলে যাতে সেগুলি শত্রুকবলিত না হয়।

---

১ মার্কস, **ক্যাপিটাল** প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৪০৪ দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিক বিকাশের মূল ধারা কিন্তু স্থিতির, অনুক্রমিক বিকাশের ধারা। কারিগরী যন্ত্রপাতির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ দৃষ্টান্তের কথা আপনারা আগেই শুনেছেন, দেখেছেন, কি করে সেকেলে অকেজো যন্ত্রকে নাকচ করে যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটে। নবীকরণ প্রক্রিয়া আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করার সময় আমাদের এই ধরণের অনস্তিত্বের কথা বলতে হবে।

অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব

প্রকৃতিতে ও সমাজে যে সব নূতন নূতন ঘটনার উদ্ভব হয়, তারাও প্রাকৃতিক বিকাশধারাকে অনুসরণ করে; কালের গতিতে তারা অকেজো হয়ে যায় এবং নবতর ঘটনার কাছে স্থান ছেড়ে দেয়। প্রথম দিকে তারা যেমন প্রাচীনকে অস্বীকার করেছিল, তেমনি যারা তাদের থেকে আরও তরুণ, আরও নবীন, আরও সবল, তারা এখন তাদের অস্বীকার করে। অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব এতেই এবং যেহেতু জগদ্ব্যাপার সংখ্যাতীত, তাদের অনস্তিত্বের প্রক্রিয়া অবিরাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় অনস্তিত্ব অনস্তিত্বে বিলীন হচ্ছে তার ক্ষান্তি নেই।

এই সবের পরিণাম কি? নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। ফসল উৎপাদনের কয়েকটি পর্যায় আছে: অঙ্কুরোদ্গম, অঙ্কুর থেকে চারাগাছের বিকাশ এবং ফসলের ফলন (শস্যসংগ্রহকাল)। মাটিতে বীজের অস্তিত্ব অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গেই লোপ পায়। বীজ অনস্তিত্বে বিলীন হয়। কিন্তু তার স্থান দখল করে চারাগাছ, যার অঙ্কুরগুলি বীজ ভেদ করে উঠেছে। কিন্তু আরো পরে চারার ফুল ফোটে। সেই ফুল ফলে এবং অবশেষে ফসল পাকে। তারপর অঙ্কুরগুলি মরে যায়। এই হচ্ছে দ্বিতীয় অনস্তিত্ব। ফসল ফলানোর সমগ্র বিকাশ প্রক্রিয়াটি অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব।

লক্ষ্য করুন, এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় জমির বীজগুলোই যে ধ্বংস হচ্ছে তাই নয়, নতুন বীজেরও আবির্ভাব হচ্ছে, এবং তা হচ্ছে অনেক অধিক পরিমাণে—দশ থেকে বিশগুণ বেশী পরিমাণে। এই পরিণামফল থেকে অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের সারমর্ম বোঝা যায়। প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছিল? বীজ থেকে। পরিণাম হল কিসে? আবার সেই বীজে। কর্মধারাটা যেন পুনরাবর্তিত হল, একটি "চক্র" পূর্ণ হল। কিন্তু অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্র থেকে দেখা যায় যে বিকাশক্রিয়া হয়েছে। প্রথমে আমাদের কাছে ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ, শেষে পাওয়া যাচ্ছে—অপর্যাপ্ত

ফসল। স্বভাবত একে সাধারণ পুনরাবৃত্তি বলা চলে না।

একথা সত্য, আমরা যা 'থেকে শুরু করেছিলাম তাতেই ফিরে এসেছি, কিন্তু এই পুনরাবর্তন ঘটছে একটি নতুন ও উন্নততর পর্যায়ে। যে ফসল ফলল তা যদি গুণগত ও পরিমাণগতভাবে গোড়ায় যেমন ছিল তাই থাকত, তাহলে জমি চাষ করা হত পণ্ডশ্রম। আমরা যে প্রক্রিয়াটির দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার শুরু (বীজবপন) এবং শেষ (ফসল) বিকাশধারার দুটি বিভিন্ন স্তর, গুণগতভাবে তারা সম্পূর্ণ পৃথক। একটি নিম্নস্তর, আরেকটি উন্নততর স্তর। এই বিকাশ ধারার ফলে প্রক্রিয়াটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে, সহজ থেকে জটিলে প্রয়াণ করে।

অবএব **অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের সারসত্য এই যে, বিকাশ প্রক্রিয়ায় অগ্রবর্তী প্রতিটি স্তর পশ্চাৎবর্তী প্রতিটি স্তরকে বিলোপ ও বিনাশ করে. সেইসঙ্গে বিকাশধারাকে নতুন স্তরে উন্নীত করে এবং এই বিকাশক্রিয়ায় সম্ভাবাত্মক সব কিছুই বজায় থাকে।**

দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্ব একাধারে অনস্তিত্ব ও অস্তিত্বকে, বিলয় ও আরও বিকাশকে মেনে নেয়। "অনস্তিত্ব" অভিধাটি এইটিই প্রকাশ করে।

আগে যা বলা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অনস্তিত্বমাত্রই বিকাশের সহায়ক নয়। এঙ্গেলস খুব একটা সহজ উদাহরণ দিয়েছিলেন। আংশিকভাবে সেই উদাহরণটির কথা আমরা আগেই বলেছি। বিকাশের উপযোগী অবস্থাতে বীজ বপন করলে অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী প্রক্রিয়ার শুরু হয়, তা না করে বীজগুলোকে নিছক ধ্বংস করাও চলে। অনস্তিত্ব এর ফলেও হয়, কিন্তু তা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্ব নয়। এর থেকে বিকাশক্রিয়া সূচিত হয় না। বীজরূপ ঘটনাটি ধ্বংস হয়ে গেল এবং তারপর কিছুই রইল না। লেনিন এই প্রকার অনস্তিত্বকে "নিষ্ফলা" বলেছিলেন।

নাস্তিবাদ ও সংশয়-বাদের সমালোচনা

বাস্তব জীবনে কি এই প্রকার অনস্তিত্ব ঘটে? হাঁ, প্রায়ই ঘটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এমন লোক আছে যারা কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না, কোন কিছুর অস্তিত্বকে মানতে চায় না। তাদের বলা হয় "নাস্তিবাদী"। আরও এক ধরণের লোক আছে যাদের সব কিছুতেই অবিশ্বাস, সব কিছুতেই সন্দেহ। তাদের বলা হয় সংশয়বাদী। এরাও বিলোপ করে কিন্তু এদের

অনস্তিত্ব সাধন "নিস্ফলা", সংশয়দুষ্ট। লেনিন এই ধরণের ভুয়া অনস্তিত্বকে সর্বদা আক্রমণ করতেন।

দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্ব পূর্বগামী বিকাশস্তরের সঙ্গে যোগরক্ষার অন্যতম কারণ,তা যেন পূর্ববর্তী বিকাশধারার সমাহার। এর দ্বারা বিকাশধারার পারম্পর্য প্রকাশ পায়। **অনস্তিত্ব তখনই দ্বন্দ্বসমন্বয়ী যখন তা বিকাশের সূচনা করে, যখন তা যা কিছু সম্ভাবাত্মক, সুস্থ ও মূল্যবান তা বজায় রাখে।** অনস্তিত্বের জন্যই যেন অনস্তিত্ব না হয়। অনস্তিত্বের জন্য অনস্তিত্ব, শূন্যবাদের লক্ষ্য। দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী অনস্তিত্ব পূর্বতন বিকাশস্তরকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য না করে তাকে উত্তরণ করা বোঝায়। অনস্তিত্ব যদি দ্বন্দ্বসমন্বয়ী হয়, তাহলে তা বিকাশের অন্তরায় তো হয়ই না, বরঞ্চ পূর্বতন বিকাশে যে সম্ভাবাত্মক দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছিল তা বজায় রাখে এবং পোষণ করে। লেনিন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ভুয়া অনস্তিত্ব, নিস্ফলা অনস্তিত্ব, সংশয়াত্মক অনস্তিত্ব এবং দ্বিধা ও সন্দেহ দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের সার-মর্ম ও বিশেষত্ব নয়—যদিও অনস্তিত্ব নিঃসন্দেহে তার একটি মূল উপাদান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—কিন্তু সেই অনস্তিত্ব যোগসূত্রের, বিকাশের, একটি মুহূর্ত, তাতে সম্ভাবাত্মক দিকগুলি বজায় থাকে, অর্থাৎ, তাতে কোন দ্বিধা, সার-সংগ্রহবাদের কোন প্রয়াস থাকে না।"১

নাস্তিবাদী ও সংশয়বাদীরা কিভাবে আচরণ করে? এর সহজ দৃষ্টান্ত বুর্জোয়া নেতাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কীর্তিকলাপের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অক্টোবর বিপ্লবের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন। তারপরেও অনেক বছর তাঁরা সোভিয়েট গণতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান নি। সংশয়বাদীরা মেহনতী মানুষের নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন করার ক্ষমতা সম্পর্কে বরাবর সন্দেহ পোষণ করে এসেছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে পরিকল্পনাগুলিকে "ইউটোপিয়া" (কল্পরাজ্য) আখ্যা দেওয়া হয়, এবং "অসম্ভব" বলে একবাক্যে নিন্দা করা হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে নাস্তিবাদী ও সংশয়বাদীরা মিথ্যা প্রমাণিত হল।

স্পুটনিক ও লুনিক ক্ষেপণের পরে সমাজতান্ত্রিক দেশের সাফল্য সম্পর্কে

---

১ লেনিন-কলেক্টেড ওয়ার্কস খণ্ড ৩৮, পৃঃ ২২৬

সন্দেহ প্রকাশ করা, বা তা অস্বীকার করা বিশেষরূপে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরব সংশয়বাদীরা, যারা এমন কি সোভিয়েট মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, লজ্জায় তাদের মুখ লুকোতে বাধ্য হয়েছে। এখনকার নাস্তিবাদী ও সংশয়বাদীরা কেবল তাদের প্রকার ও পদ্ধতি বদলিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে স্থিরীকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে তারা আর খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করে না। তারা পরিকল্পনাগুলির সাফল্য সম্পর্কে "কেবল" সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা "বিশ্বাস করে না" যে জনসাধারণের জন্যে প্রাচুর্য আনা সম্ভব, তাদের "সন্দেহ" আছে—বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের স্বপ্ন কোনকালে সফল হবে কিনা।

নাস্তিবাদী মনোভাব কেবলমাত্র সোভিয়েট বস্তুজগৎ সম্পর্কেই প্রকাশ পায়না। বিজ্ঞানের, প্রযুক্তিবিদ্যার, দর্শনের বিকাশে এবং সমগ্রভাবে মানব চিন্তার ইতিহাসে যা কিছু সম্ভাবাত্মক লক্ষণ আছে, যখনই তা অস্বীকার করার নৈরাষ্ট্রবাদী, পেতিবুর্জোয়া প্রয়াস দেখা দিয়েছে, কমিউনিষ্ট পার্টি তখনই তার ঘোরতর প্রতিবাদ করেছে।

বিশ্বসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, উন্নাসিক মনোভাবের বিরুদ্ধে, আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা না নিয়ে অপরকে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বদা সংগ্রাম করে এসেছে এবং এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে, অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রথম কয়েক বৎসর প্রলেটকাল্ট নামে শ্রমিক শ্রেনীর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কিছু সংগঠন মিলে একটি সংঘ গড়ে ওঠে। সেই সংঘভুক্ত ব্যক্তিদের মতে নব্য সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির সব কিছু পুরোপুরি বাতিল করে। প্রলেটকাল্টের নাস্তিবাদী কার্যকলাপ কি বীভৎসরূপ গ্রহণ করেছিল তা এই থেকে কিছুটা বোঝা যায় যে, তারা বলশয় থিয়েটার এবং মস্কো আর্ট থিয়েটার বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেছিল, যেহেতু এইগুলির পত্তন হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ায় এবং তাদের মতে, 'প্রলেটারিয়েট'এর প্রয়োজন নতুন ধরণের সাহিত্য ও শিল্পকলা।

লেনিন প্রলেটকাল্ট ভাবতত্ত্বজ্ঞের এইসব অমার্কসীয় ধারণাগুলিকে তীব্র-

ভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, প্রলেটারীয় সংস্কৃতি শূণ্য থেকে উদ্ভূত হয় না, তা পূর্বগামী সাংস্কৃতিক বিকাশের সমগ্রধারার স্বাভাবিক পরিণাম ফল। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে ধ্বংস ও বাতিল করে ঠিকই, কিন্তু তা এমনভাবে করে যাতে সেই সংস্কৃতির যা কিছু মূল্যবান, তা বজায় থাকে। বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্ব লেনিন এইভাবে বুঝেছিলেন।

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যসূচী নির্দেশ করে যে, জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তার ও গণপক্ষপাতিতার নীতির ভিত্তিতে যে সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের সূচনা হয়, তাতে বিশ্বসংস্কৃতির যাবতীয় প্রগতিশীল ঐতিহ্যের প্রয়োগ ও বিকাশের সঙ্গে জীবনের শৈল্পিক রূপায়ণে দুঃসাহসিক অভিনবত্বের সমন্বয় ঘটে।

মার্কসবাদের শত্রুরা কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে বলে যে, তারা ধ্বংস করতেই আছে, গড়ে তোলা, সৃষ্টি করা তাদের সাধ্যে নেই। অথচ কমিউনিষ্টরা সর্বজন-ঘৃণিত শোষণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, নতুন ও সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত এক সামাজিক ব্যবস্থা—সাম্যবাদ—প্রবর্তন করার জন্যে।

কমিউনিষ্টরা সর্বদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনাশ করে। পৃথিবীকে রূপান্তরিত করতে এবং নবজীবন দান করতে কমিউনিষ্টরা মানবজাতির ইতিহাসে মহান এক সৃজনীশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল, যা কিছু অচল, কমিউনিষ্টরা তার বিলোপসাধন করে; যা কিছু মূল্যবান, তারা তাই রক্ষা করে।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় যা কিছু হিতকর, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তা অবজ্ঞা করে না, উপরন্তু পাশ্চাত্য দেশের উৎপাদন পদ্ধতিতে সংগঠন ও প্রযুক্তি-বিদ্যা বিষয়ে মূল্যবান সবকিছু তারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে গ্রহণ করে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখা সার্থকভাবে বিকশিত করার উপযোগী অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাব্যতা সমাজতান্ত্রিক সমাজেরই আছে। কিন্তু এই কারণে অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যে উন্নতি হয়েছে তা অস্বীকার করে সেই সম্পর্কে নাস্তিবাদী মনোভাব গ্রহণ করা মারাত্মক ভুল হবে।

মার্কসীয় দর্শনের ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করতে পারেন: মার্কসকে যখন প্রশ্ন করা হয়, "আপনার প্রিয় প্রবচন কি?" তিনি তার উত্তরে যে লাতিন

প্রবাদটির উল্লেখ করেন, তার অর্থ "সব কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন কর"। লেনিনও একথা বার বার বলেছেন যে, দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বে সংশয়বাদের কিছু রেশ আছে। তাই যদি, তাহলে সংশয়বাদ নিন্দার্হ হতে যাবে কেন? এই বিষয়ে ভুল ধারণা দূর করতে হলে একথা মনে রাখতে হবে যে, এই প্রত্যয়গুলি কখনো কখনো বিভিন্ন অর্থে বোঝা হয়ে থাকে।

মার্কস ও লেনিনের যে উক্তিগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে প্রশ্ন দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী অনস্তিত্বের এবং যুক্তিযুক্ত সংশয়বাদের। আসলে এইগুলি বস্তুজগৎ সম্পর্কে মার্কসীয় অভিমুখিতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব স্বকীয় প্রকৃতিতেই অন্ধবিশ্বাস ও নির্বিচার মতান্ধতার বিপক্ষে।

বস্তুজগৎ সম্পর্কে যে নির্বিচার মনোভাব সব কিছুকে বিশ্বাসের জোরে গ্রহণ করে কমিউনিষ্ট পার্টি তার বিরোধিতা করে। এখানে যুক্তিযুক্ত সংশয়বাদ কিছু পরিমাণে অপরিহার্য; যুক্তিযুক্ত সন্দেহের চোখে বাস্তব জগদ্ব্যাপার দেখলে জগৎ সম্পর্কে সুস্থ ধারণা সহজে লাভ করা যায়। উপরে উদ্ধৃত মার্কসের উক্তির সারমর্ম এই।

যুক্তিযুক্ত সংশয়বাদের স্থলে ভুয়া সংশয়বাদ আমদানী করলে ফল হবে একেবারে ভিন্ন। সেক্ষেত্রে তা নাস্তিবাদের সামিল।

যে সীমারেখা নাস্তিবাদ থেকে সুস্থ সংশয়বাদকে পৃথক করে, ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে সেই সীমারেখাকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত দরকার। সর্বদা নিজেকে এই প্রশ্ন করতে হয়: "আমি যে সন্দেহ পোষণ করছি, এর উদ্দেশ্য কি—ধ্বংস, না, সৃষ্টি?"

লেনিনের শিক্ষা ছিল, **দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বে কিছু পরিমাণে সংশয়বাদ থাকলেও, তা পুরোপুরি সংশয়বাদ নয়।** নিস্ফলা সংশয় থেকে সম্ভাবাত্মক কিছুই পাওয়া যায় না। এই সংশয় কোন প্রয়োজন সাধন করে বলে মনে হয় না। এই ধরণের সংশয়বাদীদের সম্পর্কে বেলিন্স্কি কয়েকটি ভালো কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, "যারা অপদার্থ, সংকীর্ণমনা তারাই সংশয়বাদ জাহির করে বেড়ায়, তা যেন একটা ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক, যেন বড়াই করার মত একটা কৃতিত্ব। যাদের কোন কাজকর্ম নেই, যারা ভণ্ড, ভাঁড়ামি যাদের পেশা, একমাত্র তারাই সব কিছু হালকাভাবে ও ঠাট্টার ছলে সন্দেহ করে থাকে, তাদের দিক থেকে তারা এতে মজা পায়,

তাদের এর ফলে ভুগতে হয় না।...বিজ্ঞান, শিল্পকলা, যুক্তি—সব কিছুকে ঠাট্টা করে ও গালাগালি দিয়ে ক্ষতিত্ব কি?"

একদিকে সংশয়বাদ ও নাস্তিবাদ, অন্যদিকে যুক্তিহীন মতান্ধতা, এই উভয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নির্ভরযোগ্য ভরসা, অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

এতক্ষণ যা বলা হল তাই থেকে আমরা আরও গভীরভাবে অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের সারমর্মে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হব এবং তার ফলে বিকাশধারার প্রগতিশীল চরিত্র অবধারণ করা সহজ হবে। এই প্রশ্নটি এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বিকাশের প্রগতিশীল চরিত্র

আপনারা জানেন যে, আদিম মানুষ শ্রমের হাতিয়ার সৃষ্টি করে শ্রমসাধ্য কার্যকলাপ শুরু করে। ঐতিহাসিক বিকাশের একটা পর্যায়ে পাথরের হাতিয়ারের জায়গায় আসে ধাতব হাতিয়ার। শেষেরটি বলা যেতে পারে, আগেরটির অনস্তিত্ব জ্ঞাপক, কিন্তু তাতে পাথরের হাতিয়ারের যা কিছু মূল্যবান দিক, যেমন তার ধার, তার আকার ইত্যাদি (পাথরের ও লোহার কুড়ুল দেখলেই বোঝা যায়) সবই বজায় রইল।

উৎপাদনী হাতিয়ারের বিকাশধারায় যন্ত্রের আবিষ্কার একটি নতুন ধাপ। মার্কস তাঁর "ক্যাপিটাল" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, যন্ত্রচালিত তাঁতের আদিম আকারে প্রাচীন হাতে চালানো তাঁত সহজেই ধরা যেত। আগেরটি পরেরটির অনস্তিত্বজ্ঞাপক, কিন্তু এই অনস্তিত্ব দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্ব, যেহেতু এতে প্রাচীন হাতে চালানো তাঁতের কৌশল কিছু পরিমাণে টিকে থাকে। যন্ত্রের ক্ষেত্রে একথা সর্বদা সত্য। নতুন যন্ত্র প্রাচীন যন্ত্রকে বিলোপ করে, কিন্তু আগেকার উৎপাদন অভিজ্ঞতায় যা কিছু মূল্যবান দিক তা অবধারিতভাবে বজায় রাখে।

বিকাশন প্রক্রিয়া কিভাবে চলেছে, লক্ষ্য করে দেখুন। শুরুতে মানুষের কাছে ছিল আদিম হাতিয়ার (পাথরের)। এখন আমাদের আছে আনবিক শক্তি কেন্দ্র, জেট ইঞ্জিন, এবং এই ধরণের অনেক কিছু। অতএব পর পর অনস্তিত্ব প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে এমন ফল লাভ হয়েছে যা, গোড়ায় যা ছিল, তার থেকে এত উন্নত যে, তুলনাই চলে না। এইভাবে মানবজাতি বিকাশের

পথে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছে।

এই বিকাশধারা কোন পথ অতিক্রম করেছে? আদিম থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যান্ত্রিক কৌশল যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি কাল্পনিক রেখা টানুন, তাহলেই পরিষ্কারভাবে তার ফল বুঝতে পারবেন। রেখাটা অবশ্যই উর্দ্ধগামী হবে। যতদিন গেছে যন্ত্রকৌশল তত নিখুত হয়েছে, রূপকের ভাষায় বলতে গেলে, তা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নত হয়েছে। "উন্নততর যান্ত্রিক কৌশলের" কথা বলা অর্থহীন নয়।

যে কোন প্রকার বিকাশপ্রক্রিয়ার প্রকৃতি এই, যদি তা অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রানুযায়ী ঘটে। উন্নততর স্তরকে উন্নততর বলা হয় যেহেতু তা সমস্ত বিকাশ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্বের এইটেই প্রধান লক্ষণ। এর থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায়, তা এই: **অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রে যে বিকাশ সংঘটিত হয় তার অন্যতম ধর্ম প্রগতি অগ্রগমন।**

এই সিদ্ধান্ত, কি মানবসমাজ কি প্রকৃতি, উভয়েরই বিকাশনে প্রযোজ্য। প্রকৃতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অজৈব স্তর থেকে উন্নততর জৈব স্তরে রূপান্তর, প্রথম জীবশরীর থেকে মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত জীবলোকের বিকাশ। সমাজেও বিকাশধারা আদিম সাম্যবাদ থেকে সাম্যবাদের প্রাথমিক স্তর সমাজতন্ত্রবাদে এসে পৌঁছিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধারা লক্ষ্য করি। জগৎ সম্পর্কে আদিম মানুষের যে জ্ঞান ছিল তার সঙ্গে, আধুনিক মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায় যে জ্ঞান লাভ করেছে, তার তুলনাই করা যায় না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বত্র একই প্রবণতা, একই নিয়মানুবর্তন—**বিকাশমাত্রই প্রগতিশীল, নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে, সহজ থেকে জটিলে তার গতি, অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের সারমর্ম এই।**

এই প্রবণতা, এই সূত্র, থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ—তার **আশাবাদী চরিত্র** নির্ণীত হয়। অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ধারণার প্রত্যক্ষ ফল এই। নিষ্ফলা অনস্তিত্বকে যে স্বীকার করে না, যে বোঝে অনস্তিত্ব বিকাশ প্রক্রিয়ার সহায়ক, সে জগৎ সম্পর্কে আশাবাদী হতে বাধ্য আমাদের বিশ্বদৃষ্টির প্রকৃতি বাস্তবিকই এইরকম।

ভাববাদী বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির দ্বারা যারা প্রভাবিত, তারা একেবারে বিপরীত ধারণা পোষণ করে। তারা নৈরাশ্যবাদী, জীবন সম্পর্কে তাদের মনোভাব নিরানন্দ, হতাশায় ভরা। পুঁজিবাদী জগৎ ভেঙ্গে পড়ছে দেখে কোন কোন বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ধরে নিয়েছেন যে, এই সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতন সাধারণভাবে সভ্যতা, মানবতা ও চিন্তাজগতের সঙ্কট সূচিত করছে। তাঁরা বলেন "আনবিক সর্বনাশের" কথা, "সভ্যতার অন্তিম অবস্থার" কথা, "বিশ্ব প্রলয়" ও এই ধরণের কথা। প্রগতিকে, মানব সমাজের প্রগতিশীল বিকাশকে, অস্বীকার করার এই পাশ্চাত্য ফ্যাশনের অন্তর্নিহিত অর্থ কি, আপনারা এই থেকেই বুঝতে পারছেন। এমন কি "প্রগতি" শব্দটাকেও ব্যবহার করতে তাদের দ্বিধা। তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানী কংগ্রেসে বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞানী লিওপোল্ড ফন ভিয়েসে প্রমাণ করেন যে, এই শব্দটির জায়গায় "পরিবর্তন'' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। এর সপক্ষে তাঁর যুক্তি এই যে, মানবজাতি দুটি বিশ্বযুদ্ধের মর্মন্তুদ সরিক, তাদের কাছে এই প্রকার সতর্ক ও সংশয়াত্মক শব্দ অনেক বেশী উপযোগী। কিন্তু বিজ্ঞান ও বাস্তব জীবন বুর্জোয়া দার্শনিকদের এই সব দৃঢ়োক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। মানব সমাজ ও প্রকৃতির নিয়ত প্রগতিশীল অগ্রগামী বিকাশধারা যে নিয়মে চালিত হচ্ছে, তা বাস্তবধর্মী, তা অপরাজেয়। এই নিয়ম কিভাবে কাজ করছে ?

সর্পিল বিকাশ

"ইতিহাসের পুনরাবর্তন হয়" সবাই একথা জানে। ইতিহাসের প্রক্রিয়ার এ অন্যতম একটি লক্ষণ। যথা, মানবজাতির বিকাশপর্বের শুরুতে কাজ করার হাতিয়ারগুলি ছিল সমূহের বা সমাজের অধিকারভুক্ত। হাজার হাজার বৎসর পার হয়ে গেল। আবার সমাজতন্ত্রবাদে, সাম্যবাদে তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সমাজের সব ব্যক্তি সমষ্টিগতভাবে তাদের শ্রমজাত উৎপাদনের সরিক।

কিছু পরিমাণে এখানে যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তা ঠিকই। একই প্রকার অনেক উদাহরণ দেখানো যায়। বুর্জোয়া দার্শনিকেরা এবং গীর্জার মোহন্তরা জগতের বিকাশ চক্রগতিতে চলছে প্রমাণ করার জন্য এই দৃষ্টান্ত দেখান। এই সৌর জগতে নতুন বলতে কিছু নেই—অনন্তকাল ধরে শুধু চক্রাবর্তন ও পুনরাবৃত্তি চলেছে।

এই চক্রাবর্তন তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন ইটালীর দার্শনিক গিওভান্নি ভিচো। তাঁর আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু। তাঁর মতে, মানুষের জীবন যেমন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য, তেমনি সব মানব গোষ্ঠীকেও এই তিনটি কালক্রম পার হতে হয়। প্রস্ফুটনকাল পার হয়ে যাবার পর সমাজের প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসতে থাকে। আবার তা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যায়। চক্রাবর্ত পূর্ণ হয় এবং আবার বিকাশের নতুন চক্রধারায় যাত্রা শুরু করে। এবং এই নতুন ধারা পুরনো ধারারই সামিল।

ভিচোর মতবাদে তবুও কিছুটা প্রগতিবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষত যখন তিনি স্বীকার করেন যে, বাস্তব নিয়মানুযায়ী ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়; বাস্তবিকই তাঁর মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিক আশাবাদ ছিল। কিন্তু আধুনিক বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এবং দার্শনিকেরা মনোনিবেশ করেন চক্রাবর্তনতত্ত্বের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটার উপর। যেমন ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি মানব সমাজের ইতিহাসকে কয়েকটি স্বতন্ত্র সভ্যতায় বিভক্ত করেছেন এবং এই সভ্যতার প্রত্যেকটিকে জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর পর্যায়ক্রম একইভাবে পার হতে হয়। এইরকম তত্ত্বের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, কারণ বর্তমানকালে সমাজ যে প্রগতির পথে বিকাশ লাভ করছে তা সবার কাছে সহজবোধ্য।

"তা কি করে হবে?" হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন। "আপনিই তো একটু আগে বললেন, কিছুটা পুনরাবৃত্তি, প্রাচীনের প্রত্যাগমন ঐতিহাসিক বিকাশনে পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা তা অস্বীকার করব কেন?"

অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্র অনুযায়ী বিগত অবস্থা যে বাস্তবিক ফিরে আসে, এ কথা সত্য। ভাবতে পারেন, আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থায় এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানার কথা। এই প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র আপাত দৃষ্টিতে প্রাচীনের পুনরাবর্তন বলে মনে হয়। বাস্তবিকপক্ষে এটা কিন্তু বাহ্যিক রূপের সাদৃশ্য। এর অন্তরালে অনেক জটিল সম্বন্ধ লুকিয়ে থাকে। আসলে, এ ক্ষেত্রে পুনরাবর্তন ঘটে না।

আদিম মানুষের জীবন থেকে সাম্যবাদী সমাজ যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের জীবনের যেমন পার্থক্য, তেমনি মৌলিক পার্থক্য আদিম সমাজব্যবস্থায়

সামাজিক মালিকানা থেকে যান্ত্রিক কৌশলে অভূতপূর্ব উন্নত এবং বি
সম্ভাবনাযুক্ত সাম্যবাদের আমলে সামাজিক মালিকানা। একে
প্রাচীন অবস্থায়-প্রত্যাবর্তন বলা চলে না। তাহলে "পশ্চাৎগমনের"
রূপের অন্তরাল থেকে প্রগতিশীল আসল বিকাশধারাটিকে পৃথক
দরকার। চেরনিশেভস্কি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বিকাশের উন্নততর
বাহ্যিক রূপের দিক থেকে বিকাশের আদিম অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের মত
বাহ্যিক রূপের সামঞ্জস্য সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আন্তরবস্তুটি প্রাথমিক
অবস্থার তুলনায় এত সমৃদ্ধ ও উন্নত যে, তার পরিমাপ হয় না।"

অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের ফলে প্রাচীনের আপাত প্রত্যবর্তন ঘটে
লেনিনও একথা বিশেষভাবে বলে গিয়েছেন। এই প্রত্যাবর্তন কেবল রূপগ
সারবস্তু সম্পর্কে নয়। কারণ বিকাশধারা যেমন সমৃদ্ধ হয় তেমনি উচ্চ পর্যা
উন্নীত হয়।

তাহলে দেখছেন "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়" এই বচনটির ঠিক
তাৎপর্য এই যে, আসল বিকাশপ্রক্রিয়ার একটি বিশেষ দিকে
আলোকপাত করে। কিন্তু তার শব্দগত অর্থ গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল ব
হবে। যে ঐতিহাসিক বিকাশনপ্রগতিশীল, তাতে কখনোই
একপ্রকার দুটি স্তর থাকতে পারে না। অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্র অনুযা
মূল ঐতিহাসিক রূপগুলির কোন কোন লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য উচ্চতর পর্য
পুনরুজ্জীবিত ও পুনরাবর্তিত হয়। এর থেকেই বোঝা যায় বিকাশক্রম চ
ধারায় হয় না।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হতে পারে: বিকাশ যদি ক্রমোন্নতির পথেই হ
নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে যদি তার গতি হয়, তা কি সরলরেখায় হ
থাকে, না, কোন জটিলতর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হয়?

বিকাশের প্রকৃতি প্রগতিশীল, মার্কসবাদ এই তত্ত্বকে স্বীকার করেও কখ
একথা বলে না যে, ঐতিহাসিক বিকাশধারা সরলরেখা অনুসরণ করে। ইতিহ
সরলরেখায় বিকাশলাভ করে না, মাঝে মাঝে তার যাত্রাপথে বিরাট বির
ছেদ আসে, তার যাত্রা আঁকাবাঁকা পথে, হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে যা
ইতিহাসে পশ্চাৎগমনও ঘটে। তখন কোন এক দেশে কিংবা কয়েকটি দে
প্রগতিশীল শক্তির বদলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয়ী হয়। যেমন হয়েছিল নাৎ

র্মানীতে। কিন্তু এই পশ্চাৎগতি ঐতিহাসিক বিকাশধারার সাধারণ ণতাকে বদলে দিতে পারে না, তা মোটের উপর প্রগতির পথে ক্রমোর্ধ্ব অনুসরণ করে।

প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হতে পারে, যদি আমরা র সঙ্গে সর্পিল আবর্তের তুলনা করি। এতে চক্রসংখ্যা অনেক, কিন্তু নটাই কোনটার সঙ্গে মেশে না বা পুনরাবর্তিত হয় না। কেউ যদি রানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে, তাকে দেখায়, সে যেন চক্রবৃত্তে ঘুরে লছে, অথচ সে কিন্তু উচু থেকে আরও উচুতে উঠে যাচ্ছে। এই উপমা থেকে নস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের সারমর্ম খুব ভালো ভাবে বোঝা যায়।

অতএব, **বিকাশন ঘটে সর্পিল আবর্তে এবং প্রতিটি আবর্তের মুখে গতভাবে এমন নূতন কিছুর আবির্ভাব ঘটে যার ফলে বিকাশ ক্রিয়া উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়।**

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে পারেন: যদি প্রক্রিয়ামাত্রই অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব অনুযায়ী উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়, তাহলে সাম্যবাদের পরে কি হবে। সমাজের কি অস্তিত্ব থাকবে না? এই একটা প্রশ্ন প্রায়ই করা হয়। র্কসবাদীরা এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দিয়ে থাকেন: সাম্যবাদী সম্বন্ধের তিষ্ঠায় শুধু একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন থেকে আরেকটি অনুরূপ গঠনে অবস্থান্তর বোঝায় না; তা সমাজের অনেক সংগঠনপুষ্ট প্রাক-তিহাস থেকে **আসল ইতিহাসে** উত্তরণ বোঝায়।

সাম্যবাদ ইতিহাসের শুধু একটা সাধারণ পর্ব বা ক্ষণস্থায়ী স্তর নয়। সাম্য-াদী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা থেকে যে ইতিহাসের সূত্রপাত হয়, তা নূতন, মানবজাতির থার্থ সচেতন ইতিহাস, পরবর্তী ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি সেই ইতিহাসের ক একটি স্তর। ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে, আগে হোক, পরে হোক, াম্যবাদের অস্তিত্ব লোপের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, একথা বলাও যা, যান্ত্রিক তির ফলে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প লোপ পেতে পারে, এ ধারণা করাও তাই।

মার্কসবাদের ভাববাদী শত্রুরা পাল্টা জবাবে বলেন "তাহলে বৈজ্ঞানিক াম্যবাদতত্ত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের বিরোধ আছে বলতে হবে। সাম্যবাদের ামলে অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্র অচল হয়ে যায়।" বাস্তবিক এক্ষেত্রে কি এই কম বিরোধ আছে? একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

দাসত্বপ্রথায়, সামন্ততন্ত্রে, পুঁজিতন্ত্রে অর্থনৈতিক সম্বন্ধের সব প্রকারগুলি আগে হোক, পরে হোক, বিকাশধারার পথে কেন বাধা হয়ে এবং বাধাগুলি চূর্ণ করে কিসের জন্যে সম্বন্ধগুলির রূপান্তর সাধন করতে ছিল ? যেহেতু সেইসব সম্বন্ধ ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সাম্যবাদী সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম উৎপ শক্তিগুলি অবাধ বিকাশোপযোগী রূপ লাভ করল। অতএব এই নবরূপ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এর থেকে কি এই প্রমাণ হয় যে, সাম্যবাদের আমলে সামাজিক বিকাশ বাস্তবিকপক্ষে বন্ধ হয়ে যাবে ? এইরূপ প্রশ্ন করার অর্থ, "সামাজিক বিকাশের" সঙ্গে "বর্তমান সামাজিক সম্বন্ধের পরিবর্তন"কে এক করে দেখা।

দাসত্বপ্রথায়, সামন্ততন্ত্রে, পুঁজিতন্ত্রে সামাজিক সম্বন্ধের অচল কাঠামোর মধ্যে সামাজিক বিকাশ প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ছিল। সেইজন্য সম্বন্ধগুলিকে বদলাতে হয়েছিল। কিন্তু সাম্যবাদী সম্বন্ধ যদি সামাজিক উন্নতির অফুরন্ত সুযোগ দান করে, বাস্তবিক তাহলে সেই সম্বন্ধগুলিকে বিলোপ করা বা বাতিল করার প্রয়োজন কি ? একথা মেনে নিতেই হবে যে, তাদের জায়গায় অন্য কিছুর আমদানীর কোন কারণই থাকতে পারে না।

সাম্যবাদের আমলে সামাজিক সম্বন্ধের উন্নতি বলতে বোঝায় নবীনের আবির্ভাবে প্রাচীনের অস্তিত্বলোপ, মানবীয় আচরণে ও সাংস্কৃতিক মানে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সুদূরপ্রসারী এক পরিবর্তন পরম্পরা। এই সব অনস্তিত্বের কোনটিই কিন্তু 'সাম্যবাদী সম্বন্ধের সামাজিক প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে না, শুধু তাই নয়, আরও ঐতিহাসিক উন্নতির পক্ষে এই অক্ষুণ্ণতা অপরিহার্য। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সাম্যবাদের আমলে অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সূত্রের মুখ্য উপাদান—সামাজিক বিকাশের প্রগতিশীল চরিত্র—কখনোই লোপ পায় না। যা প্রাচীন, যা অচল, তার বিরুদ্ধে নবীনের জয়যাত্রা সমগ্র মানবেতিহাসের বিধান। অতএব সাম্যবাদী সমাজেরও বিধান।

বিকাশ অর্থ প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষ

বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাজনীতি—আপনার কর্মক্ষেত্র যাই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই প্রাচীন ও অচলের সঙ্গে নবীনের সংগ্রাম সব সময় চলেছে। কিন্তু নবীন বলতে কি বুঝতে হবে ?

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নূতন বলতে আমরা তাই বুঝি, যা সর্বপ্রথম

করা হয়েছে, যা সম্প্রতি উদ্ভূত হয়েছে। দার্শনিক অর্থে এই প্রত্যয়টি কিছুটা ভিন্নার্থে ও অনেক গভীর তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন ধরুন, পাশ্চাত্য দেশে যদি এমন কোন "নব্য" দার্শনিক তন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে, যা নূতনত্বের চকমা পরিয়ে সেকেলে অচল বস্তাপচা ধারণাগুলোকে জাগিয়ে তোলে, তাকে কোনক্রমেই নবীণ ঘটনা বলা চলবে না।

বাস্তব জীবনে প্রাচীন অনেক সময়ে নবীনের মুখশ পরে থাকে। নবীনের বিরুদ্ধে প্রাচীনের সংগ্রামে এইটেই একাধারে অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রচ্ছন্নরূপ। নিম্নলিখিত উদাহরণটির কথা ভেবে দেখুন। সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীমাত্রই মার্কসবাদের সমালোচনা করে থাকে, তাদের মতে মার্কসবাদ "সেকেলে" এবং তারা যে মতবাদ প্রচার করে, তা সম্পুর্ণভাবে নূতন। কিন্তু নূতন কিছু একটা সৃষ্টি করার অছিলায় তারা মার্কসবাদী তত্ত্বের মুলনীতিকে হেয় করে। সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার "নূতন" পথ আবিষ্কার করার নামে সংশোধনবাদীরা, সোভিয়েট জনগণ যে পথে অগ্রসর হয়ে এসেছে, তা বাতিল করে, যেহেতু সেই পথ, তাদের মতে, সেকেলে। কিন্তু তার বদলে তারা যা পরিবেশন করে, তা নূতন পাত্রে সেই পুরনো কাসুন্দি।

পুঁজিতান্ত্রিক জগতের বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা আজকালকার পুঁজিতন্ত্রকে "নূতন" ও "আধুনিক" বলে জাহির করার যে চেষ্টা চালিয়ে চলেছেন, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে নূতনত্বের কথা বলার কোন মানেই হয় না। পুঁজিতন্ত্র অচল হয়ে গেছে; তার অন্তিমকাল এগিয়ে আসছে, নূতন সাজ পরিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, "নবীন" দার্শনিক প্রত্যয়টির একটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট অর্থ আছে।

মার্কসবাদ লেনিনবাদ নবীন অর্থে এমন প্রক্রিয়া বা ঘটনা বোঝে, যার দ্বারা বিকাশের প্রগতিশীল প্রবণতা প্রকাশ পায়। নবীন তাই, যা প্রগতিশীল, অগ্রগামী, যা স্বভাবতই নবীকরণের সঙ্গে, নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে, সহজ থেকে জটিলে, বিকাশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

পুরাতন ও নূতন ঘটনাবলী পারস্পরিক কি সম্বন্ধে অবস্থান করে? প্রধানত তা বিপরীতের সম্বন্ধ। কিন্তু, আপনারা জানেন, বিপরীতদ্বয়ের মধ্যে যেমন মিলের দিক আছে, তেমনি একই কালে তাদের মধ্যে সংঘর্ষও চলে। সেইজন্যে

এই বিপরীতগুলিকে পরস্পর থেকে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সংঘর্ষকে এড়াতে পারাও যায় না। আসল কথা হচ্ছে, নবীনের উদ্ভবস্থান প্রাচীনের পাশাপাশিও নয়, প্রাচীন থেকে দূরেও নয়, প্রাচীনের গর্ভেই তার উদ্ভব হয়। প্রাচীনের গর্ভেই নবীনের জীবাঙ্কুর বা আদিবীজ সাধারণত অঙ্কুরিত হয়, অথবা, তার উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়। বিকাশক্রিয়া যত চলতে থাকে প্রাচীন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে আসে এবং নবীন সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে। এইজন্য নবীন সর্বদাই পুরাতনের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্বের দ্যোতক। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অনস্তিত্বের প্রক্রিয়া বিপরীত শক্তিগুলির সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এই সংঘর্ষে যা নবীন, যা প্রগতিশীল, যা অগ্রগামী, তা পুরাতন ও অচলকে পরাস্ত (বিলোপ) করে। **নবীনের অনিবার্যতা ঐতিহাসিক বিকাশের একটি বিধান।**

সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, তার পত্তনের প্রথম দিন থেকে নূতন সমাজতান্ত্রিক জয়যাত্রার পথে যারা বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রতিটি পদক্ষেপ অগ্রসর হতে হয়েছে। এই সংগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বদাই জয়ী হয়েছে, যেহেতু এর মধ্যে নূতন সম্বন্ধ, প্রগতিশীল এক সামাজিক ব্যবস্থা, রূপায়িত। কিন্তু এর অর্থ যেন মনে করা না হয়, নবীন সর্বদা এবং সহজে পুরাতন অচলকে পরাস্ত করতে পারে। যদি না পারে তার কারণ এই যে, প্রথম অবস্থায় নবীন পুরাতন থেকে দুর্বল থাকে; তখনও পর্যন্ত তা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না, অতএব সময়মত সহায় না পেলে এবং সযত্নে লালিত না হলে তার পরাভবও ঘটতে পারে।

সামাজিক প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির সংগ্রাম সাধারণত পুরাতনের বিরুদ্ধে নবীনের জয়ে পরিণতি লাভ করে। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ও সেকেলে ধারণাগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করেই নবীন আদর্শ জয়লাভ করে। এইসব থেকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে?

ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্রধারার পরিণামফল যদি নূতনের বর্দ্ধন ও জয়লাভ হয়, তাহলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের কর্তব্য হবে, বস্তুজগতে কিসের উদ্ভব হচ্ছে তা লক্ষ্য করা এবং তার জয়ে সহায়তা করা। নবীনের অনিবার্যতা বিষয়ক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি

যা কিছু প্রগতিশীল, যা কিছু উদ্ভূত হচ্ছে ও বিকাশলাভ করছে, তার সপক্ষে সংগ্রাম করার ভরসা পায় এবং তারই সহায়তায় ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি সাবধানী মালীর মত প্রগতিশীল নবোদ্গত অঙ্কুরগুলিকে লালন করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমগ্র ইতিহাস লেনিনের নিম্নোদ্ধৃত নির্দেশের বাস্তব রূপায়ন: "নবাঙ্কুরগুলির প্রতি আমাদের সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে, তাদের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দিতে হবে। তারা যাতে বেড়ে ওঠে, সেইজন্যে সবরকম চেষ্টা করতে হবে। ক্ষীণ দুর্বল চারাগুলিকে সেবায় যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি আমরা পরীক্ষা করলাম। তাদের সারমর্ম বিশদভাবে জানার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের মূল প্রত্যয়গুলি সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার।

অষ্টম কথা

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের মূলপ্রত্যয়গুলি

দার্শনিক মূলপ্রত্যয়

আমরা দেখেছি সাধারণ প্রত্যয় ছাড়া কোন কিছু সম্পর্কে ধারণা করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থবিদরা বিভিন্ন বস্তুর আদিম স্থিতাবস্থা বা গতিসাম্য বজায় রেখে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁরা সেইখানেই থেমে থাকতে পারেন না। অনিবার্যভাবে তাঁদের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়: সব বস্তুতে এই গুণ দেখা দেয় কেন? তাদের সবার মধ্যে সাধারণভাবে আছে, কি সে বস্তু? অতএব প্রতিটি পদার্থের গুণাগুণ বিচার করে পদার্থবিদরা 'জাড্য' নামক সাধারণ প্রত্যয়টি আবিষ্কার করেন। ভর, বা বস্তুসত্তায় জাড্যের মাপ, সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক বস্তুসত্তার ভর পরীক্ষা করলেই চলে না; সাধারণভাবে ভর কি, তার একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা সূত্রাকারে নিবদ্ধ করা দরকার। ঠিক এই ভাবেই পদার্থবিদরা 'শক্তির' সাধারণ প্রত্যয়ে পৌছিয়েছেন। একে সাধারণ প্রত্যয় বলা হয় যেহেতু এর দ্বারা কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট বস্তু সত্তার নয়, শক্তিসমন্বিত যাবতীয় বস্তুসত্তার ও ক্রিয়াকাণ্ডের সার বিশেষত্বগুলির ঘণীভূত রূপ প্রকাশ পায়।

জীববিদ্যাতেও একই ব্যাপার দেখা যায়। মাছ, স্তন্যপায়ী ও অন্যান্য জীব-দেহের বিভিন্ন উপজাতি অনুশীলন করেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না, সাধারণ ভাবে উপজাতি বিষয়ক প্রত্যয়গুলিও তা নির্ধারিত বরে।

মূলপ্রত্যয় সেই প্রত্যয়গুলিকে বলা হয়, যার দ্বারা বস্তুর বা ঘটনাবলীর সর্বসাধারণ লক্ষণ, সম্পর্ক বা দশাগুলি প্রকাশ পায়। বিজ্ঞান মাত্রেরই বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়, মূলপ্রত্যয় থাকে, যেমন জীববিদ্যায় 'উপজাতি' 'বংশগতি' ইত্যাদি, অর্থনীতিতে 'মূল্য' 'শ্রম' ইত্যাদি; রসায়নে 'রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ 'রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

বিশেষ বিজ্ঞানের এই মূলপ্রত্যয়গুলিও কি যথেষ্ট বলে মনে হয়? এই

বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটি তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সাধারণ প্রত্যয়ের অনুশীলন করে। কিন্তু, আমরা আগেও দেখেছি, পদার্থের ও ঘটনাবলীর অনেক সর্বসাধারণ গুণ আছে। কোন বিজ্ঞান এই সাধারণ প্রত্যয়গুলি সূত্রাকারে নিবদ্ধ করে? পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা তা সম্ভব নয়। তার সীমা তার জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ। রসায়ন, জীববিদ্যা, অন্য যে কোন বিজ্ঞান হোক, সবার বেলায় একই কথা বলা চলে।

পদার্থের সর্বসাধারণ গুণাবলী **দার্শনিক মূলপ্রত্যয়ে** বিধৃত হয়, যেমন 'ভৌতিক বস্তু' 'দেশ' 'কাল' 'গুণ' 'পরিমাণ' 'বিরোধ' ইত্যাদি। **সর্বপ্রকার প্রত্যয়ের মধ্যে দার্শনিক মূল্যপ্রত্যয় সর্বাধিক সাধারণ।** তাহলে এই থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পদার্থবিদ্যায় রসায়নে, এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে যে মূলপ্রত্যয়গুলির বিশদরূপ দেওয়া হয়েছে, সেই গুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকা চলে না। দার্শনিক মূলপ্রত্যয়গুলি গড়ে ওঠে ঘটনাবলীর সর্বসাধারণ গুণাবলী জ্ঞানগ্রাহ্য করার প্রয়োজনে।

অন্য সব প্রত্যয়ের মত মূলপ্রত্যয়ও গৌণ, ব্যুৎপন্ন। বস্তুজগতের পদার্থগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে অনুশীলন করতে করতে প্রত্যয়গুলি, সেই সঙ্গে অতি সাধারণ প্রত্যয়গুলি অর্থাৎ দার্শনিক মূলপ্রত্যয়গুলি গড়ে ওঠে। এর থেকেই বোঝা যায়, মূলপ্রত্যয়গুলির উৎস মানব নিরপেক্ষ বাস্তব জগতের বস্তু ও ঘটনাবলী। অতএব মূলপ্রত্যয়গুলির প্রকৃতি বাস্তব।

দার্শনিক মূলপ্রত্যয়গুলি একবার গঠিত হলে পর প্রতিটি বিজ্ঞানের তা পথ নির্দেশক হয়। যেমন, রোগের কারণ অনুসন্ধান করার আগে চিকিৎসককে জানতেই হয় কারণ কি, সেই কারণটি বাস্তব জগতে আছে কি না, ইত্যাদি। সংক্ষেপে 'কারণতা' মূলপ্রত্যয় সম্পর্কে তাঁর পরিচয় থাকা দরকার। কারণ, ভাববাদীদের কথামত, কারণতার বাস্তব অস্তিত্ব যদি নাই থাকে, তবে তার অনুসন্ধান করার এবং তার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

মূলপ্রত্যয়ের গৌণ ও বাস্তব প্রকৃতি সম্পর্কে বস্তুবাদী তত্ত্ব ব্যাবহারিক কর্মক্ষেত্রে নিভু'ল পথনির্দে'শক হিসেবে কাজ করে।

ভাববাদীরা মূলপ্রত্যয়ের যথার্থ তাৎপর্য বিকৃত করে। হেগেলের মত বিষয়মুখ ভাববাদীরা মনে করে যে. ভৌতিক জগতের বহিস্থিত কোন অধ্যাত্ম

শক্তি থেকে মূলপ্রত্যয়গুলির উদ্ভব হয়েছে। অধ্যাত্মশক্তি থেকে উপজাত মূলপ্রত্যয়গুলি বস্তুজগতের 'মাপকাঠি', এই মতবাদ সবকিছু উলটিয়ে দেখে। এই মত অনুযায়ী মূলপ্রত্যয়গুলি বস্তুর গুণাগুণ প্রতিফলিত করে না; অপরপক্ষে, পদার্থসমূহকে তাদের উপযোগী মূলপ্রত্যয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

এদের থেকে আত্মমুখ ভাববাদীদের পার্থক্য এই দিক থেকে যে, তাদের মতে মূলপ্রত্যয়গুলির বাস্তব উপাদান বলতে কিছুই নেই, তারা সম্পূর্ণভাবে মানসিক। কাণ্ট যেমন এই ধারণা পোষণ করতেন যে, জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার পূর্ব থেকেই মূল প্রত্যয়গুলি জ্ঞাতার বা মানুষের চেতনায় অবস্থান করে। একালের ভাববাদীরা এই যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু, আমরা আগেই দেখেছি, এই মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত নয়; মূলপ্রত্যয়গুলি পদার্থসমূহের সাধারণ গুণাবলীর বাহক, মানুষ তাদের অনুশীলন করার আগে থেকেই তারা আছে।

এই আলোচনায় আমরা দ্বন্দ্বসমন্বয়বাদের কয়েকটি মূলপ্রত্যয়ের কথা বলব। অন্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের পরের কথাগুলিতে। এবং যেহেতু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা মুখ্যত একক বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আমরা একক ও সাধারণ মূলপ্রত্যয়গুলি নিয়ে শুরু করছি।

একক-বিশেষ ও সার্বিক

একক এবং সাধারণ বলতে কি বোঝায়?

আমরা যখন বলি 'এই যন্ত্র' 'এই লোক' 'এই গাছ' আমরা তখন একক বস্তুর কথা বলি। কিন্তু যখন সাধারণভাবে বলি 'যন্ত্র' 'মানুষ 'গাছ', আমাদের তখন মনে থাকে ওই ধরণের বস্তুর একটি সম্পূর্ণ বর্গ বা শ্রেণী।

শিশুরা নববর্ষে যে বিশেষ দেবদারু গাছটি সাজিয়েছিল, সেই গাছটি বাস্তবিকই আছে, যে বট গাছটির তলায় আমরা বসেছিলাম, সেই গাছটিও আছে। সেই 'অশোক' গাছটিও আছে, যার শোভায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে কখনো কখনো বলে থাকি 'দবদারু', 'বট 'অশোক'। এই সাধারণ প্রত্যয়গুলি আসছে কোথা থেকে?

আসল কথা হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে। তার ফলে বস্তুর উল্লিখিত গুণাবলী প্রতিফলিত করে এই প্রকার একক পদার্থ সম্পর্কে প্রত্যয় আমাদের মনে উদিত হয়! একেই বলা হয় 'একক' মূলপ্রত্যয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উচ্চতা, গায়ের রঙ, কথাবলার ভঙ্গি ইত্যাদি নানা দিক থেকে রাম

শ্যামের থেকে আলাদা, অর্থাৎ দুজনে এক রকম নয়। এই ভাবে একটা বট গাছ আরেকটি বটগাছ থেকে একটা দেবদারু গাছ তার পাশের দেবদারু গাছ থেকে অনেক ভাবেই পৃথক।

তা সত্ত্বেও, নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, সব দেবদারু গাছের মধ্যে অনেক দিক থেকে মিলও আছে, অনেক জৈব গুণ, যেমন, আকার ইত্যাদি তাদের সবার এক রকম। মানুষ সম্পর্কেও একই কথা সত্য। প্রতিটি ব্যক্তির কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যা শুধু সেই ব্যক্তিরই বিশেষত্ব। তা-ছাড়াও কিন্তু তার এমন লক্ষণও থাকে, যা সব মানুষেরই থাকে, যেমন কাজ করার, চিন্তা করার, কথা বলার ক্ষমতা, আরও অনেক কিছু। এর থেকে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যা একক, তাই আবার সাধারণের সঙ্গে যুক্ত। একটি সরল ব্যক্যেও এই তথ্যটি ধরা পড়ে। আমরা যখন বলি 'এই দেবদারুটি একটি গাছ' 'ববি একটি কুকুর' 'রাম একটি লোক', তার মধ্যে 'এই দেবদারু' 'ববি' 'রাম' একক প্রত্যয়, এবং 'গাছ' কুকুর' 'লোক' সাধারণ প্রত্যয়।

অতএব, বস্তুজগতের কোন একটি মূর্ত বস্তু বা ঘটনাকে একক বলা হয়। তাই সাধারণ যা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট এক বর্গভুক্ত ঘটনাবলী ও বস্তু পুঞ্জের বিশেষত্ব প্রকাশ করে। অতএব একক যে সাধারণ বর্গের অন্তর্ভুক্ত, সেই বর্গের সঙ্গে তা সর্বদা যুক্ত থাকে। যেমন, দেবদারু গাছবর্গের সঙ্গে, রাম মানুষবর্গের সঙ্গে।

এই সাধারণত্ব অনেক প্রকারের হতে পারে। দেবদারু শুধু গাছই নয়, উদ্ভিদও। 'ববি' শুধু কুকুরই নয়, প্রাণীও। এর অর্থ, যে সাধারণত্ব একটা নির্দিষ্ট বটগাছকে অন্যান্য বট গাছের সঙ্গে যুক্ত করে, তা বট নামক "উপজাতি" বলে পরিগণিত হয়। এই মাত্রা পর্যন্ত সাধারণত্বকে "বিশেষ" বলা হয়। এবং যে সাধারণ প্রকৃতির আওতায় সব বট গাছ "গাছ" বর্গের অন্তর্গত হয়ে সাধারণভাবে সব গাছের সঙ্গে মিলিত হয়, তাকে বলা হয় "সার্বিক"। এই অনুযায়ী "ববি" একক, কুকুর বিশেষ, এবং প্রাণী সার্বিক; হাইড্রোজেন একক, গ্যাস বিশেষ এবং রাসায়নিক পদার্থ সার্বিক। অতএব, আমরা এই যোগসূত্রটি পাচ্ছি: একক—বিশেষ—সার্বিক।

এইখানে প্রশ্ন হতে পারে: প্রকৃতিতে কেবল এককের অস্তিত্ব আছে। একক-মূলপ্রত্যয়ে তা প্রকাশ পায়। কিন্তু বস্তুজগতে এমন কিছু কি আছে যার সঙ্গে

সাধারণ মূলপ্রত্যয় তুলনীয়? তা যদি না থাকে, সাধারণ—মূলপ্রত্যয় কি নিছক আমাদের মনের কল্পনা নয়? একক ও সাধারণ এই দুই মূলপ্রত্যয়ের বিষয় উপস্থাপিত করার মধ্যেই যে সমস্যা নিহিত আছে, এই প্রশ্ন সঠিকভাবে তাই নির্দেশ করে। তাত্ত্বিক দার্শনিকেরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেন নি, তাঁরা সাধারণ থেকে একককে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। আসলে কিন্তু একক ও সাধারণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটি দ্বন্দ্বসমন্বয়ী যোগসূত্র থাকে। অতএব এই যোগসূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা থেকেই এর উত্তর বোঝা সম্ভব। এই যোগসূত্র কিসে গঠিত?

সাধারণ ও এককের দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্ব

যা একক, যা স্বতন্ত্র, তা সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় টিকে থাকে না। যেমন, একটি স্বতন্ত্র বটগাছের এমন কতকগুলি সারাত্মক গুণাবলী আছে যা সাধারণভাবে সব গাছেরই বিশেষত্ব। অতএব এর দ্বারা এককের সঙ্গে সাধারণের অবিভাজ্য একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; একক মাত্রই কোন না কোন প্রকারে সাধারণ, এবং সাধারণমাত্রই এককে বিদ্যমান। "অন দি কোয়েস্চন্ অফ্ ডায়ালেক্‌টিক্‌স্" গ্রন্থে লেনিন লিখেছেন: "বিপরীতগুলি (বিপরীত সম্বন্ধযুক্ত একক ও সাধারণ) অভিন্ন; একক টিকে থাকে কেবল সেই যোগসূত্রে যার পরিণামে সাধারণ। সাধারণ টিকে থাকে কেবলমাত্র এককে, এককের মধ্যে দিয়েই তার অস্তিত্ব।" ১

এই উপায়ে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ একক ও সাধারণের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যা সমাধান করে।

ভাববাদীরা এই সমস্যার অন্যভাবে সমাধান করে। তারা স্বতন্ত্র ও সাধারণের দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বকে বিকৃত করে। যেমন, প্লেটোর মতে "সাধারণ" অর্থাৎ "আদিভাব" বিশেষের আগে থেকে, বাস্তব পদার্থের আগে থেকেই ছিল। এই একই মত পোষণ করেছেন হেগেল ও অন্যান্য বিষয়মুখ ভাববাদীরা। কিন্তু আমরা দেখেছি, তা ঠিক নয়। যেহেতু সব গোলাপে এমন সাধারণ কিছু আছে যা তাদের গোলাপে পরিণত করে, একমাত্র এই কারণেই আমরা তাদের "ফুল" নামক সাধারণ প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করি। স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, বস্তু জগতে এই রকম

---

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স**, খণ্ড ৩৮ পৃ ৩৬১

যদি না ঘটত, সাধারণ প্রত্যয়ের অস্তিত্বই থাকত না। সাধারণের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র পদার্থসমূহের মধ্যেই। আমাদের মন তা অবধারণ করে মাত্র, সৃষ্টি করে না। বাস্তব জগতে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তার বাইরে কোন প্রাণীর বা উদ্ভিদের উপজাতি নেই। ফলত, সাধারণ প্রাথমিক হতে পারে না। তা আমাদের মনগড়াও হতে পারে না, দেখতেই পাচ্ছেন! বস্তু জগতেই সাধারণের অস্তিত্ব, নিজস্ব সত্তায়, পদার্থ থেকে পৃথকভাবে তা থাকে না, পদার্থ ও ঘটনাপুঞ্জের পরিদৃশ্যমান গুণাবলীর মধ্যেই তা বিদ্যমান থাকে। অতএব, **সাধারণ আমাদের চেতনায় বিধৃত হয়, চেতনার দ্বারা সৃষ্ট হয় না।**

তাহলে একক ও সাধারণ, এই প্রত্যয় দুটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একক তার নিজের মধ্যেই সাধারণকে ধারণ করে এবং সাধারণ একমাত্র এককের (স্বতন্ত্রের) মধ্যে এবং তার মারফৎ টিকে থাকে। ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে,

এই মূলপ্রত্যয়গুলির ব্যবহারিক গুরুত্ব

বিশেষতঃ সংশোধনবাদ ও নির্বিচার মতান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, এই প্রতিজ্ঞাটির গুরুত্ব অত্যধিক। ব্যবহারিক সমস্যাসমূহের সমাধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক ও সাধারণ, এই মূলপ্রত্যয়গুলির বিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত। বিশেষত বৈজ্ঞানিক সূত্রের মত সাধারণ প্রত্যয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার সময় এই কথা সর্বাগ্রে গ্রাহ্য।

পদার্থ ও ঘটনাবলীর মূর্ত ও একক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির ও সামাজিক জীবনের সূত্রগুলি রূপায়িত হয়। প্রকৃতিতে "সাধারণভাবে প্রযোজ্য নিয়ম" বলে কিছু নেই। সেই সঙ্গে আমাদের চতুর্পার্শ্বস্থ জগতে সামাজিক ঘটনা সমেত যে সব স্বতন্ত্র বস্তু ও প্রক্রিয়া রয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যও অসংখ্য। যে অবস্থায় তাদের উদ্ভব হয়েছে, তারই দরুণ তাদের নির্দিষ্ট ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। অতএব, ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ঘটনাবলী এবং সেই সঙ্গে যে অবস্থায় সেই সব ঘটনা ঘটছে তা প্রত্যক্ষভাবে অনুশীলন করার গুরুত্ব অত্যধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অক্টোবর সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রেণীশক্তিগুলির বিন্যাস এবং লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকৌশল ভালো করে বুঝতে হলে বিশ শতকের প্রারম্ভে, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে ও শরতে রাশিয়ায় প্রত্যক্ষত যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার বিশদ বিশ্লেষণ দরকার।

বিপ্লব কি এবং বিপ্লব কত প্রকার এই ধরণের সাধারণ প্রতিজ্ঞার জ্ঞান কোন একটি বিশেষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিজয়ের পথে সংগঠিত করার পক্ষে

যথেষ্ট নয়। অতএব একক ও সাধারণের মধ্যে পরস্পরিক যোগসূত্রটি সঠিক-ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রশ্ন করতে পারেন: সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ সূত্রগুলি অনুশীলন করার কি দরকার? আমাদের ঔৎসুক্য যে সব প্রত্যক্ষ অবস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে, শুধুমাত্র সেইগুলির অনুশীলন করলে কি আরও ভালো হয় না? এই প্রকার যুক্তি মোটেই ঠিক নয়।

আপনাদের মনে আছে, বস্তুত একক সাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং সাধারণ এককের সারাংশ প্রকাশ করে। অতএব সাধারণ সূত্রগুলি অনুশীলন করার প্রয়োজন আছে, যেহেতু তাদের সহায়তায় এক বর্গভুক্ত সমুদয় ঘটনাপুঞ্জের বিশিষ্ট প্রক্রিয়া ও গুণাবলী বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্রবিষয়ক জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানুষ কয়েক পুরুষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। সেই সূত্রগুলিকে প্রতিবার নূতন করে "আবিষ্কার" করতে হয় না। যেমন, বিপ্লবের সাধারণ সূত্রগুলি যদি জানা থাকে প্রতিবার সেইগুলিকে নূতন করে "আবিষ্কার" করার প্রয়োজন হয় না, বাস্তব অবস্থা বুঝে সেইগুলি শুধু প্রয়োগ করলেই হয়।

যা বলা হল, তার থেকেই বুঝতে পারছেন, ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ সূত্রগুলি দ্বারা চালিত হলেই চলে না; স্বতন্ত্র ঘটনাবলী যে অবস্থার মধ্য থেকে বিকাশ লাভ করছে, তা অগ্রাহ্য করে সাধারণ সূত্রগুলি প্রয়োগ করলে কোন লাভ নেই। ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে কেবল মাত্র একক ও সাধারণের দ্বন্দ্ব সমন্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা সঠিক পথনির্দেশ করতে পারে। অতএব, কোন একটি দেশের স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্পর্কে ভিত্তিহীন অতিরঞ্জন (সংশোধনবাদীরা যা করে থাকেন) এবং সাধারণ সূত্রগুলিকে দেশকালাতীত স্বয়ম্ভু বলে প্রতিপাদন (নির্বিচার মতান্ধদের যা বিশেষত্ব)—উভয়ই মার্কসবাদের বিকৃতি।

সাধারণ ও এককের মধ্যে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী সম্পর্কের প্রশ্ন এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন করার সংগ্রামে তার ব্যবহারিক তাৎপর্য ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিস্-এর সভায় গৃহীত দলিলগুলিতে এবং সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে গৃহীত নীতিগত দলীলগুলিতে একটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। এব দলিলগুলিতে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব হয় একমাত্র সেই সূত্রগুলির

কার্যকারিতার মধ্যে দিয়ে, যেগুলি সব দেশেই সমান প্রযোজ্য। সেই সূত্রগুলি এই :

কৃষক শ্রেণীর বৃহদংশের এবং মেহনতী মানুষের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর যোগসাধন ;

পুঁজিবাদী মালিকানার বিলোপসাধন এবং উৎপাদনের মূল উপকরণগুলির উপর সর্বজনীন মালিকানা প্রতিষ্ঠা ;

ক্রমিক পদ্ধতিতে কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ ;

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনীতির বিকাশ ;

ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন এবং শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী জনসাধারণের প্রতি ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ বৃহৎ সংখ্যক এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠন।

জাতিগত নিপীড়ন দূরীকরণ এবং জাতিতে জাতিতে সাম্যের ও সৌভ্রাত্র-মূলক বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন ;

বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরিক শত্রুর আক্রমণ থেকে সমাজতন্ত্রের জয়াভিযানকে সংরক্ষা ;

এক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি, অর্থাৎ প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন পুঁজিবাদী সমাজের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেই সময়ে সব দেশেই এই সাধারণ সূত্রগুলি কার্যকর হয়। প্রত্যেক দেশে অবশ্য সেই দেশের ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সূত্রগুলি বিশিষ্টভাবে সক্রিয় হয়। কোন নির্দিষ্ট দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গঠনের সাধারণ নীতিগুলি কোন বিশেষ রূপে ও পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হবে, তা সেই দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; অতএব এই ভাবেই সাধারণ ও স্বতন্ত্রের মধ্যে যোগ প্রকট হয়।

কমিউনিষ্ট ও ওয়াকার্স পার্টিস' এর সভায় (১৯৬০) গৃহীত বিবৃতিতে এই-কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশে কার্যত সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি। অন্যান্য ভ্রাতৃত্ব পার্টি-গুলি এই অভিজ্ঞতার ব্যাপার অনুশীলন করে এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ করা এবং তার ফলে অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশ-ধারার অপরিবর্তনীয় বিধান।

সাধারণ সূত্রগুলি (সাধারণ বিষয়ক) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব কারণিক সম্বন্ধগুলি অনুশীলন করার মধ্যে দিয়ে।

কারণ এবং পরিণাম

আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা জানেন, কোন ঘটনাই 'স্বয়ম্ভু' নয়। বিনা কারণে কিছুই হয় না। ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনাটিরই বিগত বিকাশধারা থেকে কিংবা অন্যান্য ঘটনার প্রভাবে। শূন্য থেকে শূন্যেরই উদ্ভব হয়। প্রত্যেক ঘটনারই উৎস আছে, যেখান থেকে তার উদ্ভব হয়। এই উৎসকে 'কারণ' বলা হয়। **কারণ এমন কিছু, যা অন্য কোন ঘটনা সৃষ্টি করে, উৎপন্ন করে বা উদ্রেক করে। কারণের ক্রিয়ার ফলে যার উদ্ভব হয় তাকে ফল বা পরিণাম বলা হয়।**

অতএব, '**কারণ ও পরিণামরূপ দার্শনিক মূল্যপ্রত্যয়গুলি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি যোগসূত্র নির্দেশ করে। তার দ্বারা কারণ নামক একটী ঘটনা অনিবার্যভাবে পরিণাম নামক একটী ঘটনার উদ্রেক করে এবং এই পারস্পরিক যোগকে কারণিক যোগ বলা হয়।**

জলীয় বাষ্পের ধাক্কায় টারবাইনের ব্লেডগুলো যখন ঘুরতে থাকে, সেই সময় বাষ্পশক্তি ও টারবাইনের মধ্যে সঞ্জাত যোগ আমাদের চেতনা ছাড়াই টিকে থাকে। বস্তুজগতে, প্রকৃতিতে তা বিদ্যমান। এই ধরণের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, প্রতিটি কারণিক যোগ যথার্থ বাস্তব পদার্থ সঞ্জাত। অতএব, **কারণিক যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তার বাস্তব প্রকৃতি।**

কারণতার প্রধান প্রধান লক্ষণ

ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কসের পূর্ববর্তী বস্তুবাদী দার্শনিকেরা, যেমন, প্রাচীন গ্রীসের ডিমক্রিটাস, প্রাচীন চীনের ওয়াং চুং এবং পরবর্তী কালের স্পিনোজা, হবস্ এবং চেরনিশেভস্কী কারণতার বাস্তব প্রকৃতি বিষয়ক ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বময় কার্য-কারণিক নির্ভরতা বিষয়ক প্রধান বস্তুবাদী তত্ত্বটি সমর্থন করেন।

যাঁরা এই মত পোষণ করেন যে, সমাজে ও প্রকৃতিতে ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বময়

কার্যকারণ নির্ভরতা বিদ্যমান, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানবস্বতন্ত্র এমন একটি প্রয়োজনের অস্তিত্ব আছে যা বাস্তব ও নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, তাঁদের বলা হয় **নির্ধারণবাদী**। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাবলীর অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় কোন না কোন কারণের কার্য হিসাবে, প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রিয়াফলরূপে। এ জগতে যা কিছু ঘটছে তাই প্রয়োজনীয়, কারণ তা, এই দার্শনিকদের মতে, পূর্বনির্ধারিত।

দর্শনের সারা ইতিহাস জুড়ে নির্ধারণবাদীরা ভাববাদীদের কারণতার অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে **অনির্দেশ্যবাদের** বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন বিশ্বাসের ও প্রবণতার ভাববাদীদের প্রারম্ভিক বক্তব্যই এই যে, মানুষ তার 'সুবিধার জন্য' তার 'চিন্তার মিতব্যয়িতার জন্য' 'প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিশৃঙ্খলার' মধ্যে শৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্য, কারণতার মূল্যপ্রত্যয় সৃষ্টি করেছে। এইভাবে আত্মমুখ ভাববাদী বার্কলে কারণতার ধারণাটাই অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। হিউম ও কাণ্টও কার্যত তাই করতে চেয়েছেন। উভয়েই কারণতার বাস্তব অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন।

কারণতার প্রকৃতি যে জ্ঞাতৃগত, এই তত্ত্বকে নিম্নরূপ যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। হিউমের কথায় "একটি জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় যতবার হাত দেওয়া যায় ততবারই হাত পোড়ে। কিন্তু এর থেকে একথা বলা চলে না যে, ভবিষ্যতেও প্রদীপশিখায় অবধারিতভাবে হাত পুড়বে। এক লক্ষ বার এই রকম ঘটেছে। ঠিকই, কিন্তু এক লক্ষ এক বারের বার অন্য রকম হতে পারে। যেহেতু জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে অদ্যাবধি পোড়া ঘটনাটা ঘটেছে, তার অর্থ এ নয় যে, আগের ঘটনা পরেরটির কারণ।"

এঁদের মতে এই দুটি ঘটনা—জ্বলন্ত প্রদীপ এবং পুড়ে যাওয়া-পাশাপাশি শুধু আছে কিন্তু এই থেকে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। হিউম স্পষ্টতই ঠিক বলেন নি। আমরা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কারণের বিচার করিনা। পরীক্ষার ভিত্তিতে, প্রয়োগের ভিত্তিতে, আমরা তার অনুশীলন করি। তার ফলে, **কেন** তা এইরকম, আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে যেমন, একটা জ্বলন্ত আগুন অনিবার্যভাবে দাহন করে। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণিক নির্ভরতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগের প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকেরা—ম্যাকপন্থীরা ও তাঁদের অনুবর্তীরা—কারণতাকে কান্ট-হিউমপন্থীরা যেভাবে দেখেছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুনরুজ্জীবিত করেন। একালের প্রয়োগবাদীরা দর্শনে ম্যাকবাদী পন্থার অনুবর্তী। তারা বহির্জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং সেইসঙ্গে কারণিক সম্পর্কের বাস্তবতাকেও।

আধুনিক "ভৌত ভাববাদীরা"ও কারণতাকে স্বীকার করে না। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভের্নর হাইজেনবর্গ, নিলস্ বোহর্, পাসকুয়েল জর্ডন-এর মত পদার্থবিদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম জার্মানীর পদার্থবিদ গোরহার্ড হেনেমান লিখছেন: "কার্যকারণ নিয়মের সনাতন সূত্র সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।"

প্রশ্ন করতে পারেন: বুর্জোয়া দার্শনিকেরা কিসের জন্যে কারণতার বস্তুবাদী নীতিকে আক্রমণ করেন? কারণ, এর থেকে এমন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, যা বিজ্ঞানসম্মত ও অনীশ্বরবাদী। যদি জগতে সব কিছুই প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত হয়, তাহলে এখানে ভগবানের করার কিছুই থাকে না। তাহলে, যা কিছু ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে না, সঙ্গত কারণ থেকেই ঘটে। লেনিন বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন যে, ভাববাদীরা বিজ্ঞানের বিধানকে অস্বীকার করে, যেহেতু তার দ্বারা ধর্মের বিধানকে সহজে টেনে আনা যায়।

কারণতার পরবর্তী লক্ষণ এর বিশ্বজনীন প্রকৃতি। কারণতার নিয়ম বাস্তবজগতের সর্বমন নিয়ম। এর অর্থ এমন কোন ঘটনা নেই, যা এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয়, এই নিয়ম বহির্ভূত, সঙ্গত বাস্তব উৎস ব্যতিরেকে যা হতে পারে। আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, কারণতার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। যদি কোন কিছু ঘটে থাকে তার কারণ অনুসন্ধান করুন; বিনা কারণে জগতে কিছুই ঘটে না। এই অভিজ্ঞতাই আমরা প্রবাদ আকারে বলি, "আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না," "সামান্য ব্রণেরও কারণ আছে।"

ব্যবহারিক জীবনে আমরা সর্বদা ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি। মনে করুন, উৎপাদনের মান যদি মারাত্মকভাবে পড়ে যায়, আমরা তার কারণ জানতে চেষ্টা করি। কারণটা দূর করে উৎপাদনের অপকর্ষ রোধ করি।

কার্যকারণ সম্পর্কের প্রকৃতি থেকেই তার নিম্নলিখিত লক্ষণটি দেখা দেয়: **কারণ মাত্রই সক্রিয়**। আগে যা বলা হল, তার থেকে এ কথা সহজেই বোঝা যায়: যেহেতু কারণ থেকে পরিণাম **উৎপন্ন** হয়, কারণ তাই সক্রিয়

সত্তার মত আচরণ করে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পরিণাম নিষ্ক্রিয় এবং নির্দিষ্ট বিকাশধারায় বা প্রক্রিয়ায় তার কোন অংশ নেই। যদি সৌর তেজ অর্থাৎ তাপ কোন ভিজে কাপড়ের উপর ক্রিয়া করে, কাপড়টা তাহলে শুকিয়ে যায়। এই তেজ যদি এক টুকরো মোমের উপর পড়ে, তার ফল হয় অন্যরূপ ; মোমটা গলে যায়। আবার সৌরতেজ কোন উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া করলে, ফল হয় অন্যরকম ; এই তেজ প্রভাবে উদ্ভিদের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হয়। অতএব অন্য সব পদার্থ ও ঘটনাবলীর সম্বন্ধেই একটি কারণের একটি বিশেষ পরিণাম হয়। সেইজন্যই আমরা কারণিক যোগের কথা, কারণিক সম্বন্ধের কথা বলি।

জগতে অসংখ্য কারণিক যোগের উদ্ভব হচ্ছে, কিন্তু তারা সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান ও মুখ্য, প্রথমে সেইগুলিকেই বেছে নেওয়া দরকার।

উৎপাদনের মান পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কি কারণে পড়ে যাচ্ছে আমাদের সন্ধান করে দেখতে হবে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যেহেতু অনেক সম্বন্ধ ও যোগাযোগ জড়িত থাকে, সাধারণত এর কারণ অনেক। তবু কিন্তু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, কয়েকটি কারণ প্রধান ও মুখ্য, অর্থাৎ সেই কারণগুলি অন্যান্য কারণ নির্ধারণ করে। আমরা যে দৃষ্টান্তটি নিয়েছি সেই ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হতে পারে শ্রমিক নিষ্ঠার ও প্রযুক্তিগত কৌশলের অবনতি, কিংবা কাজে ছান্দিক নিয়মের অভাব। বস্তুতপক্ষে এইগুলিই আর সব কারণকে নির্ধারিত করে ; যেমন, যেখানে শ্রমিকদের নিয়মনিষ্ঠা নিম্নমানের, সেখানে অপচয়ও ঘটে বেশি। বেতালা কাজও অনেক ত্রুটির কারণ

মুখ্য কারণটা খুঁজে বার করা বিশেষ দরকার। মুখ্য বলেই তারপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিণামের উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। কিন্তু এই উক্তির যেন এই অর্থ করা না হয় যে, প্রধান কারণ ছাড়া আর সব কারণকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

যেহেতু কারণ থেকে পরিণামের উদ্ভব, সেইহেতু তাদের মধ্যে সবিশেষ কারণ ও পরিণামের যোগও বিদ্যমান। তত্ত্বজ্ঞানীরা কিন্তু এই যোগসূত্রের একটা মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া দিক-মাত্র দেখে থাকে, তারা দেখে শুধু পরিণামের উপর কারণের কার্য। কিন্তু পরিণাম কি কারণকে প্রভাবিত করে? তত্ত্বজ্ঞানীরা

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না, যেহেতু তারা কারণ ও পরিণাম, এই বৈপরীত্য দুটিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে।

একটি বিশেষ ঘটনা, হয় কারণ, নয়ত পরিণাম, এই তাদের যুক্তি। যদি তা একটা হয়, আরেকটা কিছুতেই হতে পারে না। এঙ্গেলস একথা এই বলে বুঝিয়েছিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীরা কারণটা দেখে এখানে, পরিণামটা দেখে ওখানে, তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক যোগসূত্র, দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ঐক্যসূত্রটি তাদের নজরে পড়ে না।

তত্ত্বজ্ঞানীরা ভুল করে। কারণ ও পরিণামের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া চলে। একটা উদাহরণ থেকে এই ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হবে। আমরা চতুর্থ কথায় দেখেছি, ভৌতিক বস্তু ও সত্তা থেকে চেতনার উদ্ভব হয়, আবার চেতনা সত্তাকে প্রভাবিত করে, সক্রিয়ভাবে তার উপর ক্রিয়া করে। অতএব, **কারণ ও পরিণামের পারস্পরিক নির্ভরতায়, একের অন্যের উপর প্রভাবে, এই পারস্পরিক ক্রিয়া গঠিত।**

প্রশ্ন করতে পারেন, "কিন্তু এর থেকে কি বোঝায় না যে, কারণ ও তার পরিণাম পরস্পরকে সমান মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে?" অবশ্যই নয়, যেহেতু কারণ কারণিক যোগাযোগে সর্বদা চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করে। কারণ কারণিক যোগের নির্ণায়ক, পরিণামের অংশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার স্থান গৌণ। একটি নির্দিষ্ট কারণিক যোগে কোনটি কারণ, কোনটি পরিণাম, এটি নির্বিকার থাকার বিষয় বিষয় নয়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, চেতনা জড়বস্তু নির্ণয় করে, না, জড়বস্তু চেতনা নির্ণয় করে, বিজ্ঞানের কাছে এটি নির্বিকার থাকার বিষয় নয়। এই ক্ষেত্রেও, এর অর্থ এই নয় যে, কারণের উপর পরিণামের প্রভাব অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

আগে যা বলা হল তা ছাড়া পারস্পরিক-ক্রিয়া-প্রত্যয়টির একটি দ্বিতীয় অর্থ আছে। পরের দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। ডায়নামো থেকে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়, তার কারণ চক্রাবর্তনজনিত যান্ত্রিক শক্তি! এই যান্ত্রিক শক্তিই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই যান্ত্রিক শক্তিরও কারণ আছে। তার কারণ, হয়ত বা, জলপাতনের বল। অতএব, চক্রাবর্তনজনিত যান্ত্রিক শক্তি একক্ষেত্রে কারণ, অন্যক্ষেত্রে অপর একটি কারণের—জলপাতনজনিত বলের—পরিণাম। কিন্তু জলপাতন জনিত বল, যা এক্ষেত্রে কারণ বলে প্রতীত হচ্ছে, তা নিজেই আবার পরিণাম। জল প্রাকৃতিক বিবর্তন চক্রের

ফল। তার দরুণ যে নদীতে চক্রযন্ত্রটি লাগানো আছে, সেই নদীতে জলের নির্দিষ্ট স্তর ঠিক থাকে এবং এই প্রকার অনুকূল আরও অনেক ঘটনা ঘটে।

যদি কারণিক সম্বন্ধের এই ধারাটি পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, এর অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী বিচ্ছিন্ন নয়। তারা একে অন্যের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিটি কারণকে, প্রতিটি পরিণামকে দেখা দরকার বিচ্ছিন্নভাবে নয়, দেখা দরকার যে ঘটনাচক্রে তার উৎপত্তি হয়েছে, অথবা এরদ্বারা যে ঘটনাচক্র উৎপন্ন হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত করে। একই বস্তু বা প্রক্রিয়া একই কালে কারণ ও পরিণাম। এই দিক থেকে দেখলে কারণ ও পরিণাম অসম্পর্কিত বিপরীত সত্তা নয়। পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বস্তু ও ঘটনাবলীর এক জটিল পরম্পরায় তারা গ্রথিত। এঙ্গেলসের কথায় বলতে হলে, জগৎময় পারস্পরিক ক্রিয়া বিদ্যমান, এই ক্রিয়ার কারণ ও পরিণাম ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে; যা এখানে এই মুহূর্তে কারণ বলে প্রতীত হচ্ছে, তাই ওখানে পরমুহূর্তে পরিণাম হয়ে দাড়াচ্ছে এবং বিপরীত ঘটনাও ঘটছে।

নানা প্রকার কুসংস্কার খণ্ডন করার জন্যেও কারণতার মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের গুরুত্ব অত্যধিক।

কারণতা কুসংস্কার খণ্ডন করে

যেহেতু একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার আগে ঘটে, এ কথা যেন কখনই মনে করা না হয় যে, আগেরটি পরেরটির কারণ। অথচ এটা একটি সাধারণ ভুল।

কুসংস্কার মাত্রই এইরকম ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাইরের নিদর্শন থেকে কুসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুটো ঘটনাকে কারণিক যোগে যুক্ত করে কেবলমাত্র এই যুক্তিতে যে, তাদের মধ্যে কোন প্রকার কালগত যোগ আছে। যদি কেউ পথ চলতে একটা কালো বিড়ালকে রাস্তা পার হয়ে যেতে দেখে এবং পরে সে দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিড়ালটাই দুর্ভাগ্যের কারণ। যেহেতু শেষের ঘটনাটি বিড়ালের আবির্ভাবের **পরে** ঘটেছে, সেটি বিড়াল আবির্ভাবের পরিণামফল বলে ধরা হয়, যদিও এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোন গভীর আভ্যন্তরিক যোগ নেই, যে যোগ আছে তা শুধু সময়ের পরম্পরাগত। এইভাবে কুসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিরা এমন সব ঘটনার মধ্যে কারণিক যোগ আবিষ্কার করে যেখানে সেরকম কিছুই নেই।

চেরনিশেভস্কি ইতিহাস থেকে নিচের এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন: "পাখীর ওড়া

দেখে সেকালের রোমানরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করত তার সারার্থ কি? কোন একবার যুদ্ধের আগে হয়ত তারা ডান দিক থেকে একটা দাঁড়কাকের ডাক শুনতে পেয়েছিল এবং সেবার তারা যুদ্ধে হেরে যায়ঃ আরেকবার তারা বাঁ দিক থেকে দাঁড়কাকের ডাক শুনতে পায়, সেবারে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে। ব্যাপারটা অতঃপর একেবারে প্রাঞ্জল হয়ে গেল—এদের মধ্যে কারণিক যোগ আছে। এই থেকে ডানদিকে দাঁড়কাকের ডাক মানে বিপদ, বাঁদিকে ডাক মানে জয়লাভ।

সব কুসংস্কারেরই ভিত্তি এই ধরণের যুক্তি।"

মাত্র তখনই মানুষ ভয় থেকে এবং সেই সঙ্গে কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয় যখন সে ঘটনার প্রকৃত কারণটি আপাত কারণ থেকে আলাদা করে বুঝতে পারে। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এককালে আফ্রিকায় ভ্রমণকারীরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলত যে, তারা "আকাশে" স্বর্গের প্রকাণ্ড নন্দন কানন দেখতে পেয়েছে। কখনও তারা বলত যে, তারা আকাশে নাবিকসমেত এক বায়বীয় জাহাজ দেখতে পেয়েছে। পরে এগুলি মিলিয়ে যেত। কি করে এগুলি হত? যতদিন কারণটা জানা ছিল না নানাধরনের অপব্যাখ্যা চলত। পরে এ স্বাভাবিক ঘটনাগুলোর কারণ আবিষ্কৃত হল। দেখা গেল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়া যখন শান্ত থাকে, বাতাস তখন খুব ঘন হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তা যেন একটা প্রকাণ্ড আয়নার রূপ গ্রহণ করে। এই "আয়নায়" সমুদ্রের ও ভূমির নানা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন, জাহাজ, বাগান, ইত্যাদি। অতএব লোকেরা যে বাগান দেখত তা স্বর্গের নন্দনকানন নয়, পৃথিবীতে বাস্তবিক আছে এমন বাগানেরই প্রতিবিম্ব; যে জাহাজ দেখত তা বায়বীয় নয়, জলে ভাসমান জাহাজের প্রতিবিম্ব। এই সব ঘটনার কারণটা আবিষ্কার করার পর আর কিছুরই দরকার হল না। তাদের সম্বন্ধে কুসংস্কারজনিত ভয় সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তাহলে, কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে।

কারণের অনুশীলন থেকে আমরা প্রকৃতির অন্যতম অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঘটনাকে বুঝতে পারি—তা হচ্ছে তার উদ্দেশ্যপ্রবণতা।

কারণতা ও উদ্দেশ্যপ্রবণতা

আমাদের চারদিককার জগতে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেই সহজে যেটা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও সমীকরণ। পৃথিবীকে সুনিয়ন্ত্রিত একটি জীবদেহের সঙ্গে

তুলনা করা হয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জৈবজগতের উদ্দেশ্য-প্রবণতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। অনেক ফুল সকালে ফোটে। এইটি উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা, কারণ কীটপতঙ্গ সারাদিনে ফুলের রেণু ও মধু সংগ্রহ করে। ভোরের একটু আগে থেকে ফুলের পাপড়ি খুলতে থাকে, যেন তারা "জানতে পায়" সূর্যোদয়ের বেশি দেরি নেই। মনে হয় যেন, উদ্ভিদের সময়ের "স্মৃতি" থাকে। এমনকি কিছুকালের জন্যে যদি তাদের অন্ধকারে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহলেও দেখা যায়, সন্ধ্যাগমে তাদের পাপড়ি মুদে আসে এবং সকালে তা খুলে যায়। ফুলেরা যেন জানে কখন সূর্যোদয় হয়।

প্রকৃতির উদ্দেশ্যপ্রবণতা, তার "যৌক্তিক" চরিত্র আরও বেশি বোঝা যায় পরিবেশের সঙ্গে, জীবনের অবস্থার সঙ্গে, প্রাণীর ও উদ্ভিদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতায়। পাখীরা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় হাওয়ায় ওড়ে এবং তাদের দৈহিক গঠনও সেই উদ্দেশ্য-উপযোগী। মনে হয় যেন প্রকৃতি তাদের দেহটাকে এমনভাবে দেহাবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে গঠন করেছে, যাতে তাদের দেহের ওজন অত্যন্ত কম থাকে অথচ শীতের কবল থেকে ভালোমত মুক্ত থাকতে পারে। পাখীদের সম্পূর্ণ দেহগঠন এমনভাবে গঠিত, যাতে তাদের হাওয়ায় ওড়ার সুবিধা হয়।

প্রকৃতির উদ্দেশ্যপ্রবণতা সম্পর্কে আমরা কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। এই ব্যাপারটা এমনই স্পষ্ট যে লোকের নজরে না পড়ে পারে না। সেইজন্যে অনাদি কাল থেকে মানুষের মনে এই প্রশ্ন, এইপ্রকার অত্যদ্ভুত ঘটনাবলী কি প্রকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এই সবের কারণ কি?

প্রকৃতির সর্বত্র উদ্দেশ্যপ্রবণতার ও নিয়মশৃঙ্খলার নানা তথ্য ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়ে ভাববাদীরা এবং গীর্জার মোহান্তরা এই মত ঘোষণা করে যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি ও বিকাশ বাস্তব কারণসম্ভূত বা প্রাকৃতিক নিয়মনিয়ন্ত্রিত নয়, তারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তারা যে লক্ষ্যের অনুসরণ করছে এবং যা তাদের বিধিলিপি, তাদের অস্তিত্বের যা উদ্দেশ্য, তার দ্বারা।

এই মতবাদকে বলা হয় 'টেলিওলজিকাল' বা ইষ্টহেতুবাদী (ইংরেজী 'টেলিওলজিকাল' শব্দটি গ্রীক 'টেলস' থেকে নেওয়া, যার অর্থ হেতু)

এই থেকে ধর্মমোহান্তরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন। যেখানে

সুশৃঙ্খলা আছে,- যেখানে নির্দিষ্ট পন্থায় কোন উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে, তার পিছনে নিশ্চয় বিচারবুদ্ধি ও মন আছে। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে বাস্তবিক সুশৃঙ্খলা ও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন প্রকটিত। অতএব, ঈশ্বর নামে একটি পরম মন—এক "ঐন্দ্রজালিক স্রষ্টা"—প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলেছে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মকাণ্ড এবং তার বিচারবুদ্ধি এক সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ফলেই সম্ভব। এই প্রকাণ্ড জাগতিক যন্ত্রটি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি "শ্রেষ্ঠ যন্ত্রকুশলী"। এঙ্গেলস্ এই ধরণের যুক্তিকে পরিহাস করে মন্তব্য করেন যে, ইষ্টহেতুবাদীদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে "বিড়াল সৃষ্টি হয়েছিল ইঁদুর ভক্ষণ করার জন্য, ইঁদুর সৃষ্টি হয়েছিল বিড়ালের খাদ্য হবার জন্য এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল স্রষ্টার জ্ঞান প্রমাণ করার জন্য।"

এই জগতের গঠনে যে যৌক্তিকতা পরিদৃশ্যমান, তাই থেকে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞরা সেই "পরম হেতুশক্তিকে" বিচার করেন, যা এই জগতকে "সৃষ্টি করেছে"। আজও পর্যন্ত ভাববাদীরা ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞরা এই ধরণের "প্রমাণ" পেশ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, **এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা** এ বিষয়ে কি বলে তা নিচে উদ্ধৃত করা গেলঃ "প্রাণময় যাবতীয় পদার্থের মধ্যে যে উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে তা পর্যালোচনা করলে এ ধারনা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয় যে, তারা কোন রচয়িতার দ্বারা রচিত হয়নি।"১

প্রথমত, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোন একটি বিশেষ ঘটনা কি লক্ষ্য সাধনের জন্য উদ্ভূত হয়েছে তাই নিয়ে আমরা যতই মাথা ঘামাই না না কেন, আমরা তার স্বরূপ আবিষ্কারে এক পাও অগ্রসর হতে পারব না। কোন ঘটনাকে জানতে হলে, যে যে **কারণের** ফলে তার উদ্ভব, যার থেকে তার **উৎপত্তি** এবং যার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত, এইগুলি আমাদের জানতেই হবে। **কেন কোন কোন কারণে** প্রাকৃতিক জগতে অত্যাশ্চর্য এই উদ্দেশ্যনিষ্ঠা— শুধুমাত্র এই প্রশ্ন করেই আমরা জাগতিক ঘটনাবলীর স্বরূপ বুঝতে পারি। ইষ্টহেতুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর এই ধরণের বিজ্ঞানসম্মত কারণিক ব্যাখ্যার প্রতিবাদী।

জাগতিক ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত আসল ও বাস্তব কারণগুলি একবার আবিষ্কার করা গেলে, তারা অবিসংবাদিতভাবে এই প্রমাণ করে যে, **প্রকৃতিতে**

১। খণ্ড ১৮, পৃঃ ১৮৪

রহস্যঘন গোপন কোন লক্ষ্য, কোন ঐশ্বরিক অভীপ্সা কিংবা কোন পরম মানসশক্তির অস্তিত্ব নেই।

এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হচ্ছে। সম্ভবত লক্ষ্য করে দেখেছেন, গ্রীষ্মকালে ভিজে নুড়ির উপর দিয়ে পোকারা লাফিয়ে বেড়ায়। দেখবেন, হঠাৎ তারা জল থেকে অনেক দূরে সরে যায়। ব্যাপারটা কিন্তু দৈবাৎ ঘটে না: কিছুক্ষণ পরে ঝড় ওঠে। পোকাগুলো যেন আগে থেকে এই খবরটা "জানতে পায়"। ঝড় আসার আগে মাছেরা তীর থেকে দরিয়ার দিকে সাঁতরে যাবার চেষ্টা করে, যাতে জলের তোড়ে ডাঙ্গায় এসে না পড়ে। জেলিমাছও উধাও হয়ে যায়।

জীবশরীরের এই ধরণের আচরণের কথা ভাবলে এই সব ঘটনাবলীর "অলৌকিক প্রকৃতি" সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া খুবই দুষ্কর। কিন্তু যখন বিজ্ঞান তাদের প্রাকৃতিক কারণ জানিয়ে দেয়, তখন সব প্রাঞ্জল হয়ে যায়। একথা এখন সুপ্রমাণিত যে, তটভূমি থেকে দূরে ঝড় উঠলে মানুষের শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ তীরে এসে পৌছোয়। শব্দতরঙ্গ হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে। দূরাগত ঝড় তটভূমিতে পৌছনোর বহু আগেই তার আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়। মানুষের অসাধ্য হলেও, জলজ জীবেরা এই সব শব্দতরঙ্গকে ধরতে পারে। এর থেকেই তাদের ঝড় সম্পর্কে "পূর্ববোধ" জাগে এবং তারা সময় থাকতে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় খোঁজে। এই ব্যাপারে অতি-প্রাকৃত কিছু নেই। অতএব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, **ধর্ম নয়, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই উদ্দেশ্যপ্রবণ তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।**

এবারে ধর্মযাজকদের সেই উক্তি পরীক্ষা করে দেখা যাক, যাতে তাঁরা বলেন, যেহেতু জগতে সুশৃঙ্খলা আছে, সেইহেতু এই শৃঙ্খলার "পরিচালক" কোন উচ্চতর তত্ত্বও আছে। এই প্রকার তত্ত্ব ব্যতিরেকে এই প্রকার শৃঙ্খলা কি থাকতে পারে? বস্তুবাদী দর্শন বলে, থাকতে পারে, এবং বাস্তব প্রাকৃতিক নিয়মের, প্রাকৃতিক কারণের, ভিত্তিতে জগতের ক্রমবিকাশ ঘটছে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন সম্পূর্ণ একমত। বিশ্বজগতে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা নেই, তার কারণ জগৎ বিশেষ কতকগুলি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, কারণ জাগতিক পদার্থমাত্রই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার অধীন, কারণ গতিশীল জড়বস্তুর নিয়ম অনুসারে জাগতিক ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণ স্বরূপ, জৈবপ্রকৃতির উদ্দেশ্যপ্রবণতা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ডারউইন দেখিয়েছেন, এই উদ্দেশ্যপ্রবণতা প্রাকৃতিক উপায়েই সংঘটিত হয়। জীবজগতের যে উদ্দেশ্যপ্রবণতা, যে সুসজ্জিত সন্নিবেশ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে, তা বহু শতাব্দীর বিবর্তনধারায় প্রাকৃতিক কারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের ফলেই বিকাশ লাভ করেছে।

"বিধাতা" কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই জগৎকে নিয়ে চলেছে, সে সম্পর্কে নিষ্ফল বাকজাল বিস্তার না করে জীবজগতের ক্রমবিকাশে যে কারণ ও নিয়মগুলি প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ডারউইন তাই আবিষ্কার করতে আত্মনিয়োগ করেন। জীবজগতে উদ্দেশ্যপ্রবণতার অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যটি তিনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। ডারউইনের **প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব** এই রহস্যোদ্ঘাটনের চাবি-কাঠি। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, প্রকৃতিতে একটি জীবদেহ যেখানে টিকে থাকে, লক্ষ লক্ষ জীবদেহ সেখানে বিনষ্ট হয়। জীবদেহগুলির নিয়তি কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? প্রকৃতি নিজেই নির্ধারিত করে। কে টিকে থাকবে ও বংশবৃদ্ধি করবে এবং কে জীবনসংগ্রামে ধ্বংস হবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়, প্রকৃতির ক্রমবিকাশের নিজস্ব যে অপরিবর্তনীয় নিয়মগুলি কাজ করে চলেছে, তারই বিধানে। এতে কোন "পরম শক্তি"র হস্তক্ষেপ নেই। এর ফলে যা ঘটে তা, ডারউইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে অভিহিত, যেহেতু তা **প্রাকৃতিক** কারণ ও নিয়মের ফলেই সংঘটিত হয়। সেই সব প্রাণী ও উদ্ভিদ টিকে থাকে যারা তাদের পরিবেশের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে।

পরিবেশের অবস্থার সঙ্গে সার্থক সংযোজনের জন্য জীবনের যে সংগ্রাম, যাকে এক কথায় বলা হয় জীবনসংগ্রাম, তার ফলে অনিবার্যভাবে তারাই টিকে থাকে যারা জীব হিসাবে সর্বতোভাবে নিখুঁত, যারা তাদের জীবন-যাত্রার অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জননের ভিতর দিয়ে এইপ্রকারে প্রাণী ও উদ্ভিদের উপজাতিগুলির উদ্ভব হয়, এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্যনিষ্ঠা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অত্যধিক মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে; এবং এই উদ্দেশ্যনিষ্ঠা উপর থেকে আরোপিত হয় না, তা বহু শতাব্দীর বিবর্তনধারায় বিকাশ লাভ করে।

কোন কোন জলজ প্রাণীর আসন্ন ঝড় সম্পর্কে যে "পূর্ববোধ" আছে বলে মনে

হয়, তাদেরই কথা ধরা যাক। এই ব্যাপারটা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? যেহেতু বিবর্তনধারায় কেবলমাত্র এই জীবদেহগুলি ক্রমব্যাপ্ত শব্দ-তরঙ্গ ধরবার ক্ষমতা অর্জন করেছিল বলে ঝড়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল, তাই তারাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হল। যে সব প্রাণীদের এই ক্ষমতা ছিল না এবং না থাকার ফলে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের তুলনায় এই প্রাণীগুলি অনেক বড় স্থবিধার অধিকারী হয়েছিল। অতএব, অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রে এই প্রাণীগুলির মধ্যে এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটল, যা তার "যৌক্তিকতা" ও "উদ্দেশ্যনিষ্ঠায়" আমাদের চমকিত করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অত্যন্ত নির্ভুলভাবে সময় "পরিমাপ" করার ও সময়ের গতির সঙ্গে তাদেও শারীরিক প্রক্রিয়া "নিয়মিত" করার ক্ষমতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অনেক অনেক শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, পরিবেশের নিয়মনিয়ন্ত্রিত কালিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদের মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনের থেকে এই ক্ষমতা বিকাশ লাভ করেছে।

"উদ্দেশ্যনিষ্ঠা" এই প্রাচীন কথাটি রক্ষা করে বিজ্ঞান তাতে এক নূতন অর্থ আরোপ করেছে। ধরে নেওয়া কোন উদ্দেশ্যের বদলে আমরা প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করি। প্রাকৃতিক নিয়মের, প্রাকৃতিক কারণের অনিবার্য ও অপরিহার্য ফল —জীবলোকেব চরমোৎকর্ষ।

একথা মনে রাখতে হবে যে, কারণ বিভিন্ন প্রকারের: কোন কোন কারণ থেকে অপরিহার্য ঘটনার এবং অন্য কোন কারণ থেকে আপতিক ঘটনার উদ্ভব হয়।

অপরিহার্যতা ও আপতন

বৈজ্ঞানিক বেকেরেল একবার বক্তৃতার সময় তাঁর ছাত্রদের দেখাবেন বলে বিখ্যাত পদার্থবিদ্ পিয়ের কুরির কাছ থেকে সামান্য একটু রেডিয়ম চেয়ে আনেন। রেডিয়মটি একটি টিউবের মধ্যে রাখা ছিল, টিউবটি তিনি তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেটে রেখে দেন। কয়েকদিন পরে বেকেরেল লক্ষ্য করে দেখেন, তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেটের ঠিক উল্টো দিকে তাঁর দেহের চামড়ায় ঠিক টিউবটির আকারে খানিকটা জায়গা লাল হয়ে উঠেছে। এই আপতিক ঘটনা থেকে মানবদেহের উপর রেডিয়ম রশ্মির প্রভাব কি, সেই সম্পর্কে গবেষণার

সূত্রপাত হল। মনে হয়, এই আপতিক ঘটনাটি না ঘটলে মানুষ রেডিয়মরশ্মির বিকিরণজনিত ব্যাধি এবং রেডিয়মের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু জানতেই পারত না। সত্যি কি তাই? কেউ কেউ বলবেন, হ্যাঁ, তাই।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা আমাদের সমগ্র জীবনকে দেখেন, তাঁদের মতে আমাদের জীবন ধারাবাহিক আপতন ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা এই মত পোষণ করেন, তাঁদের মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যায় 'ভাগ্যের দয়ায় হল, ভাগ্য বিরূপ ছিল'। বিশ্বজগৎ এবং যা কিছু তার মধ্যে ঘটছে, সব কিছুই ভাগ্যক্রমে ঘটছে এবং সবই আপতনের অভাবিত ফল।

অন্যেরা এই মতে সায় দেন না। তাঁরা বলেন: প্রকৃতিতে আপতিক বলে কিছু নেই, হতেও পারে না, যেহেতু যা কিছু ঘটছে, তা তার বিশেষ নিয়ম ও কারণের ভিত্তিতেই ঘটছে। বেকেরেল তাঁর বক্তৃতা দেবার সময় রেডিয়ম নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? যেহেতু ছাত্রদের কাছে রেডিয়ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার উপযুক্ত সময় তখনই হয়েছিল। অতএব সঙ্গত কারণ ছিল। তাঁর দেহের পোড়াদাগটিরও একটি বিশেষ কারণ ছিল: জীবদেহের উপর রেডিয়মের ক্রিয়া আছে এবং সেই ক্রিয়া না হয়ে পারে না। ফলত পোড়াদাগটির কেবলমাত্র একটি কারণ ছিল না, তা একটি সম্পূর্ণ কারণপরম্পরার ফল। পোড়াদাগটা অপরিহার্য ভাবেই ঘটেছে। তার মধ্যে আপতনের কিছুই ছিল না।

তাই যদি, তাহলে কোন কোন ঘটনাকে আপতিক বলা হয় কেন? যাঁরা উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন, তাঁরা এই বলে তার ব্যাখ্যা করেন: যারা কোন নির্দিষ্ট ঘটনার কারণ কি তা জানে না, তারাই সেই ঘটনাকে আপতিক বলে থাকে। যে কারণ থেকে সেই ঘটনার উৎপত্তি হয়েছে, ঠিকমত অনুসন্ধান করে তা বার করতে পারলে আপাতদৃষ্টিতে যা আপতিক, তা আর আপতিক থাকে না। ঘটনাটি তখন অপরিহার্য বলে, কারণপ্রসূত বলে প্রমাণিত হয়। এই প্রকার তত্ত্ব ডিমক্রিটাস, স্পিনোজা ও হলবাক্-এর মত দার্শনিকেরা সমর্থন করতেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটি মত আছে। একদল বলেন, জগতে সব কিছুই অপরিহার্য এবং কিছুই আপতিক নয়, অন্যদল বলেন, দুনিয়ায় সব কিছুই আপতিক। কারা ঠিক কথা বলেন?

যেহেতু শেষোক্ত মতের লোকেরা কার্যকারণ সম্পর্কে, নিয়মাধীনতাকে,

অস্বীকার করেন এবং যেহেতু এই অস্বীকৃতি প্রকৃত তথ্যের ও বিজ্ঞানের বিরোধী, তাঁরা ভ্রান্ত মতাবলম্বী। অনির্ণেয়বাদ সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য।

তাঁদের বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ নির্ধারণবাদীরাও যে সমস্যাটা সঠিক সমাধান করতে পেরেছেন, আমরা যেন তাড়াতাড়ি সেই সিদ্ধান্ত করে না বসি; ব্যাপারটা অনেক বেশি জটিল। নির্ধারণবাদের ধারণা নানা রকম হতে পারে। **তাত্ত্বিক** বা যান্ত্রিক নির্ধারণবাদ থেকে **দ্বন্দ্বসমন্বয়ী নির্ধারণবাদের** পার্থক্য করা দরকার।

তাত্ত্বিক নির্ধারণবাদের বিশেষ লক্ষণ এই যে, জগতে সব কিছু কারণপ্রসূত, সব কিছু নিয়মনিয়ন্ত্রিত, এই কথা যেমন তা স্বীকার করে, তেমনি তা আপতনের অস্তিত্বই মানে না। (দ্বন্দ্বসমন্বয়ী নির্ধারণবাদ কিন্তু আপতন স্বীকার করে, আমরা পরে তা দেখতে পাব)। তাত্ত্বিক নির্ধারণবাদীরা ততদূর অভ্রান্ত যতদূর তাঁরা মেনে নেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রই কারণসঞ্জাত এবং বিনা কারণে এ জগতে কিছুই ঘটে না।

কিন্তু ঘটনামাত্রেরই কারণ আছে, এই যুক্তিতে আপতনকে অস্বীকার করে তাঁরা কি ঠিক করেন? নিশ্চয়ই নয়। আসল কথা হচ্ছে, তাত্ত্বিক নির্ধারণবাদই বলুন, অনির্ণেয়বাদই বলুন, তারা হয় অপরিহার্যতাকে, নয়ত আপতনকে স্বীকার করে। প্রশ্নটা তাঁরা এইরূপে দাঁড় করান: হয় জগতে সবকিছুই অপরিহার্য, নয়ত সবকিছুই আপতিক। হয় বা নয়: প্রশ্নটির তাত্ত্বিক রূপায়ণ সচরাচর এই ভাবে করা হয়। এর থেকে বলা যায়, দুইয়েরই দৃষ্টিসীমা সংকীর্ণ, যেহেতু তারা অপরিহার্যতা থেকে আপতনকে পৃথক করে দেখে। সঠিক সমাধান তাহলে কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা যাক। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রভাবে জার্মানীতে এক বিপ্লব ঘটে। কিন্তু এই বিপ্লব সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্যর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের 'রোটে ফাহ্‌নে' (লাল পতাকা) কাগজে জার্মান শ্রমিক-নেতা কার্ল লাইব্‌কনেখ্‌ট্‌-এর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিপ্লবে যারা যোগদান করেছিল তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন: 'শান্ত থাকুন! আমরা পালাই নি, আমাদের উচ্ছেদ করাও হয়নি। যদি ওরা আমাদের শিকলে বাঁধে, আমরা তবুও থাকব, তবুও টিকে থাকব। অন্তিমে জয় আমাদেরই।

"...আমরা বেঁচে থাকি বা নাই থাকি, আমাদের উদ্দেশ্য যেদিন সাধিত হবে,

আমাদের কর্মপন্থা সেদিন বেঁচে থাকবে, দুনিয়ার বন্ধনমুক্ত মানবজাতি সেই কর্মপন্থা মেনে নেবে। যত বাধাই আসুক, অনিবার্য এই ভবিষ্যৎ!" জার্মান শ্রমিক-নেতার এই অগ্নিগর্ভ বাণীতে চমৎকারভাবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিজয় অভিযানের অপরিহার্যতার ও অনিবার্যতার ভাবটি ফুটে উঠেছে। "যত বাধাই আসুক, অনিবার্য এই ভবিষ্যৎ!"

যে দৃঢ় প্রত্যয় সাম্যবাদের শত্রুদের মনে এমন ভীতি সঞ্চার করে, তার ভিত্তি কোথায়? এর ভিত্তি প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান। কয়েক ঘণ্টা রাতের অন্ধকারের পর সূর্য উঠবে এবং ভোর হবে, এতে আমাদের সংশয় নেই। তেমনি শীতের আক্রমণ যত তীব্রই হোক বসন্ত তার সৃজনের নূতন সম্ভার নিয়ে যে দেখা দেবেই, এতেও সংশয়ের কোন কারণ নেই। এই প্রতীতি ব্যবহারিক বোধ থেকে, অনেক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে, প্রকৃতি ও সমাজের নিয়ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থেকে, লব্ধ। যেমন দিনরাত্রির আবর্তন অক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তনের ফল, ঋতুপারম্পর্য সৌরচক্রে পৃথিবীর পরিক্রমার ফল, তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধের ফল সাম্যবাদের জয়, যার ফলে পুঁজিবাদের অনিবার্য পতন ঘটে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার স্থান দখল করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থা থেকে এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি: "সর্বত্র পুঁজিবাদের অবধারিত উত্তরাধিকার হবে সমাজতন্ত্র। সামাজিক ক্রমবিকাশের বাস্তব বিধান এই। মুক্তির অপ্রতিরোধ্য এই প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে এমন শক্তি সাম্রাজ্যবাদের নেই।"১

ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বক্ষণ এই যে পারস্পরিক যোগ তাই "অপরিহার্যতা" এই দার্শনিক মূলপ্রত্যয় দ্বারা সূচিত হয়। অপরিহার্যতা এমন কিছু নয়, যা আছে কিন্তু না থাকলেও চলত; **অপরিহার্যতা এমন কিছু যা থাকতে বাধ্য, যেহেতু সুদূরপ্রসারী কারণ ও যোগাযোগের ফলে তার উদ্ভব এবং সেইজন্যে ঘটনার অন্তরতম প্রকৃতি থেকে, তার সারসত্তা থেকে, তা পরিণতি লাভ করে।**

যেহেতু জগতে সবকিছুই অপরিহার্য আপতিক বলে কি কিছু আছে?

আপতনের অস্তিত্ব আছে কি?

এ ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা ভালো। একটা কারখানায় কয়েকজন শ্রমিক হয়ত একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার ফলে উৎপাদনের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। অথবা একটা লোক

১। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ৪৪৯

টমোটর দুর্ঘনায় পতিত হল এবং তার ফলে তার মৃত্যু হল। আমরা এই ঘটনাগুলিকে আপতিক বলি কেন?

আমরা আগে যে সব ঘটনাকে অপরিহার্য বলে চিহ্নিত করেছি তার সঙ্গে এইগুলি তুলনা করে দেখুন। একটি অপরিহার্য ঘটনা সেই ঘটনার অন্তর্নিহিত সমগ্র বিকাশধারার দ্বারা আয়োজিত ও উদ্বুদ্ধ হয়, অতএব তা ঘটনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না (মনে করুন সেই কথা কয়টি "যত বাধাই আসুক, অনিবার্য এই ভবিষ্যৎ!") অপরপক্ষে আপতিক ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় যে তা এমন কিছু যা ঘটবেই এমন কথা নেই, যা ক্ষণস্থায়ী ও স্বতন্ত্র।

আপতিক ঘটনা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট কারখানার কয়েকজন শ্রমিক একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এই ব্যাপারটা কি অপরিহার্য? লোকটির জীবন কি এমনই ছিল যে, মোটর দুর্ঘটনায় তার জীবনান্ত অপরিহার্য? অবশ্যই তা নয়। এই প্রকারের ঘটনাকে অপরিহার্য বলা চলে না। এগুলি আপতিক। তাদের অন্তর্নিহিত সমগ্র বিকাশধারার পরিণতিতে এই ঘটনাগুলি ঘটে না।

১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট রাশিয়া যখন মহাকাশে প্রথম পার্থিব উপগ্রহ প্রেরণ করল, পাশ্চাত্যের কোন কোন বুর্জোয়া প্রচারক বলেছিল যে, এটা একটা আপতিক, বিচ্ছিন্ন সাফল্য। আসলে তা কিন্তু মোটেই তাই ছিল না। সেই সাফল্যের মূলে ছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির এবং সোভিয়েট সরকারের নিরলস প্রয়াস।

স্পুটনিকের মহাকাশযাত্রা থেকে প্রমাণিত হল, সোভিয়েট প্রযুক্তিবিদ্যা কত পরিণত এবং গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ধাতুবিদ্যার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-গুলিতে সোভিয়েট বিজ্ঞান কি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। একে কি করে আপতিক বলা যেতে পারে? কোন ঘটনাকে আপতিক বলা হয় যেহেতু তা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় না। স্পুটনিক কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের সমগ্র বিকাশেতিহাসের ফল।

তাহলে কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা আপতিক না অপরিহার্য, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেখা দরকার, ঘটনাটি অন্তর্নিহিত কোন কারণের ফল, না, বাহ্যিক কারণের ফল।

কৃষিবিজ্ঞানের যাবতীয় প্রয়োগিক নিয়ম মেনে যদি কোন ক্ষেতে গমের

চাষ করা হয় এবং পরে যদি সেই ফসল ঝড়জলে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই ঘটনাকে আপতিক বলা হবে, না, অপরিহার্য বলা হবে? ঝড়বৃষ্টির অবশ্য নিজস্ব কারণ আছে। কিন্তু সেই কারণের অনিবার্য পরিণতি কি ক্ষেতের গমগুলি ধ্বংস করা? তা যে নয়, তার যুক্তি এই।

বিনা কারণে ঝড়বৃষ্টি হয় না, ঠিক। কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্ষেতটি সম্পর্কে সেই কারণগুলি বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী। তা গম বিকাশের মৌলিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত নয়। এতএব, ঘটনাটি আপতিক। গম ধ্বংস হওয়া একেবারেই অনিবার্য ছিল না। এই নির্দিষ্ট ক্ষেতে ঝড়বৃষ্টির ফল নিতান্তই আপতিক।

এতক্ষণ যা বলা হল তার থেকে একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, আপতন ও অপরিহার্যতা পরস্পরবিরোধী। এর থেকে কি বলা যেতে পারে, তাদের মধ্যে কোনই মিল নেই?

আপতন ও অনিবার্যতার মধ্যে মিল কোথায়?

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, যা অপরিহার্য তা কখনও আপতিক হতে পারে না, এবং যা আপতিক তা কখনও অপরিহার্য হতে পারে না। সাধারণ জ্ঞান থেকেও মনে হয়, এই কথাই সত্য। কিন্তু তাই কিনা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

আগেকার দৃষ্টান্তটা একবার মনে করুন। বেকেরেলের দেহে যে পোড়া দাগটা হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে আপতিকভাবেই হয়েছিল, কারণ তিনি যদি রেডিয়মশুদ্ধ টিউবটি তাঁর পকেটে না রাখতেন, তাহলে তা কখনই ঘটত না। কিন্তু এই আপতনের পিছনে কি আছে দেখা যাক। আগে ইউরেনিয়ম খনিজে স্বল্পমাত্রায় রেডিয়ম পাওয়া যেত। সেইজন্যে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করা তখন কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু কুরিদম্পতি বিশুদ্ধ অবস্থায় যখন তা আলাদা করলেন, তখন কিন্তু অবস্থাটা পাল্টে গেল। এর পরে জীবদেহতন্তুতে তার ক্রিয়া, আগে হোক, পরে হোক, আবিষ্কার যে হবেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ এবং বেকেরেলের ক্ষেত্রে তাই দেখা গেল। তাঁর ক্ষেত্রে এই ক্রিয়া না ঘটলে, অন্য কারও ক্ষেত্রে ঘটতই। এর থেকে বলা যায় যে, **জীবনে, বস্তুজগতে, আপতিক ঘটনা ও অপরিহার্য ঘটনার মধ্যে অনেকাংশে মিল আছে, তারা ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত। একের থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।**

অপরিহার্য ঘটনা ও আপতিক ঘটনার মধ্যে যে যোগ আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এককে অন্যতে পর্যবসিত

করা যায়। কোন প্রাণীর মধ্যে আপতিকভাবে কোন নূতন বিশেষত্ব দেখা দিতে পারে (যেমন, ঘন লোম)। এই আপতিক ঘটনা জীবনসংগ্রামে অত্যন্ত কাজে লাগতে পারে; এর সাহায্যে উত্তরাঞ্চলের কোন প্রাণী তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আরও ভালোভাবে খাপ খাইতে নিতে পারে। পরবর্তীকালে আপতিকভাবে অর্জিত এই বিশেষত্বগুলি বংশানুক্রমে নেমে আসে এবং কয়েক জননের পর জীবলোকে ঘনলোমযুক্ত নূতন এক উপজাতির আবির্ভাব ঘটে। এই বিশেষ লক্ষণটি আপতনের পর্যায় থেকে এখন অপরিহার্যতায় পরিণত হল। এইজন্যে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, **অপরিহার্যতার প্রকাশরূপ আপতন, তা অপরিহার্যতার পরিপূরক**। আপতনের আড়ালে অপরিহার্যতাকে, যে নিয়মিতত্বে তার আবির্ভাব ঘটছে তাকে, সব সময়ে খুঁজে বার করার মত চোখ থাকা চাই। প্রকৃতিতে ও মানবসমাজে এমন কোন আপতিক ঘটনা নেই, যার নেপথ্যে অপরিহার্য নিয়মনিয়ন্ত্রিত কোন প্রক্রিয়া কাজ করছে না।

এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতিতে এবং মানবসমাজে এমন কোন ঘটনা নেই যা "কেবলমাত্র" অপরিহার্য, কিংবা "কেবলমাত্র" আপতিক। বাস্তবক্ষেত্রে তারা একই সঙ্গে থাকে এবং তারা পরস্পর জড়িত। একটি গাছ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিশেষ নিয়ম-অনুসারে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পাতা কত রকমের, তাদের সংখ্যা কত, তাদের প্রতিটির আকার ও গঠন কি রকম, এইসব তথ্য অসংখ্য আপতিক প্রভাবের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে পড়ে, বর্ষায় তারা কি পরিমাণ জল পেয়েছে, কি ধরণের বাতাস তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, ইত্যাদি। এর থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, এক্ষেত্রে আপতন অপরিহার্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এর মানে কি এই, আপতন ও অপরিহার্যতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই? পার্থক্য আছে, তবে সেই পার্থক্যকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে পার্থক্য এই যে, যে প্রক্রিয়া অপরিহার্য তার একটা কারণ থাকে, অথচ আপতিক ঘটনার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, বিনা কারণে কোন ঘটনা ঘটে না। আপতিক ঘটনারও কারণ থাকে। তাহলে তফাৎটা কোথায়?

অনেক আগেই হেগেল একথা বলেছেন যে, যে প্রক্রিয়া অপরিহার্য, সেখানে

কারণটা তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে একীভূত। যে প্রক্রিয়া আপতিক সেখানে সেই ঘটনার সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ বাহ্যিক। যেমন, এই উদাহরণটা নেওয়া যাক। ত্রিশ দশকে জাপানে এক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, যেমন দেখা দেয় সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে। সেইসঙ্গে জাপানে এক সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয় এবং তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি আরো বেড়ে যায়। সংকটের মূলে অবিসংবাদিতভাবে ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ। সংকটরূপ এই সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে ভূমিকম্পটা ছিল আপতিক ও বাহ্যিক ঘটনা। কিন্তু যে ঘটনাচক্র থেকে তার উৎপত্তি তার সম্বন্ধে কিন্তু তা অপরিহার্য।

এই আপতিক ঘটনার অপরিহার্যতা, এর কারণিক নৈমিত্তিকতা জানতে হলে অন্য ঘটনাক্ষেত্রে, ভূবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুঁজতে হবে। তাইজন্যে বলা হয় যে, যে ঘটনাচক্রে, যে কারণসমূহ থেকে, আপতনের উৎপত্তি তাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অপরিহার্যতার। **আপতন ও অপরিহার্যতা আপেক্ষিক সংজ্ঞা।**

অতএব আপতন সম্পর্কে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ধারণা একদিকে যেমন স্বীকার করে, পৃথিবীর সবকিছুর কারণ আছে, তেমনি তা আপতিক কারণ, অর্থাৎ যে কারণগুলি ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে, এবং অপরিহার্য কারণ, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ঘটনার আন্তর্বিকাশধারায় যা উদ্ভূত, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখারও প্রয়োজন বোধ করে। অতএব তাত্ত্বিক নির্ধারণবাদীরা যে বিশ্বাস করেন, কারণ সঞ্জাত ঘটনামাত্রই অপরিহার্য, তা ঠিক নয়। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী নির্ধারণবাদ একদিকে যেমন স্বীকার করে যে, জগতে সব কিছুই কারণ সম্ভূত, তেমনি তা আপতনকেও মেনে নেয়।

তথাপি উপরের বক্তব্য থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। অপরিহার্যতা থেকে বিকাশপ্রবণতা, বিকাশধারার প্রধান অভিমুখীনতা নির্ধারিত হয়। প্রতিটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় কিন্তু আপতন কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে অপরিহার্যতাকে পরিপূরণ করে এবং তারই ফলে অপরিহার্যতার প্রকাশরূপ প্রকট হয়। অপরিহার্যতাকে, বিকাশশীল ঘটনার নিয়মিতত্বকে, জানবার জন্যে বিজ্ঞানের সবিশেষ ঔৎসুক্য থাকে, যেহেতু বিজ্ঞানের মুখ্য দায়িত্বই হচ্ছে বিকাশপ্রবণতাকে আবিষ্কার করা।

বিজ্ঞান কেবলমাত্র আপতিক আবিষ্কার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিককে তাঁর গবেষণা এমনভাবে চালাতে হয়, যাতে আপতিক ঘটনার

উপর তাঁকে নির্ভর করতে না হয়। ঈপ্সিত লক্ষ্যে যাতে নিশ্চিতভাবে পৌছোতে পারেন সেইভাবে তাঁকে কাজ করতে হয়। আন্দাজে না হাতড়িয়ে, তাঁর গবেষণার বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জেনেশুনে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। বিখ্যাত সোভিয়েট জীববিৎ মিচুরিন সেই সব বৈজ্ঞানিকদের তীব্র সমালোচনা করতেন, যাঁরা যে নিয়মে প্রাকৃতিক জগৎ বিকাশ লাভ করছে সেই নিয়মের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে আপতনের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতির দয়ার উপর আমাদের ভরসা করে থাকলে চলবে না। প্রকৃতির গোপনতত্ত্ব তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে—বিজ্ঞানের কাজই এই। কবে প্রকৃতি অকস্মাৎ এমন কিছু দেবে যা মানুষের প্রয়োজনে লাগবে—এই মনোভাবের গোড়ায় আছে আপতনের উপর নির্ভরতা, এ যেন সোনার হরিণের পিছনে ছোটা।

নিচের উদাহরণ থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোর অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ মায়া ইণ্ডিয়ানদের লিপির অর্থ উদ্ধার করার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা অনেক বছর ধরে বৃথা চেষ্টা করে এসেছেন। একথা সুবিদিত যে প্রাচীন মিশরীয়দের চিত্রলিপির অর্থোদ্ধারের ব্যাপারে একটি আপতিক ঘটনা বিশেষ সাহায্য করেছিল: একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল তাতে গ্রীক ও মিশরীয় এই দুই ভাষায় একই শিলালিপি ক্ষোদিত ছিল। যে সব বৈজ্ঞানিক মায়া ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন যে, তাঁদের ভাগ্যে এইরকম কোন আকস্মিক যোগাযোগ ঘটে যাবে। কিন্তু তা ঘটল না এবং ফলে তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হল।

তরুণ সোভিয়েট বিজ্ঞানী ইউরি ক্নোরোজোভ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক উপায় অবলম্বন করলেন। মায়া ভাষার মত যে সব ভাষা চিত্রলিপিনির্ভর, যেমন মিশরীয় ভাষা, চীনা ভাষা, সেই সব ভাষার সাধারণ নিয়মসূত্রগুলি তিনি অনুশীলন করতে লেগে গেলেন। ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে, একটার পর একটা জট খুলতে খুলতে, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক যা আবিষ্কার করলেন তার গুরুত্ব পৃথিবীব্যাপী। তিনি মায়া ভাষার অর্থোদ্ধারের একটি উপায় বার করলেন। তাঁর সাফল্যের মূলে যা ছিল তা হচ্ছে এই, তিনি আপতিক সৌভাগ্যো-দয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে তাঁর গবেষণার বিষয়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

ভূবিজ্ঞানীমাত্রই জানেন, যত্রতত্র অনুসন্ধানের কাজ চালালে সামান্যই আবিষ্কার সম্ভব। ভূতত্ত্বীয় অনুসন্ধানে সুফল পেতে হলে যে নিয়মে ভূত্বকের গঠন নিয়ন্ত্রিত হয় তা অনুশীলন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার দ্বারা চালিত হওয়া দরকার। তাহলেই আপতিক সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করার আর দরকার হয় না এবং সুফল সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

আপতন ও অপরিহার্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী যোগ আধুনিক অনির্ণেয়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। এই সমস্যা গতীয় ও পরিসাংখ্যিক সূত্র সম্পর্কিত।

বিজ্ঞানে **গতীয়** ও **পরিসাংখ্যিক** এই দুই ধরণের সূত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য করা প্রচলিত রীতি। গতীয় নিয়মগুলি আমরা পাই পদার্থবিদ্যায়।

গতীয় ও পরিসাংখ্যিক সূত্র

যথা, গেলিলিওর সূত্র "ভৌতিক বস্তুমাত্রই সমান বেগে পতিত হয়" ও এই ধরণের সূত্র। এমনি সূত্র নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রও, "ভরবেগ আরোপিত বলের সমমাত্রিক এবং বলের গতিমুখীন।"

এই ধরণের সূত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা কতকগুলি বা অধিকাংশ ঘটনার উপর প্রযোজ্য নয়, তার ক্রিয়াধীন সব ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেইজন্যে, যে অবস্থা ও কারণ থেকে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উৎপত্তি, তা যদি জানা থাকে তাহলে সেই ঘটনার সংঘটনকাল আগে থেকে নির্ভুলভাবে বলা যায়।

জ্যোতির্বিদ্যায় এই ধরণের অনেক আশ্চর্য উদাহরণ আছে। কবে সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে জ্যোতিষিকরা কয়েক যুগ আগে থেকে তা বলে দিতে পারেন। সাবেক পদার্থবিদ্যার সাহায্যে কোন একটি পদার্থের কোন এক মুহূর্তের অবস্থিতি আমরা নির্ধারণ করতে পারি, যদি তার বেগ এবং নির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে তার অবস্থান আমাদের জানা থাকে। যদি জানা থাকে একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে, তাহলে দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, ইত্যাদি, পরে তা কোথায় থাকবে, তা জানা মোটেই দুষ্কর নয়।

অতএব, সাবেক পদার্থবিদ্যায় কোন একটি পদার্থের গতি সেই সব কারণের ক্রিয়াদ্বারা পুরোপুরি স্থিরীকৃত, যে সব কারণ থেকে তার গতির **দিক অনিবার্য ও অপরিহার্য** নির্ধারিত। সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ওই অপরিহার্য প্রক্রিয়াটি আগে থেকে বলে দেওয়া যায়।

যান্ত্রিক গতির নিয়মগুলি অনুশীলন করে সাবেক পদার্থবিদ্যায় গতীয় সূত্র-

য়েয়ক প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়েছে। ('গতীয়'র ইংরাজী 'ডাইনামিক' গ্রীক 'ডিনামিকোস' থেকে নেওয়া—যার অর্থ 'শক্তিসম্পন্ন' 'ক্রিয়াশীল')।

অবশ্য বিজ্ঞানের এমন সব ঘটনাও জানা আছে যা গতীয় নিয়মের আওতায় পড়ে না, যা পরিসাংখ্যিক নিয়মের অধীন। এই ঘটনাগুলির স্বরূপ কি, তা জানার জন্যে ছোটখাটো একটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। যদি আপনি একটা টাকা উপরে ছুঁড়ে দেন, আগে থেকে আপনার পক্ষে বলা অসম্ভব টাকাটা মাথার দিক হয়ে পড়বে, না, উল্টোদিক হয়ে পড়বে। কিন্তু টাকাটাকে, মনে করুন, ৫০০০ বার উপরে ছোঁড়া হল, তাহলে দেখা যাবে, পড়ার মধ্যে একটা নিয়মিতত্ব থাকছে: দেখা যাবে ২৫০০ বারের কাছাকাছি মাথার দিকে এবং ২৫০০ বারের কাছাকাছি উল্টোদিকে পড়ছে। অত্যধিকসংখ্যক পরীক্ষা করলে সর্বদাই দেখা যাবে প্রায় আধাআধি ফল মাথার দিকে, আর বাকি আধাআধি বিপরীত দিকে। অতএব আপতিক ঘটনার কতকগুলি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এমন একটি নিয়মের সন্ধান পেতে পারি, যে নিয়ম সমগ্রভাবে সবগুলির উপর প্রযোজ্য। একে বলা হয় পরিসাংখ্যিক নিয়ম।

কিন্তু কথা এই, কোন একবারের ফল মাথার দিকে হবে, না, বিপরীত দিকে হবে, তা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না। আগে থেকে তা বলা সম্ভব হত, যদি আমরা জানতে পারতাম, কি উপায়ে সেই সব অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব, যার পরিণতিতে একটা নির্দিষ্ট ফল ফলে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি পরীক্ষায় কোন নিয়মই ধরা পড়ে না। কেবলমাত্র অনেক সংখ্যক পরীক্ষার মধ্যে থেকেই, অর্থাৎ পরিসাংখ্যিকভাবেই, নিয়মের আবির্ভাব ঘটে।

অনেকগুলি আলাদা আলাদা আপতিক ঘটনাগুচ্ছের অন্তর্নিহিত নিয়ম, অর্থাৎ তাদের পরিসাংখ্যিক নিয়ম, অনুশীলন করার প্রয়োজন আমরা প্রায়শই বোধ করি। ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী কখনও তাদের বিচার করা হয় সম্ভাবনা তত্ত্বের দ্বারা, কখনও বা সামাজিক পরিসংখ্যান দ্বারা। আপতিক ঘটনা-গুলি আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন—তা হচ্ছে আকস্মিকতার নিয়ম।

নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

আমরা পদার্থবিদ্যা থেকে জানি যে, গ্যাসের অণুগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে। প্রতিটি অণু কোন দিকে যাবে এবং কি বেগে যাবে

তা আগে থেকে বলা অসম্ভব। আধারের গায়ে এবং পরস্পরে ধাক্কা খেয়ে তারা ক্রমাগত তাদের গতিবেগ ও গতির দিক বদলায়। একটা অণু এক মিনিটে কতবার আধারের গায়ে ধাক্কা খাবে, তা নিছক আকস্মিকতার ব্যাপার। কিন্তু আধারের গায়ে গ্যাসের চাপ একটি পরিমেয় পরিমাণ। এই চাপ কিন্তু নির্ভর করে আধারটির গায়ে অণুগুলির যে সংঘর্ষ হচ্ছে তার সংখ্যা ও বলের উপর, তার মানে, অণুগুলির এইসব আপতিক ও বিশৃঙ্খল গতির উপর।

প্রতিটি গ্যাস-অণুর গতি আপতিক। পৃথকভাবে প্রতিটি অণুর কোন প্রকার শৃঙ্খলা বা নিয়ম নেই। কিন্তু আধারের গায়ে সমগ্রভাবে গ্যাসের চাপ নিয়ম মেনে চলে, তার প্রমাণ এই যে, বিশেষ অবস্থায় এই চাপের মাত্রা সর্বদা এক থাকে। এইখানে পরিসাংখ্যিক নিয়ম কার্যকর।

আরও একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে।

সদ্যোজাত শিশুটি পুত্র না কন্যা, এই প্রশ্নটি প্রথমদৃষ্টে মনে হয়, কোন নিয়মের আওতায় পড়ে না। কোন পরিবারে দেখা যায় সবই ছেলে, কোন পবিবারে সবই মেয়ে। অনেকগুলি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে কিন্তু দেখা যাবে, এরও মধ্যে একটা নিয়ম আছে। দেখা যাবে প্রতি ১০০ কন্যার জায়গায় ১০৫টি পুত্র জন্মাচ্ছে।

এর থেকে কী বোঝা যায়? এর থেকে বোঝা যায় যে, আপতিক ঘটনাগুলি যে নিয়মে ঘটে তা কমসংখ্যক দৃষ্টান্তের বেলায় ধরা পড়ে না, অত্যধিক সংখ্যক তথ্যের ক্ষেত্রেই তা ধরা পড়ে।

এই নিয়মগুলির নাম দেওয়া হয়েছে পরিসাংখ্যিক সূত্র, অর্থাৎ যে নিয়ম আপতিক ঘটনাবলীর একটি সমগ্র শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য। পরিসাংখ্যিক পদ্ধতিতে এই সূত্রগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব।

এই বিষয়টি নিয়ে নির্ধারণবাদ ও অনির্ণেয়বাদের মধ্যে দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিতর্কের সূত্রপাত হয় এই থেকে। বিশ শতকের প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেন যে, পরমাণুর অন্তঃস্থিত সূক্ষ্মকণিকাগুলির গতি পরিসাংখ্যিক নিয়মের আওতায় পড়ে, গতীয় নিয়ম তাদের উপর প্রযোজ্য নয়। দেখা গেল, সাবেক পদার্থবিদ্যার সূত্র ধরে একটি সূক্ষ্ম কণিকার স্থাননির্দেশ আদৌ সম্ভব নয়। এর অর্থ কণিকার গতি কোন প্রকারেই

পূর্বনির্ধার্য নয়। একটা ইলেক্‌ট্রনের ভবিষ্যৎ গতি স্থির করা যায় না; যে কোন জায়গায় বহুসংখ্যক স্থানের যে কোন একটিতে তাকে পাওয়া যেতে পারে। ইলেক্‌ট্রনের পূর্বনির্ধারিত গতিপথ বা বক্রমার্গ বলে সঠিক কিছু নেই। এর সঙ্গে গ্রহমণ্ডলের গতি সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে তার যদি তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে পার্থক্যটা বাস্তবিকই বিরাট। গতীয় নিয়ম অনুযায়ী গ্রহগুলির সঠিক গতিপথ পূর্বনির্ধারিত।

আধুনিক বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা এর থেকে কী সিদ্ধান্ত করেছেন? তাঁদের যুক্তির ধারা এই। যেহেতু আমরা আগে থেকে ইলেক্‌ট্রনের গতিপথ জানতে পারি না, এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, এই ব্যাপারটা কার্যকারণ যোগে নিরূপিত হয় না। তা না হলে, আমরা আগেই তা নির্ণয় করতে পারতাম, যেহেতু একটি বিশেষ কারণ থেকে সব সময় একটা বিশেষ ফল পাওয়া যাবেই। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব তার কোন কারণও নেই। ইলেক্‌ট্রন "স্বাধীন ইচ্ছা"র অধিকারী, অর্থাৎ তার যথেচ্ছ চলাফেরা করার ক্ষমতা আছে, কোন কারণ দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা পূর্বনির্ধারিত নয়। অতএব কেবলমাত্র একটা দিকেই তার গতি নিবদ্ধ থাকবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই।

যে সব বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ভাববাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন, তাঁরা এইসব এবং অনুরূপ যুক্তির ভিত্তিতে "নির্ধারণবাদের অন্তিমদশা" সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক?

প্রথমত এ কথা মনে রাখা দরকার যে, যদিও সূক্ষ্মকণিকার জগতে কোন একটি স্বতন্ত্র কণিকার গতিসম্পর্কিত নিয়ম বার করা সম্ভব হয় না, তবুও পরিসাংখ্যিক নিয়মগুলি অর্থাৎ সমগ্র কণিকাসমষ্টির গতিসম্পর্কিত নিয়মগুলি জানা যায়। কিন্তু এই নিয়মগুলির অস্তিত্ব থেকে কি, পশ্চিমের ভাববাদীরা যেমন প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, অনির্ণেয়বাদের জয় সূচিত হয়? এই নিয়মগুলির অস্তিত্ব কি "নির্ধারণবাদের অন্তিমদশা" প্রমাণিত করে?

কখনই না। পদার্থবিদ্যার নবাবিষ্কৃত তথ্য থেকে অবৈজ্ঞানিক অনির্ণেয়বাদী সিদ্ধান্তগুলি শুধু অসমর্থিতই হয় নি, বস্তুত মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তার দ্বারা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদী নির্ধারণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

ভাববাদী দার্শনিকেরা শুরুই করেন এই তথ্য থেকে যে, স্বতন্ত্র কোন ইলেক্‌ট্রনের গতি অনির্ধারিত ও আপতিক। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। আমরা আগেই দেখেছি আপতিকেরও কারণ আছে; তাও নিয়ন্ত্রিত। পরিসাংখ্যিক নিয়মগুলি থেকে তা জানা যায়। যা মনে হয় মৌলিক পরমাণু-বাহৃত সমষ্টির আপতিক গতি, আসলে কিন্তু তা মধ্যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক থেকে যায়, এবং সেই সম্পর্ক পরিসাংখ্যিক নিয়মেব সূত্রে গাণিতিক হিসাবের মধ্যে ধরা পড়ে।

পরিসাংখ্যিক সমূহ আলাদা আলাদা সূক্ষ্মকণিকারই সমষ্টি। এই সমূহ এবং সূক্ষ্মকণিকাগুলির মধ্যে একটা গভীর দ্বন্দ্বসমন্বয়ী যোগ বিদ্যমান থাকে, যেমন থাকে একটি সমগ্র সত্তা ও তার অংশগুলির মধ্যে অথবা সাধারণ ও এককের মধ্যে। অতএব, এ কথা ভাবা ভুল যে, সমগ্রভাবে সমূহ কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন, অথচ পৃথকভাবে প্রতিটি সূক্ষ্মকণিকা কোন নিয়মের অধীন নয়, তারা "স্বাধীন" এবং কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। পরিস্থিতিটি ঠিক এর বিপরীত।

আগেই আমরা দেখেছি যে, সাধারণ সর্বদাই এককের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

সমষ্টির, সাধারণের (সূক্ষ্ম কণিকাগুলির সমূহের) নিয়মগুলি অনুশীলন করে আমরা এককের, বিশেষের, (স্বতন্ত্র সূক্ষ্মকণিকার) নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারি। যদি সাবেক পদার্থবিদ্যার প্রচলিত পদ্ধতিতে ইলেকট্রনের গতিপ্রকৃতি আমরা অনুধাবন করতে পারি এবং পরিসাংখ্যিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে বাধ্য হই, এর দ্বারা কখনই এই বোঝায় না যে, এক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধের অভাব আছে। এর দ্বারা শুধু এইটুকুই বোঝায় জগৎটা জটিল ও দ্বন্দ্বময় এবং একটি-মাত্র পদ্ধতির সাহায্যে গতিশীল বস্তুর সর্বপ্রকার রূপ অবধারণ করা এবং সর্বপ্রকার নিয়মকে একটিমাত্র গতীয় নিয়মে পর্যবসিত করা অসম্ভব।

ভাববাদীরা দাবি করেন, পরিসাংখ্যিক নিয়মের অস্তিত্বই অনির্ণেয়বাদের প্রমাণ, এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কার্যকারণ তত্ত্ব সূক্ষ্মকণিকাবিষয়ক পদার্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রে খাটে না। আসলে পরিসাংখ্যিক নিয়মগুলি ঠিক এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে। বিশেষ কারণের যে অস্তিত্ব আছে, এরাই তার নির্ভুল প্রমাণ। একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। সবাই জানে রুটির দোকানের খরিদ্দাররা কেউ "বাঁধাধরা" নয়, তারা পরিবর্তনশীল।

বলা যেতে পারে তারা আপতিক ঘটনা। তা সত্ত্বেও কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়ে যদি হিসেব করা যায় কত রুটি বিক্রয় হয়েছে, তাহলে দেখা যাবে রুটির বিক্রয় সংখ্যা প্রায় একই আছে। তথ্যের সংখ্যা অনেক হয়ে যাওয়াতে পরিসাংখ্যিক নিয়ম কার্যকর হতে আরম্ভ করে। এর থেকে কি বোঝা যায়, কারণের অস্তিত্ব নেই, না, অপরপক্ষে, বিশেষ কারণের পরিণামফল এই? প্রশ্নটি একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক, কারণ সমস্যাটির সারমর্ম বোঝার পক্ষে এর গুরুত্ব অনেক।

আপনারা জানেন, প্রতিটি এলাকায় নির্দিষ্টসংখ্যক অধিবাসী বাস করে, তাদের রুচি, তাদের আকাঙ্ক্ষা মোটামুটি স্থিরনির্দিষ্ট বলা যেতে পারে। রুটি বিক্রয়ের স্থিরনির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে প্রতিপন্ন হয়, যে স্থিরনির্দিষ্ট কতকগুলি সাধারণ কারণ ও অবস্থা এর পিছনে কাজ করছে। প্রত্যেকটি বিক্রয় আলাদাভাবে পরীক্ষা করলে এইগুলি প্রতীয়মান হয় না, তার কারণ প্রতিটি বিক্রয়ের মধ্যে কোন নিয়ম বা সঙ্গতি নেই, যা আছে তা আপতিক গরমিল। কিন্তু বহুসংখ্যক তথ্য নিলেই একটা নিয়মানুবর্তিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেইসঙ্গে যে সব সাধারণ কারণ ও অবস্থা থেকে নিয়মের আবির্ভাব ঘটেছে তাও বোঝা যায়।

পরিসাংখ্যিক নিয়মগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, যেহেতু সমগ্রভাবে আপতিক ঘটনাসমূহ একটি বিশেষ নিয়মে চালিত হয়, তাদের সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা থাকতেই পারে না। সূক্ষ্ম কণিকার জগতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অস্তিত্ব যে আছে তারাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (বাস্তব ঘটনাবলীর নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিকাশধারায় এ একটা বৈশিষ্ট্য)। পরিসাংখ্যিক পদ্ধতিতে এই নিয়মানুবর্তিতা জানা সম্ভব হয়, তার একমাত্র কারণ এই যে, আপতিক ঘটনাবলী তাদের অন্তর্নিহিত বাস্তব নিয়মের অধীন।

অতএব **বাস্তব জগতের ঘটনাবলী যে কারণনির্ভর ও বিশ্বযোগে যুক্ত, দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদী তত্ত্বের এই সত্যকে পরিসাংখ্যিক নিয়ম বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত করে। এর দ্বারা নির্ধারণবাদের জয় সূচিত হচ্ছে, তাকে "খণ্ডন" করা হচ্ছে না।**

অনেক আকস্মিক ঘটনা থেকে মানুষ উপকৃত হয়, আবার এমন অনেক আছে যা দুঃখকষ্ট নিয়ে আসে, যেমন, অজন্মা, বন্যা এবং এই ধরণের প্রাকৃতিক

দুর্যোগ। বিজ্ঞান অপরিহার্যতার ও নিয়মের অনুশীলন করে এদের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে।

অবাঞ্ছিত আপতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

কিন্তু, আপতন মূলপ্রত্যয়টি বিষয়াত্মক হওয়াতে, এই কাজ কি করা সম্ভব? হয়ত বলতে পারেন: মানুষের যা আয়ত্তাধীন নয় তার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা কি করে সম্ভব? বাস্তবিক একেবারে আপতনের হাত থেকে মুক্ত হওয়া সব সময় সম্ভব হয় না, কিন্তু তাদের অবাঞ্ছিত ফল থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি এবং হতেই হবে। যেমন এখনও পর্যন্ত আবহাওয়ার খামখেয়ালীর সঙ্গে যুক্ত প্রাকৃতিক ঘটনার হাত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি, যার ফলে ফসলের ক্ষতি এবং তা ধ্বংসেরও সম্ভাবনা রয়ে গেছে। কিন্তু অবাঞ্ছিত আপতনের ফলাফল সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব, তার কারণ যে অবস্থায় তারা প্রকাশ পায়, তারা সেই অবস্থাধীন। অতএব আমাদের এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেখানে আপতনের অবাঞ্ছিত ফল যৎসামান্য হয়, কিংবা একেবারেই হয় না।

সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই ক্ষেত্রে বাস্তবিক বিরাট কাজ করে চলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির কর্মসূচীতে এ কথা বিশেষ ভাবে বলা আছে যে, সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদের পথে ক্রমবিকাশকালে কৃষিসম্পর্কিত উৎপাদনী শক্তিগুলি এমন বৃদ্ধি লাভ করবে যে, "প্রকৃতির দয়ার উপর কৃষির নির্ভরতা অনেক পরিমাণে কমে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় না থাকার সামিল হবে।"১

এই লক্ষ্যে পৌছোবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে কয়েকটি বড় বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে: যেমন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপ্রজনন প্রচলন করা; দৃঢ়তর ভিত্তির উপর ও অনেক বেশী গভীরভাবে কৃষির বিশেষায়ণ সম্পাদন; কৃষির সমস্ত বিভাগে রীতিমতভাবে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার প্রচলন করা; জীববিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা; জলসেচনের ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যকর করা; ভূমি রক্ষার্থে বনাঞ্চলের বিস্তারসাধন; অনেক জলাধার গড়ে তোলা এবং চারণভূমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা; জল এবং হাওয়ার দরুন জমির ক্ষয় নিয়মিতভাবে রোধ করা।

১। দি রোড টু কমিউনিজম। পৃঃ ৫২৩।

কোন আপতিক ঘটনায় সারা দেশ যাতে অপ্রত্যাশিতভাবে কখনোই জড়িয়ে না পড়ে-সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টি যথাসাধ্য কাজ করে চলেছে। এর সঙ্গে জড়িত দেশের আভ্যন্তরিক জীবনযাত্রা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দেশের স্থান। সোভিয়েট সরকার একাধিকবার এই বলে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে যে, নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কোন এক আপতন, যেমন হাউড্রোজেনবোমা বহনকারী কোন এক বিমানের নিয়ন্ত্রণযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া, কিংবা বিমান-চালকের মানসিক অসুস্থতা, সারা পৃথিবীর ধ্বংস সূচিত করতে পারে। শান্তি বা যুদ্ধের প্রশ্নকে অন্ধ আকস্মিকতার উপর বরাত দিয়ে রাখা কিছুতেই চলতে পারে না।

সোভিয়েট সরকার কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সর্বক্ষেত্রে এবং সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব করেছে, কারণ যে-প্রকার আপতন ও দুর্ঘটনার কথা আগে বলা হয়েছে সেই রকম যাবতীয় আপতন ও দুর্ঘটনার হাত থেকে চিরতরে রক্ষা পেতে হলে আয়ুধহীন দুনিয়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভরসা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক অবস্থায় আপতিক কারণে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে, দুনিয়ার জনগণের তরফ থেকে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সব দেশের কমিউনিস্টরা সকল জাতিকে এই বলে জরুরী আবেদন জানিয়েছে যে, তারা যেন একালের সবচেয়ে জরুরী সমস্যা—শান্তির সমস্যা—সমাধানের জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে যান।

"আচ্ছা বেশ," আপনি বলতে পারেন, "এই রকম আকস্মিক ঘটনা বাস্তবিক রোধ করা যেতে পারে, স্বীকার করছি। কিন্তু, আগে যেমন দেখানো হয়েছে, একই সঙ্গে কতকসংখ্যক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ল, এই ঘটনা কি করে রোধ করা যাবে? কিংবা মারাত্মক দুর্ঘটনা কি করে নিবারণ করা যেতে পারে?" এই রকম দুর্ঘটনা একেবারে কমিয়ে আনা যায়। এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হয় যাতে দুর্ঘটনাগুলি কিংবা তাদের সাংঘাতিক পরিণামফল একেবারে কমে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী এই উদ্দেশ্যে এক কার্যধারা গ্রহণ করেছে। কর্মসূচীতে বলা হয়েছে: "শ্রমিকদের নিরাপত্তার ও স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক উপায়গুলি শ্রমশিল্পের সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত করা হবে, যাতে কার্যরত থাকাকালীন আঘাত পাবার সম্ভাবনা এবং অসুখবিসুখ নিবারণ করা যায়।"[১]

---

১ দি রোড টু কমিউনিজম পৃঃ ৫৪২

বিজ্ঞানে এবং শিল্পক্ষেত্রে আপতিক ঘটনার সম্ভাবনা ধরে নেবার প্রয়োজন প্রায়ই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নদীর উপর দিয়ে রেলের সেতু অথবা বাঁধ নির্মাণ করার সময় নদীর সর্বোচ্চ জলসমতল জেনে নিতে হয়; বাঁধ বা সেতুটিকে যথেষ্ট উঁচু ও শক্তভাবে নির্মাণ করতে হয় যাতে জলের তোড় খুব বেড়ে গেলে তার কোনো ক্ষতি না হয়।

সর্বোচ্চ জলসমতল হিসেব করে বার করা সহজ কাজ নয়, তার কারণ, অনেকগুলি আপতিক ঘটনার উপর তা নির্ভর করে, যেমন, বৃষ্টিপাতের বা শীতে তুষারপাতের পরিমাণ, বরফ গলার হার, কাছাকাছি বনাঞ্চল আছে কিনা, থাকলে, তার প্রকৃতি কিরকম, ওই এলাকার ভূমিপ্রকৃতি কি প্রকার, বরফ গলার সময় বাতাসের বেগ ও গতি, ইত্যাদি। একমাত্র এইসব কারণগুলির যখন অশুভ মিলন ঘটে, তখনই আলোচ্য ঘটনার আবির্ভাব হয়। পঞ্চাশ বা একশ বছরে তা হয়ত একবার দেখা দিতে পারে। এইরকম দুর্ঘটনা আগামী কাল ঘটবে, না, আসছে বছরে ঘটবে, না, একশ বছর পরে ঘটবে, কেউ তা বলতে পারে না। কিন্তু বাঁধটাকে অত্যন্ত মজবুত করে তৈরী করে মানুষ এই ধরণের আপতনের সর্বনাশা পরিণামের সম্ভাবনাকে দূর করে।

অতএব, আপতনের অবাঞ্ছিত পরিণামের সামনে মানুষ শক্তিহীন নয়। তার ধ্বংসাত্মক শক্তিকে নিস্তেজ করা বা নিবারিত করা তার সাধ্যায়ত্ত।

অপরিহার্যতার প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বাধীনতার সমস্যাও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত

অপরিহার্যতা এবং স্বাধীনতা

পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের জয়লাভের ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার কথা আগেই আমরা বলেছি। বর্তমান সময়ে এই দুই তন্ত্রের অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানও ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য।

প্রাকৃতিক অপরিহার্যতার ফলে যা অনিবার্য ঘটবে, তাই ঘটানোর জন্য কোন চেষ্টা করার তাহলে কি কোন সার্থকতা আছে?

সময়ে সময়ে এই প্রশ্নটি অন্যভাবে করা হয়। যেখানে সবকিছুই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত ও অপরিহার্য, সেখানে সক্রিয় ও স্বাধীন কার্যকলাপের কোন সম্ভাবনা আছে কি? শত শত বৎসর ধরে এই প্রশ্নটি দুটি দলের বিতর্কের

বিষয় হয়ে রয়েছে; তাদের বলা হয় স্বেচ্ছাবাদী ও নিয়তিবাদী। **স্বেচ্ছাবাদীদের** মতে জাগতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের **ইচ্ছাশক্তি** চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করে। তারা বিষয়মুখ অবস্থা, নিয়ম ও ঐতিহাসিক অপরিহার্যতাকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না। তাঁদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ মানুষের ইচ্ছার পথে 'বাধানিষেধে'র অবিদ্যমানতা। কিন্তু এই মতবাদ ভুল। এ জগতে কিছুই বিনা কারণে হয় না এবং কার্যরত থাকে না। ফলত, মানুষের ইচ্ছাও সবকিছু থেকে স্বাধীন থাকতে পারে না এবং নিছক খামখেয়ালীতে কাজ করে না।

নিয়তিবাদ ও স্বেচ্ছাবাদ

নিয়তিবাদীরা বিপরীত মত পোষণ করে। তারা অন্ধনিয়তিতে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের মূলে তাদের ধারণা এই যে, এ জগতে সবকিছুই বিধির বিধানে ঘটছে, কোন কিছুর রদবদল করা মানুষের শক্তির বাইরে।

নিয়তিবাদীদের মতবাদ মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। মানুষ যদি নিয়তিবাদীতত্ত্ব মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, তাহলে তার দুহাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা উচিত, কারণ সে জানে, ভগবান ত্রিকালজ্ঞ এবং তাঁর "বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে" সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে দেখা দেয় অসহায় ভাব। এই ধরণের মতবাদ শ্রমজীবী মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাসকে দমিয়ে দেয় এবং সেইসঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল নিপীড়নব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার সামর্থে তাদের আত্মবিশ্বাসও ক্ষীণ হয়ে যায়।

নিয়তিবাদী মনোভাব কতখানি অপকারক, নিচের উদাহরণ থেকেই তা বোঝা যাবে। পশ্চিমগোলার্ধের কোন কোন ব্যক্তি অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধের "ভয়াবহ অনিবার্যতা" "প্রমাণ করতে" বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ বোধ করে না। তাদের মতে মানুষ এ ব্যাপারে শক্তিহীন। আসল অবস্থা কিন্তু অন্যপ্রকার। সোভিয়েট সরকার এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, এই সরকার অস্ত্রসম্পর্কিত রেশারেশিকে এমন এক ভয়াবহ অনিবার্যতা বলে কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারে না, যা সর্বদা দেশে দেশে পারস্পরিক সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য।

অতএব নিয়তিবাদী ও স্বেচ্ছাবাদী উভয়েরই মতবাদ ভ্রান্ত। সমস্যাটাকে তারা তত্ত্বগতভাবে দেখে এবং হয় স্বাধীনতাকে নয়ত অপরিহার্যতাকে

মেনে নেয়। হয়, সবকিছুই মানুষের স্বাধীন কার্যকলাপের ফল, তাহলে অপরিহার্যতা বলে কিছুই থাকে না, নয়ত, সব কিছু নিয়মনিয়ন্ত্রিত অপরিহার্যতার দ্বারা নির্ণীত। তাহলে স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকতে পারে না। এই মতবাদ ত্রুটির ভিত্তি এই যে, অপরিহার্যতার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিসদৃশ।

এই সমস্যার সঠিক সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে?

স্বাধীনতা কি ? অপরিহার্যতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ

দৈনন্দিন জীবনে "স্বাধীনতা" বলতে প্রায়ই বোঝা যায় বাধানিষেধের অনস্তিত্ব। কখনো কখনো এও ভাবা হয় যে, অপরিহার্যতা বা প্রাকৃতিক নিয়মনিষ্ঠা স্বাধীনতাকে বর্জন করে: যেহেতু অপরিহার্যতা আছে, "বাধা" "বিপত্তি"ও থাকবে, অতএব স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তাহলে স্বাধীনতাসমস্যার সমাধান করতে হলে, প্রাকৃতিক অপরিহার্যতার নিয়মের অধীনে থেকে স্বাধীন হওয়া সম্ভব কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মহাকাশে পাড়ি দিতে গেলে মানুষকে বিশ্বজাগতিক মহাকর্ষের নিয়ম থেকে মুক্ত হতে হয়, যে নিয়মের নিগড়ে, বলা যেতে পারে, সে পৃথিবীতে আবদ্ধ। কিন্তু এই নিয়মকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে, তাকে অগ্রাহ্য করে, সে কি তা পারে? কিছুতেই পারে না।

কোন মহাকাশযাত্রী-বিমানকে তার নিজস্ব গতিপথে যেতে হলে তাকে এমন বেগ অর্জন করতে হয়, যাতে তার কেন্দ্রাতিগ বল পৃথিবীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থেকে বেশী হয়। (এই বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৮ কিলোমিটার)। বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বজাগতিক মহাকর্ষীয় নিয়মকে অগ্রাহ্য করে নয়, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেই মহাকাশে বিমান পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন।

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকরা যখন চন্দ্রলোকে রকেট প্রেরণ করেছিলেন, তখনও তাঁরা স্বভাবতই বিশ্বজাগতিক মহাকর্ষীয় নিয়মের উপর নির্ভর করেই তা করেছিলেন। রকেটটিতে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট একটি বেগ আরোপিত করা হয়, যার দ্বারা তা পার্থিব মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়, অতঃপর চন্দ্রের আকর্ষণ-বল তাকে চন্দ্রলোকে নামিয়ে আনে। এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা কত ভ্রান্ত, যারা এই কথা বলে: "আমরা যদি প্রাকৃতিক নিয়মের, অপরিহার্যতার বশীভূত হই, তাহলে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারাব," এবং যারা এই নিয়মগুলিকে এড়াবার উপায় খোঁজে যেহেতু তা "স্বাধীনতা খর্বকারী

অপরিহার্যতার প্রতীক"। স্বাধীনতা সম্পর্কে এদের ধারণা এই যে, তা সব রকম নিয়ম থেকে মুক্ত। এই ধারণা ভ্রান্ত।

আমাদের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিকেরা অপরিহার্যতার বিরুদ্ধে যায় নি, তাঁরা সেই অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই কাজ করেছেন। তাঁরা প্রাকৃতিক অপরিহার্যতা, প্রাকৃতিক নিয়ম জেনে তা যথোচিত ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা, প্রকৃতিকে তাঁদের আয়ত্তাধীন করার ক্ষমতা, অর্জন করেছেন। এইভাবেই তাঁরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন! অনেকদিন আগে ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, প্রকৃতির নিয়ম পালন করেই প্রকৃতিকে জয় করা সম্ভব।

সত্যিকারের স্বাধীনতা তাহলে কোথায় দেখা যায়? যেখানে কোন নিয়মই মান্য করা হয় না, সেখানে, না, যেখানে এইসব নিয়ম ভালোভাবে জেনে তার সদ্ব্যবহার করা হয়, সেখানে? দ্বিতীয় অনুকল্প যে সঠিক উত্তর. তা স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে। লেনিন এই কথাই এইভাবে বলেছেন: অপরিহার্যতাকে যতক্ষণ জানা যায় না ততক্ষণ তা অন্ধ। কিন্তু যদি অপরিহার্যতাকে বা নিয়মকে জানা যায়, যদি এর কার্যকলাপকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করি, তাহলে আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে পারব। এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "প্রাকৃতিক বিধান থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্নে স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনতা আছে এই বিধানগুলি জানার মধ্যে এবং এই জ্ঞান থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে এই বিধানগুলিকে নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করার যে সম্ভাবনা থাকে, তার মধ্যে।"[১]

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী, উভয় ক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে সামাজিক বিকাশের সূত্রগুলি জানা ছিল না। মানুষকে ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার দাসত্ব করতে হত। মার্কসবাদই এই সূত্রগুলি আবিষ্কার করে। যে পরিস্থিতিতে মেহনতী মানুষ এই সূত্রগুলির প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করে নিজেদের ভাগ্যের উপর যথার্থ প্রভুত্ব করতে এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারবে, সেই পরিস্থিতিতে পৌছোবার এই হল প্রথম ধাপ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করে।

অতএব মানুষের স্বাধীন কার্যকলাপ বলতে স্বেচ্ছাবাদীরা যা

১। এঙ্গেলস্, অ্যান্টি ডুহ্‌রিং, পৃঃ ১৫৭।

ধারণা করে থাকে তা নয়, নিয়মকে বা বিষয়াত্মক পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করার মধ্যে এবং যথেচ্ছাচার করার মধ্যে তা নেই। মার্কসবাদের কাছে সত্যিকারের স্বাধীনতা তাই যা অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে। মানুষের স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, প্রকৃতি ও সমাজ যে নিয়মে বিকাশলাভ করছে, সেই নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই নিয়মগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ মানুষের স্বাধীনতা অপরিহার্যতার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না।

কখনো কখনো এমন প্রশ্ন শোনা যায় "এ কি রকম স্বাধীন কার্যকলাপ যদি তাকে অপরিহার্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়? এক্ষেত্রে যতই বল না কেন, অপরিহার্যতাকেই মেনে চলতে হয়; অপরপক্ষে মানুষকে কখন স্বাধীন বলা যেতে পারে?" যখন সে সব কিছু অগ্রাহ্য করে নিজের কাযকলাপের জন্যে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।"

মোট কথা হচ্ছে, এই রকম স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। নিচের রূপকথা থেকে এর ভালোরকম একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে।

একবার একটি বায়ুশকুনের সঙ্গে একটি কম্পাসের ছুঁচের খুব বিতর্ক হয়।

বায়ুশকুন গর্বভরে বলে, "আমি স্বাধীন, আমি যে কোন দিকে ইচ্ছেমত ঘুরতে পারি। আর তুমি, ওরা তোমাকে যতই ঘোরাক না কেন, তোমাকে একই দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।"

"কি ধরণের স্বাধীনতা তোমার!" কম্পাসের ছুঁচ পাল্টা জবাবে বলল, "তুমি তো তোমার নিজের ইচ্ছেয় এদিক ওদিকঘোর না। বাতাসের দয়ায় তোমাকে থাকতে হয়। সেইজন্যেই তুমি অত উশখুশ কর। তোমার স্বাধীনতা একটুখানির জন্যে—এক ঝাপটা হাওয়ার পর থেকে আরেক ঝাপটা পর্যন্ত। সামান্য একটু হাওয়া লাগলেই তুমি দুলতে থাক। অথচ আমি, দেখ, স্থির-দৃষ্টিতে সুদূরের দিকে চেয়ে থাকি। যে আকর্ষণে আমার চুম্বকপ্রকৃতির অন্তঃস্থল থেকে সাড়া জাগে, তার সঙ্গে আমি মিথ্যাচরণ করি না। হাওয়ার খামখেয়ালীর পরোয়া আমি করি না। সর্বদা আমি একই দিকে লক্ষ্য স্থির রাখি। রাখি বলে লোকেরা সর্বত্র ঠিক পথের সন্ধান পায়।"

এই রূপকথার মর্মার্থ কি, তা যদি ভেবে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, স্বাধীনতা মানে সব কিছু অমান্য করে যথেচ্ছভাবে নিজের কার্যকলাপ স্থির করা

নয়। বায়ুশকুনও ভেবেছিল, সে তার স্বাধীন ইচ্ছায় ঘোরে, আসলে কিন্তু সে ঘোরে বাতাসের ইচ্ছায়।

পুঁজিবাদী দেশের পেটিবুর্জোয়া পণ্ডিতরা মনে করেন, তাঁরা তাঁদের চিন্তা-পদ্ধতি পুরোদস্তুর "স্বাধীনভাবে" স্থির করে নিয়েছেন, তাঁদের কামনা বাসনা, তাঁদের অভ্যাস "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা"র ফল। আসলে কিন্তু যে অবস্থায় তাঁরা বাস করেন, তাঁরা তারই দাসত্ব করেন, তাঁরা ব্যক্তিগত সঞ্চয়প্রবৃত্তির দাস, যে প্রবৃত্তি তাঁদের সমগ্র জীবনযাত্রায় পরিপুষ্ট। যে অর্থে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা"র কথা বলেন, তার চিহ্নমাত্রও এখানে নেই। এখানে সবকিছুই অপরিহার্যতার অধীন। পুঁজিতন্ত্রে এই অপরিহার্যতা অন্ধ সামাজিক শক্তিরূপে দেখা দেয়। রূপকথার প্রতিকূল হাওয়ার মত প্রতিকূল আবহাওয়ায় জনগণের ভাগ্য দুলতে থাকে।

সমাজতন্ত্রের আওতায় স্বাধীনতা বলতে একেবারে অন্য জিনিস বোঝায়। এই স্বাধীনতার ভিত্তি **অপরিহার্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান**। নিয়মগুলি এক্ষেত্রে অন্ধ সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করে না। মানুষের কার্যকলাপের গোড়ায় থাকে সমাজ বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

অপরিহার্যতা এবং জনসাধারণের সক্রিয় কার্যকলাপ

মার্কসবাদের যারা শত্রু তারা বলে থাকে মার্কসবাদের অনিবার্য পরিণাম নিয়তিবাদে এবং জনসাধারণের স্বাধীন সক্রিয় কার্যকলাপের অস্বীকৃতিতে, যেহেতু মার্কসবাদের মতে বিষয়াত্মক নিয়মের কার্যকারিতার ফলে বিশ্বজগৎ বিকাশলাভ করেছে এবং এখানে মানুষের ইচ্ছার বা চেতনার কোন প্রক্রিয়ার নেই। এর দ্বারা তারা এই বোঝাতে চায় যে, মার্কসবাদীদের ধারণায় পূর্বনির্ধারিত অনিবার্য পদ্ধতিতে জগতের বিকাশলাভ ঘটছে। এবং এতৎসত্ত্বেও মার্কসবাদীরা যদি মানুষের সক্রিয় স্বাধীন কার্যকলাপের কথা বলে, তাহলে তার দ্বারা তারা তাদের নিজস্ব মতবাদেরই বিরোধিতা করবে।

তারা বলে, সাম্যবাদ যদি অনিবার্যভাবেই আসে, তাহলে তার জন্যে অযথা সংগ্রাম করা কেন ? কেবল তার জন্যে অপেক্ষা করলেই তো হল। কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে সাম্যবাদ যাতে জয়লাভ করে তার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার দরকার কি ? গ্রীষ্মকাল বা বসন্তকালকে আনার জন্যে কেউ দল গঠন করে না, তারা বলে।

আধুনিক সংশোধনবাদীরা পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে "ধীরে ধীরে রূপপরি-গ্রহে"র কথা বলে এবং এর জন্যে তারা নির্ভর করে পুঁজিবাদের "স্বতঃক্রিয় পতনে"র উপর, অর্থাৎ যে পতন জনসাধারণের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ছাড়াই সংঘটিত হবে।

এই রকম বিকট নিয়তিবাদী ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদের কোনই মিল নেই। মার্কসবাদ স্বীকার করে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের জয়লাভ অপরিহার্য, কিন্তু তা স্বতঃক্রিয়ভাবে সংঘটিত হবে, একথা কখনই বলে না।

আসল কথা এই, প্রাকৃতিক ঘটনার অপরিহার্যতা থেকে সামাজিক ঘটনার অপরিহার্যতা মূলত আলাদা। সামাজিক বিকাশপদ্ধতিতে অপরিহার্যতা ভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয়; তা দিনের পরে রাতের মত বা বসন্তের ও গ্রীষ্মের আবির্ভাবের মত নয়। এই ঘটনাগুলি ঘটানোর জন্যে মানুষের কিছু করার দরকার হয় না।

সমাজে যা কিছু আছে তা মানুষের কর্মপ্রসূত, তারই শ্রম ও বৈপ্লবিক কাজের ফল।

প্রশ্ন হতে পারে, "এর থেকে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, সামাজিক অপরি-হার্যতা মানুষের উপর নির্ভর করে এবং মানুষেরই সৃষ্ট?" না, তা নয়। সামাজিক ঘটনাবলী মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বাধীনভাবে বাস্তব উৎপাদন যে নিয়মে বিকাশ লাভ করে তারই ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়। সামাজিক অপরিহার্যতা প্রাকৃতিক অপরিহার্যতার মতই বিষয়াত্মক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আগে আমরা যা বলেছি, দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক অপরিহার্যতায় মানুষের কার্যকলাপ ধর্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক জীবনে মানুষের কার্যকলাপ অন্যতম উপাদান, যা না থাকলে অপরিহার্যতা পূর্ণাঙ্গ লাভ করে না এবং আত্মপ্রকাশ করে না।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। সব মানুষ সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম না করলে যুদ্ধ কি এড়ানো সম্ভব? কিছুতেই না। শান্তির শক্তিগুলি যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, যুদ্ধের মারণ শক্তিগুলি অনিবার্যভাবেই অধিক সক্রিয় হয়ে উঠবে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বিপন্ন হবে। এই কারণেই, পৃথিবীতে শান্তি আসবে, না মানবজাতি নতুন এক বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ে নিমজ্জিত হবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা জনসাধারণের নিজেদের উপর, তাদের সংকল্প ও কার্যকলাপের উপর নির্ভর করছে।

যুদ্ধের ভয়ংকর অনিবার্যতা স্বীকার করার অর্থ শান্তির সংগ্রামে জনগণকে নিস্পৃহ করা এবং শান্তির শক্তিগুলিকে ছত্রভঙ্গ করা। অপরপক্ষে, যুদ্ধ মারাত্মকভাবে অপরিহার্য নয়, এই স্বীকৃতি ও বিশ্বাস থেকে শান্তির সমর্থকদের দল ভারি হয়ে ওঠে এবং শান্তির যোদ্ধারা মনে বল পায়।

অতএব, জগতে যেসব ঘটনা ঘটছে সে সব সম্পর্কে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করা ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার সূত্রে বাদ যায় না তো বটেই, অপরপক্ষে, তা ওই সূত্রে পূর্বকল্পিত। মানুষের স্বাধীন, সক্রিয় কার্যকলাপের উপর মার্কসবাদ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসবাদ এর নামকরণ করেছে **জ্ঞাতৃগত উপাদান** ; এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছে সেই শক্তি ও কারণগুলি যা জ্ঞাতার উপর, জনসাধারণের উপর, তাদের জ্ঞানের ও সক্রিয় কার্যকলাপের উপর এবং ঘটনাধারাকে সাবলীল পথে চালিত করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

যে সোভিয়েট জনসাধারণ সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলছে, তাদের জীবনের বোধহয় সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের সচেতন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপ।

আগে থেকে রচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সচেতনভাবে কাজ করে মানুষ যদি সাম্যবাদের উপযোগী বাস্তব ও প্রায়োগিক ভিত্তি রচনা করতে পারে, তাহলে কি এই বোঝায় না যে, সাম্যবাদ গড়ে তোলার ব্যাপারটা বাস্তব অবস্থা বা অপরিহার্যতা বা নিয়মসূত্র দ্বারা আর নির্ণীত হয় না ? না, তা নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক বিকাশধারার নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সাম্যবাদ গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার পূর্ববর্তিতার তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; এই তত্ত্ব সর্বাত্মক সাম্যবাদী গঠনের কালে পুরোপুরি প্রযোজ্য।

যদি বাস্তব অবস্থার তাৎপর্য এমনি চূড়ান্ত হয়, মানুষের স্বাধীন, সক্রিয় কার্যকলাপের কি করণীয় থাকতে পারে ?

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে সমাজবিকাশের নিয়মের সাহায্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাম্যবাদ গঠনের সম্ভাবনা অর্থনৈতিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সাম্যবাদের বাস্তব ও প্রয়োগিক ভিত্তি গড়ে তুলতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী যে সময় লাগবে, তা দেশের বাস্তব সম্পদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্প ও কৃষির সহজাত সম্ভাবনার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়।

তা সত্ত্বেও কিন্তু কর্মসূচীতে যে পরিকল্পনাগুলির কথা ভাবা হয়েছে তা স্বতঃক্রিয় হয়ে আপনা-আপনিই রূপায়িত হয়ে উঠবে না। তার জন্যে দরকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের স্বতোৎসাহী ও সত্যকার সৃজনশীল শ্রম।

বিষয়মুখ অবস্থা ও জ্ঞাতৃগত উপকরণ, এই দুইয়ের সম্বন্ধের উপর মার্কসবাদী ধারণা থেকে, সাম্যবাদী সমাজ যে বিগত সমাজগুলির মত আপনা-আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে না, তার বিকাশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের পরিচালনায় সাধারণ মানুষের সচেতন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপের ফলেই সম্ভব, মার্কসবাদের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব থেকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী রচিত। সর্বাত্মকভাবে সাম্যবাদ গড়ে তোলার সময়ে জ্ঞাতৃগত উপকরণের, জাতির স্বাধীন ও সক্রিয় কার্যকলাপের, গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়ে যায়। এই মহান কর্তব্য সার্থক করে তুলতে এর তাৎপর্য খুব বেশি। মানুষের সক্রিয় কার্যক্ষমতা অবশ্য বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং তার থেকেই উদ্ভূত হয়।

সাম্যবাদ পৃথিবীতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। বুর্জোয়া দার্শনিকরা ও সমাজতাত্ত্বিকরা স্বাধীনতার ধারণাকে বিকৃত করেছেন। তাঁরা সম্পূর্ণ সমস্যাটাকে "'আত্মার তুরীয় স্বাধীনতা" লাভের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, তোমাকে দাসত্ব করতে হতে পারে, তোমার পায়ে বেড়ি থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যদি মনে কর, তোমার আত্মিক সত্তা তোমার অবস্থার দ্বারা বিপযস্ত হচ্ছে না, তাহলে তুমি স্বাধীন।

বুর্জোয়া সমাজে সব মানুষকেই স্বাধীন ভাবা হয়। কেউ শ্রমিককে কাজ করতে বাধ্য করে না এবং পুঁজিপতিকেও কাজ দিতে বাধ্য করে না। শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। তার যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এইসবের ভিত্তিতে বুর্জোয়া প্রচারকেরা জাহির করতে থাকে যে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভাববাদীরা পুঁজিবাদী দেশগুলির জন্যে আলাদা একটি নামও আবিষ্কার করেছেন—তাঁরা এই দেশগুলির নামকরণ করেছেন 'স্বাধীন জগৎ'। দেখা যাক এই 'স্বাধীন জগৎ' বাস্তবিকই স্বাধীন কিনা।

একজন মানুষকে স্বাধীন হতে হলে, সামাজিক জীবনের যে অবস্থাসমূহের মধ্যে সে বাস করছে, সেইগুলির উপরও তার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকা দরকার

পুঁজিবাদী বা অন্য কোন শোষণকারী সমাজে এই সামর্থ্য অর্জন করা কি সম্ভব ?

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষ স্বাধীন কিনা, এই প্রশ্নের জবাব মুখ্যত নির্ভর করে, যে অবস্থার মধ্যে সে বাস করছে, সমাজে যে স্থান সে অধিকার করে আছে, তার উপর। ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিরুদ্ধশ্রেণী সমন্বিত যে কোন সমাজে এক শ্রেণীর স্বাধীনতার অর্থ আর সবার দাসত্ব। লেনিন বার বার একথা বলেছেন যে, স্বাধীনতা হচ্ছে শ্রেণীগত একটি সুবিধা। অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় শ্রেণীস্বরূপের বিশ্লেষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, স্বাধীনতার সন্ধান করা, হয় প্রবঞ্চনা, নয় মায়া-মরীচিকা রচনা।

উৎপাদনের উপকরণগুলি যাদের দখলে তারাই স্বাধীনতার অধিকারী। যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অধিকারে এবং তারই পরিণতিতে মানুষের উপর মানুষের শোষণ অপ্রতিহত, সেখানে শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীনতা নেই, কারণ যে বাস্তব ভিত্তিতে মানুষের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব, এই অবস্থায় তার অস্তিত্বই নেই। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বাধীনতার কেতাবী অর্থটুকুই শুধু বোঝে। তা ব্যবহার করে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয় না। যারা শোষণকারী একমাত্র তারাই স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। 'দি ফিলসফি অফ ফ্রিডম' বইয়ে একালের জাপানী দার্শনিক জানা-গিডা কেন্‌জুরো লিখেছেন, "বিশুদ্ধ স্বাধীনতা, বাস্তব ভিত্তিহীন একটা ভাবের মত স্বাধীনতা, যেন শিকড়হীন ফুল। তা যতই সুন্দর হোক, তা খুব শীঘ্রই শুকিয়ে ঝরে পড়বে।" লেনিনও এই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। যে সমাজ আর্থিক ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মেহনতী মানুষের বিপুল অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিক পরগাছার পাশাপাশি থেকে দারিদ্রে দৈন্যে দিন কাটায়, সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, এক-চেটিয়া মূলধন পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল, অগণতান্ত্রিক স্বরূপকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। আগেকার সীমায়িত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিও এ বরদাস্ত করতে পারে না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের "বিতর্কে" পুলিশের বেটন ও বুলেটের প্রয়োগ হয় বেশি। এই তাদের "স্বাধীন জগৎ", যে সমাজে সত্যিকারের

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নেই, যে সমাজের ভিত্তি সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়ন ও অসাম্য, মানুষের উপর মানুষের শোষণ, মানুষের মর্যাদা ও সম্মান যে সমাজে ধূলায় লুন্ঠিত।

অতএব, **ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নেই এবং থাকতে পারে না।** "স্বাধীন, ধনতান্ত্রিক জগৎ" বুর্জোয়া প্রচারকদের মনগড়া কল্পনা।

কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলে এবং সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন করে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিক কৃষক এবং সমস্ত মেহনতী মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, কারণ মানুষ তখনই কেবল নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে, যখন সে তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার মত উপযুক্ত বাস্তব অবস্থার অধিকারী হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ মেহনতী মানুষের জন্যে এমনি অবস্থার সৃষ্টি করে। এই কারণে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র অপরিহার্যতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে উল্লম্ফন। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের আওতায় মানুষ সমাজবিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং অন্ধ অপরিহার্যতাকে স্বাধীনতায় পর্যবসিত করতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা থেকে এঙ্গেল্‌সের অনুমান সমর্থিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রে বেকারির ভয় নেই, কাল কি হবে সে বিষয়ে ভাবনা নেই, শোষণকারীর অস্তিত্ব নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই অবস্থা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পথে মানুষের অগ্রগতি এখানেই থেমে থাকে না। **আদিম প্রাকৃতিক শক্তির কবল থেকে মুক্তিলাভের যে সাধনায় মানুষ নিয়োজিত, সেই সাধনার উচ্চতর স্তর, সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা। তখন স্বাধীন সৃজনধর্মী শ্রমের অনুকূল মানুষের সর্বপ্রকার শক্যতা ও প্রতিভাবিকাশের অনুকূল যাবতীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে।** সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারই ফলে প্রকৃত স্বাধীনতার রাজ্যে যাত্রাপথে মানুষের শেষ বাধা অপসারিত হবে। এর অর্থ, সাম্যবাদ কর্তৃক পৃথিবীতে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রবর্তন। এর থেকে অবশ্য এই বোঝায় না যে, মানুষ তখন সমাজ ও সমূহীকৃত প্রয়াসের সদস্যগণ সম্পর্কিত সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে, কিংবা সামাজিক আচার-আচরণ থেকে মুক্ত হবে। যে স্বাধীনতায় অপরিহার্যতা

স্বীকৃত, তা নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা এবং নিয়মানুবর্তিতা তার পূর্বকল্পিত।

কমিউনিস্ট পার্টি তার সদস্যদের এমনভাবে শিক্ষা দেয় যে, তারা পার্টিগত ও শ্রমসংক্রান্ত নিয়মনিষ্ঠা কঠোরভাবে পালন করার মনোভাব অর্জন করে। লেনিন একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে গেছেন যে, শ্রমজীবী মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত স্বাধীন ও সচেতন নিয়মনিষ্ঠার উপর গড়ে ওঠে সাম্যবাদী শ্রমিকসংগঠন। সংগঠন যত বিকাশলাভ করে, নিয়মনিষ্ঠাও তত বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে "সাম্যবাদী উৎপাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজন উচ্চাদর্শের সংগঠন, নির্ভুলতা ও নিয়মানুবর্তিতা। এইগুলি নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেতে পারে, জবরদস্তিতে নয়, জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে, এবং নির্ণীত হয় সাম্যবাদী সমাজ জীবনের সমগ্র কাঠামো দ্বারা।"১

স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা

লেনিন পার্টির নিয়ম মেনে চলার দাবি বারংবার করেছেন। অভিপ্রায়ের ঐক্য এবং লৌহকঠিন নিয়মনিষ্ঠা পার্টিকে অখণ্ড এক সাকল্যে আবদ্ধ করে এবং দুর্নিবার শক্তির অধিকারী করে। আসলে, ঐতিহাসিক বিকাশধারার নিয়ম ও প্রবণতাগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা প্রকাশ করে। এর কর্মসূচীতে সমাজের বাস্তব প্রয়োজন, জাতির আকাঙ্ক্ষা, প্রতিফলিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি প্রবর্তিত নিয়মাবলীতে নির্দেশ দেওয়া আছে, কিভাবে প্রত্যেক কমিউনিস্ট এই কর্মসূচীকে সার্থকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে কাজ করবে।

অতএব, এই সব নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়ে পার্টির সদস্যরা পার্টির ও রাষ্ট্রের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার জন্যে সচেতন চেষ্টা করেন, সেইসঙ্গে তাঁরা পুরোপুরি একথাও প্রণিধান করেন যে, পার্টির নীতি সমাজবিকাশের নিয়ম ও জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে। সেইজন্যেই একজন কমিউনিস্ট কাজ করেন স্বাধীনভাবে। একজন কমিউনিস্টের কাছে নিয়মানুবর্তিতা সেই ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার প্রতিফলন, যা স্বীকার না করলে প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

তাহলে, যথার্থ স্বাধীনতা নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে শুধু সঙ্গতি রেখেই

১। দি রোড টু কমিউনিজম পৃঃ ৫১১।

চলে না তার উপর নির্ভরও করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এত শক্তিশালী, তার কারণ শ্রেণীস্বার্থের ঐক্য এবং কার্যের ও ইচ্ছার ঐক্য। এর ফলে সদস্যদের মধ্যে সচেতন নিয়মনিষ্ঠা জাগ্রত হয়।

হয় এবং সেই স্বাধীনতা ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করে।

ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা। আসল এবং নকল মানবতা

আগেই বলা হয়েছে, সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতার যে সমস্যা তাতে এই প্রশ্নও জড়িত যে, শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক ও সুখী জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা কোন্ প্রকারের সমাজব্যবস্থায় বাস্তবিক সম্ভব? অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন্ ধরণের সমাজ "মানুষের জন্যেই সবকিছু" এই নীতিকে বাস্তবিক কার্যকর করতে পারে? এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, শেষ পর্যন্ত দুইটি ব্যবস্থাব শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতাব ফলাফল নির্ভর করবে, দুইটির মধ্যে কোন্টি মানুষেব পার্থিব ও আত্মিক প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারবে, তার উপরে।

বুর্জোয়া নেতারা এবং তাদের ভাববাদী অনুচরেরা বলে থাকে যে, এই সমাজ পশ্চিম ভূখণ্ডের "স্বাধীন জগৎ" বলে কীর্তিত হবে। তারা নিজেদের "যথার্থ মানববাদী" বলে জাহির করে এবং হলপ করে যে, তাদের মানবপ্রেমে খাদ নেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা বলে থাকে যে, তারা "মানববাদী সমাজতন্ত্র" প্রবর্তন করতে চায়। অন্যেরা ধনতন্ত্রেব উপর নূতন রং লাগিয়ে তার নামকরণ করে "অর্থনৈতিক মানববাদ।" ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে মানববাদের যোগসূত্র টানেন। তাঁরা বলেন, স্বর্গীয় সৃষ্টির সার্থকতম নিদর্শন মানুষ এবং এই মানুষের জন্যেই ঈশ্বর সমস্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি সৎ ভাবনার উদ্রেক করা এবং "মানবতা" ও "মানবপ্রেমের" জন্য গীর্জার প্রতি কৃতজ্ঞতা জাগ্রত করা।

মানবতা সম্পর্কে এইসব মতবাদের উদ্দেশ্য, মানুষ যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মজ্জাগত অমানবিক প্রকৃতি বুঝতে না পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোন কিছুই শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, সবকিছু তাদের দাস করে রাখার জন্যে।

"অর্থনৈতিক মানববাদে"র ধ্বজাধারীরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা আদায় নয়, মানুষের প্রয়োজন

মেটানো। এ একেবারে নগ্ন প্রতারণা। পুঁজিতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতির লক্ষ্য মানবসেবা কখনই নয়। এর একমাত্র লক্ষ্য ও চালকশক্তি সম্পদবৃদ্ধি। শোষণকারীদের "অর্থনৈতিক মানববাদে"র কথা বলা দরকার হয়, যেহেতু যে বিরোধগুলি ধনতান্ত্রিক সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে, এই বলে তা চাপা দেওয়া যায়। তারা প্রচার করে, শোষণকারী ও শোষিত, উভয় শ্রেণীর মানুষের প্রতিই তাদের সর্বাত্মক ভালাবাসা। এবং তারা দেখাতে চায়, এই প্রকার ভালোবাসাই "বিশুদ্ধ মানববাদে"র যথার্থ লক্ষণ।

অতএব বুর্জোয়া ভাববাদীদের তথাকথিত মানববাদী তত্ত্বগুলি পুরোমাত্রায় ছলনা। তারা যে মানবতা প্রচার করে তার উদ্দেশ্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শ্রমজীবী মানুষ সর্ববিষয়ে বঞ্চিত হয়ে যে অবস্থায় থাকে তা ধামাচাপা দেওয়া।

যথার্থ মানববাদের সারমর্ম কী?

মানববাদ সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি, জনসাধারণের বৃহদংশের প্রতি, ভালোবাসা এবং তাদের সুখের জন্য, তাদের জীবন যথাসম্ভব সফল ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য সংগ্রাম। যে সমাজ শোষণের উপর এবং ব্যক্তিগত বিত্ত-বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজে এই স্বাধীনতা লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। আগে আমরা দেখেছি, যথার্থ মানববাদ কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের জয়লাভ থেকেই সম্ভব। সুতরাং, সাম্যবাদ ও যথার্থ মানববাদের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। এই সম্বন্ধ কি ভাবে প্রকাশিত হয়?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ব্যক্তির সুসঙ্গত বিকাশের উপযোগী বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজনের কথা প্রথমেই বলে। ব্যক্তি তখনই স্বাধীন হতে পারে, যখন সে শোষণ থেকে, আগামীকালের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হয়। সমাজ তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে মুক্ত না করে মুক্ত হতে পারে না। তাহলে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ নির্ভর করে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আমলে যে প্রকৃত বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার উপরে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: "সোভিয়েট সমাজ ব্যক্তির যথার্থ স্বাধীনতা অঙ্গীকার করে। এই স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ শোষণ থেকে মানুষের অব্যাহতি।"[১]

১। **দি রোড টু কমিউনিজম**, পৃঃ ৪৬০।

সাম্যবাদ এমনই একটি ব্যবস্থা, যেখানে স্বাধীন মানুষের ক্ষমতা, প্রতিভা এবং সুকুমার নৈতিক গুণগুলি বিকাশ লাভ করতে এবং পূর্ণপ্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু সাম্যবাদী সমাজের পতাকা এই বাণী বহন করছে "সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছ থেকে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেককে", এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির এই মূলমন্ত্রটি পুরোপুরি মূর্ত হয়ে উঠেছে: "সবকিছু মানুষের জন্যে, সবকিছু মানুষের উপকারের জন্যে।"

সাম্যবাদের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে মানবপ্রেম। কিন্তু এই প্রেম বন্ধ্যা, খৃষ্টানী, বিশুদ্ধ "প্রেম" নয়, যে প্রেম প্রায়শই কেবলমাত্র উপদেশে ও বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক সদিচ্ছায় সীমাবদ্ধ থাকে। এই মানববাদের ডাক কর্মক্ষেত্রে, সাম্যবাদ গঠনকার্যের প্রয়োগিক কর্তব্যসাধনের ক্ষেত্রে, যে কর্তব্য সম্পন্ন হলে সেই মহামন্ত্র "সবকিছুই মানুষের জন্যে" সফল করা সম্ভব হবে।

সাম্যবাদ মানবজাতির এবং ব্যক্তির ক্রমবিকাশে সর্বোচ্চ শিখরচূড়া

এর থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্যবাদী সমাজ ব্যক্তিবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অবস্থা সৃষ্টি করে। যে মার্কসবাদ সাম্যবাদী গঠনপ্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও প্রয়োগকে বিশদরূপ দান করেছে, তাই হচ্ছে যথার্থ মানববাদ— আমাদের যুগের মানববাদ। মানববাদের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষেব স্বাধীনতাও তা সঙ্গে করে আনে।

আমরা দেখেছি, যথার্থ স্বাধীনতা লাভ তখনই বাস্তব সত্য হতে পারে যখন প্রত্যেকটি ঘটনা ও প্রক্রিয়ার পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ অবস্থা বর্তমান থাকে। এরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সম্ভাব্যতা ও বাস্তববার মূল প্রত্যয়গুলি।

সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা

কোন না কোন সময়ে আপনাকে স্থির করতে হয়েছে, কোন অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে সম্ভব কিনা। আমরা সাধারণত তাকেই সম্ভব বলে অভিহিত করি, যা সাধ্য অথবা যা ঘটতে পারে।

সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা কি কি?

সিওলকোভ্স্কি যখন রকেট-তত্ত্ব বার করলেন এবং জেট-চালিত ইঞ্জিন যখন উদ্ভাবিত হল, তখন চন্দ্রলোকে পাড়ি দেওয়ার সম্ভাব্যতা দেখা দিল। যখন একটি সোভিয়েট রকেট চাঁদে একটি কেতন পৌছিয়ে দিল

এল, তখন আমাদের চোখের সামনে চন্দ্রলোকে পাড়ি দেওয়ার সম্ভাব্যতা বাস্তবতায় রূপান্তরিত হল।

তাহলে সম্ভাব্যতা তাকেই বলে, যা এখনও সম্পাদন করা হয় নি, এখনও যার অস্তিত্ব নেই কিন্তু যার প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যে রূপান্তরিত হবার সর্বপ্রকার কারণ বিদ্যমান। বাস্তবতা কিন্তু এমন কিছু, যা ইতিপূর্বেই বাস্তব রূপে পরিণত হয়েছে, যা বাস্তবিক আছে এবং যা প্রাকৃতিক অপরিহার্যতা ও বাস্তব নিয়মের সূত্রে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা বিপরীত। কিন্তু তারা কি সম্বন্ধযুক্ত?

তত্ত্ববাগীশেরা তাদের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগ অস্বীকার করেন, তাঁরা একের থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। কেউ কেউ বলেন: সম্ভাব্যতার অস্তিত্ব নেই। কোন ঘটনার অস্তিত্ব এখনও নেই মানে, তার আবির্ভাবের উপযোগী কোন ভিত্তি বা অবস্থাও নেই। যদি কোন ঘটনার আবির্ভাব হয়, তার অর্থ যে সব অবস্থা থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে, তা সবেমাত্র দেখা দিয়েছে, এবং আগে যে সব সম্ভাবনা ছিল, তাদের সঙ্গে এর কোন সংশ্রব নেই।

অন্য তত্ত্ববাগীশেরা বলে থাকেন, সবই সম্ভব। কিছুই অসম্ভব নয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সাগর শুকিয়ে দিতে পারেন, আবার আগুনে জ্বালিয়েও দিতে পারেন, কিংবা সূর্যকে তার যাত্রাপথে থামিয়েও দিতে পারেন—সব রকম অলৌকিক ব্যাপারই তাঁর সাধ্যায়ত্ত। মানুষও সবকিছু করতে পারে, যদি তার "অলৌকিক ব্যক্তিত্ব" থাকে। এই রকম মানুষের কাছে যা সম্ভব তাই বাস্তব।

কিন্তু এই সব দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভ্রান্ত। যারা সম্ভাব্যতার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না এবং যারা সম্ভাব্যতাকে বাস্তবতার সঙ্গে এক করে দেখেন, উভয়েই ভুল করেন।

এই ভুলের গোড়ায় গলদ কি? গলদটা এইখানে যে, বাস্তবতার ও সম্ভাব্যতার প্রশ্নটাকে যেভাবে এঁরা ব্যাখ্যা করে থাকেন, তার সঙ্গে বাস্তবজীবনে যা ঘটে তার কোন সম্পর্ক নেই। **কি হতে পারে, কি হতে পারে না, তা মানুষের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তা নির্ধারিত হয় জীবনে যে সব কারণ, অবস্থা বা নিয়ম বিদ্যমান থাকে তার দ্বারা।** নিচের দৃষ্টান্তটা এই সূত্রে বিবেচনা করে দেখুন। আমেরিকার বুর্জোয়া প্রচারকেরা আমাদের আশ্বাস দেয় যে, সে দেশে সবার সমান সুযোগ। প্রত্যেকের ধনী হবার

সেখানে "সমান সুবিধা"। সত্যের কি অপলাপ!

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে এমন সব কারণ বিদ্যমান থাকে, যার ফলে যারা ধনী, তারা আরো ধনী হতে থাকে এবং যারা দরিদ্র, তারা আরও নিঃস্ব হতে থাকে। ফলত শ্রমজীবী লোকদের সেই দুনিয়ায় টিঁকে থাকবার যথার্থ সম্ভাব্যতা নেই।

আরেকটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধর্মযাজকেরা যে সব অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন তা সম্পন্ন হবার মত সম্ভাব্যতা আছে কি? অলৌকিকতা এমন ঘটনা যা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী এবং এই নিয়মের সাহায্যে তার ব্যখ্যাও করা যায় না। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, এই জগতে এমন কোন ঘটনা বা ব্যাপার নেই এবং হতেও পারে না, যার উদ্ভব প্রকৃতির বা সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করে। অতএব অলৌকিকে বিশ্বাস করা মানে অসম্ভবে বিশ্বাস করা।

তাহলে সম্ভাব্যতা কেবলমাত্র তাই যা প্রকৃতির ও সমাজের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। বাস্তবতাও প্রকৃতির ও সমাজের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। উভয় মূলপ্রত্যয়ই বাস্তব নিয়মধর্মী, কারণ বস্তর ও ঘটনার সেই সব বিশেষত্ব তাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় যা আমাদের চেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

আপনারা বলতে পারেন "এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে চন্দ্রলোকে পাড়ি দেওয়া হাজার বছর আগেও সম্ভব ছিল, যেহেতু তখনও তা প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী ছিল না।" কিন্তু আমরা জানি, এমন কি তিরিশ বছর আগেও চন্দ্রলোকে যাত্রা অবাস্তব কল্পনা বলে বিবেচিত হত। এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে? আসল কথা হচ্ছে সম্ভাব্যতার প্রকারভেদ আছে। হাজার বছর আগে যদি কেউ বলত মহাকাশে যাত্রা করা সম্ভব, তার সেই কথা অসত্য বলে গণ্য হত। এখন সবাই জানে এইরূপ যাত্রা সম্ভব। কেন এ রকম হয়, যে সম্ভাব্যতা মূলত একই তা একবার মনে হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা দ্বিতীয়বার তাই মনে হচ্ছে বাস্তব রূপায়ণের প্রাথমিক অবস্থা?

বিধিবৎ (বিমূর্ত) এবং প্রকৃত সম্ভাব্যতা

মূল কথা হচ্ছে, হাজার বছর আগে মহাকাশে পাড়ি দেবার প্রত্যক্ষ অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য তখনও প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে মহাকাশে পাড়ি দেবার সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে পরিণত করা যেত। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে, সম্ভাব্যতার বাস্তব রূপপরিগ্রহের সঙ্গে, এই সম্ভাব্যতার সম্বন্ধ হত অত্যন্ত সুদূর

পরাহত। সম্ভাব্যতার রূপপরিগ্রহের পক্ষে যে প্রত্যক্ষ অবস্থাগুলি আবশ্যিক, তার সঙ্গে সম্ভাব্যতার যোগ না থাকলে তাকে বলা হয় বিমূর্ত বা বিধিবৎ সম্ভাব্যতা।

যে প্রত্যক্ষ অবস্থাগুলির সহায়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব, তা এখন সৃষ্টি হয়েছে, রকেটযাত্রার বিজ্ঞান অনেক বিশদ হয়েছে, শক্তিশালী রকেট-যন্ত্রপাতি তৈরী হয়েছে, এইসব ব্যবহারে দক্ষ মহাকাশযাত্রীরা যথোচিত শিক্ষা লাভ করেছে। যে সম্ভাব্যতা এই রকম, যে বাস্তব অবস্থার সহায়ে প্রত্যক্ষ রূপায়ণ সম্ভব তার সঙ্গে যে সম্ভাব্যতা অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত, তাকে বলা হয় প্রকৃত সম্ভাব্যতা।

ব্যবহারিক কার্যকলাপে প্রকৃত সম্ভাব্যতা দ্বারা চালিত হওয়া দরকার। বিমূর্ত সম্ভাব্যতার মূল্য তখনই আছে, যখন তা প্রকৃত সম্ভাব্যতা ব্যক্ত করায় সহায়তা করে, যেমন, কোন কোন বিজ্ঞান বিষয়ক কাল্পনিক কাহিনীতে।

বিষয়গত ও জ্ঞানগত অবস্থার ভূমিকা

আমরা দেখেছি একটা বিশেষ সম্ভাব্যতা তখনই দেখা দেয়, যখন তার উপযুক্ত অবস্থা পরিণতি লাভ করে। কিন্তু সম্ভাব্যতার বাস্তবতায় পরিগ্রহের পক্ষে এই কি যথেষ্ট? না, তা নয়। সমাজজীবনে সবকিছুই মানুষের উপর নির্ভর করে, তাদেরই হাতে সম্ভাব্যতা তাদের ঐকান্তিক শ্রম ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় বাস্তবতায় রূপপরিগ্রহের জন্য অপেক্ষা করে।

সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার বাস্তবতায় রূপপরিগ্রহের জন্য দরকার প্রথমত বাস্তব অবস্থা, এবং দ্বিতীয়ত তাদের কর্মপ্রয়াস যারা আনুষঙ্গিক জ্ঞানগত অবস্থার সৃষ্টি করে। এই কর্মপ্রয়াস জ্ঞাতৃগত উপকরণ, এর উপর কমিউনিস্ট পার্টি বরাবর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। অপরিহার্য ও চূড়ান্ত কাজের উপযোগী অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে, তখন সম্ভাব্যতাকে বাস্তবতায় রূপান্তরের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা অবশ্যপ্রয়োজন। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিনের উক্তি সর্বজনবিদিত। তিনি বলেছিলেন, শীঘ্র ও চূড়ান্তভাবে এক মিনিটের জন্যও অপেক্ষা না করে কাজ করে যাওয়া দরকার, কারণ "বিলম্ব মারাত্মক"। এর অর্থ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের বাস্তব অবস্থা তখন দেখা দিয়েছিল, অতএব সবকিছু নির্ভর করছিল সেই অবস্থার সদ্ব্যবহার করার উপর অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের যুদ্ধপ্রস্তুতির ও সংগঠনের উপর।

বিপ্লবের সময়ে ভুল সিদ্ধান্ত ও অনিশ্চয়তার ফলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল পারী কমিউন, অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের গণ-অভ্যুত্থানের পরে পারীর শ্রমিকদল কর্তৃক গঠিত বিপ্লবী শ্রমিক সরকার।

জ্ঞাতৃগত-কারণ-প্রত্যয়টির অন্তর্ভুক্ত কি কি? এর অন্তর্ভুক্ত পার্টি কর্মীদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ এবং জনসাধারণের সক্রিয় সৃজনশীল কর্মপ্রয়াস। পরিকল্পনা একবার ছকে নেবার পর, এবং সংরক্ষিত বস্তু ও সম্ভাব্যতা ভালো করে জানা হয়ে গেলে, সাংগঠনগত কাজের গুরুত্ব সর্বাধিক। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সাংগঠনিক কাজের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করে, তাদের মতে উপস্থিত সুযোগসুবিধাকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে সাংগঠনিক কাজ নিশ্চিত যোগসূত্র। কেবলমাত্র এরই ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির নীতির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব।

লেনিন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ঠিক ঠিক স্লোগান পেশ করা এবং কী করা দরকার তার ছক তৈরি করার মুন্সিয়ানাই সব নয়; এই সব কর্তব্য সাধন করতে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্পন্ন করার জন্যে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে যে সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়, তার জন্যেও সাধারণ মানুষের তৈরি হওয়া দরকার। প্রকারান্তরে এর দ্বারা শুধু বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিই বোঝায় না, পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার এবং সুযোগসুবিধাগুলি সদ্ব্যবহার করার মত জ্ঞাতৃগত অবস্থাও বোঝায়। এইজন্যই সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে "সাম্যবাদের জয় জনসাধারণের উপর নির্ভর করে, এবং সাম্যবাদ জনসাধারণের জন্যে রচিত। সোভিয়েটের প্রতিটি মানুষ তার শ্রম দিয়ে সাম্যবাদের জয়ের লক্ষ্যকে নিকটতর করছে।"[১] সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা সোভিয়েট জনসাধারণের এবং তাদের পথপ্রদর্শক —কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন শ্রমের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতায় রূপ পরিগ্রহ করছে।

কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জোরেই সম্ভাবনাগুলি কার্যত রূপায়িত করার ব্যাপারে জ্ঞানগত উপকারণকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়। যে জ্ঞান গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং যার ভিত্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, একমাত্র তাই

১। **দি রোড টু কমিউনিজম** পৃঃ ৫৮৯।

সম্ভাব্যতাকে এবং অগ্রগতির উপায়কে ঠিকমত নির্ধারণ করতে এবং ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্থকভাবে তা প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। জনসাধারণের কার্যকলাপ যদি বিজ্ঞানসম্মত না হয়, বাস্তব সম্ভাবনাগুলি অপ্রকাশ্যই থেকে যাবে এবং এর ফল হয় সর্বদাই নিদারুণ ক্ষতিকারক।

আরও যে কারণে জ্ঞানগত কারণ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই। সামাজিক জীবনের সম্ভাবনা দু-রকমের হতে পারে। হয় তা **প্রগতিশীল**, নয়তো প্রতি-**ক্রিয়াশীল**। যেমন, আমাদের একালের যুদ্ধ প্রতিরোধ করার প্রগতিশীল সম্ভাব্যতাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা যুদ্ধ বাধাবার যে প্রতিক্রিয়াশীল সম্ভাব্যতাকে বিস্তৃত করছে তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে,। এই দুই সম্ভাব্যতার মধ্যে কোনটি শেষপর্যন্ত জয়ী হবে, তা নির্ভর করছে সব মানুষের, সব প্রগতি-শীল শক্তির, সব শান্তির যোদ্ধার কার্যকলাপের উপর। তাদের কর্তব্য প্রগতিশীল সম্ভাব্যতা যাতে জয়লাভ করে তার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা।

নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল কমিউনিস্ট পার্টির এবং সোভিয়েট জনসাধারণের কার্যকলাপের ফলে মানবিক সম্ভাব্যতার পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। এর অর্থ, আগে যে সব সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল, এখন চূড়ান্ত নিপুণতার সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে।

যে সম্ভাবনাগুলি কার্যে পরিণত হয়েছে, যা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা প্রত্যক্ষ ঘটনা ও প্রক্রিয়ারূপে বিদ্যমান, তাদের বিশেষ উপাদান ও অনুরূপ রূপও আছে।

উপাদান ও রূপ

উপাদান ও রূপ কি? প্রতিটি বস্তুর ঘটনার বা প্রক্রিয়ার নিজস্ব বিশেষ **গুণজ্ঞাপক লক্ষণ বা সারাত্মক বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের সমাহারকে বিশেষ বস্তুর উপাদান বলা হয়।**

আমাদের যুগের মূল উপাদান পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে অবস্থান্তর। এর সূত্রপাত হয় মহান অক্টোবর বিপ্লব থেকে। ফলত, এর থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ের প্রকৃতি বা সারসত্তা নির্ধারিত হচ্ছে।

আমরা যদি কোন শিল্পবস্তু নিয়ে বিচার করি, তার উপাদানটি হবে আসল বিষয়বস্তু, তার মধ্যে প্রকট হয় সেই শিল্পবস্তুতে প্রকাশিত সামাজিক সম্পর্ক-

গুলির তাৎপর্য। একটি বক্তৃতার উপাদান বলতে বুঝি, যে যে প্রধান ভাব তার দ্বারা প্রকাশিত হয়, শ্রোতারা তা থেকে যা পায়, শ্রোতাদের যে ভাবে তা প্রভাবিত করে।

উপাদান কি স্বসত্তায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারে? পরীক্ষা করে দেখা যাক। মনে করুন আপনি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে একটা বাড়ি তৈরি হবে। বাড়িটি তৈরি করতে যা কিছু মালমশলা লাগে তা আপনার চারপাশে রাখা আছে। আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না, আপনার সামনে একটা বাড়ি আছে। বাড়ি তখনই হবে, যখন তার সব অংশ একত্রিত করে অনুরূপ আকার দান করা হবে।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝতে পারছেন উপাদানকে একটা রূপ দিতেই হয়। আকার বিনা তা থাকে না, থাকতে পারে না। অতএব প্রত্যেক বস্তুর ও ঘটনার যেমন আকার বা রূপ আছে, তেমনি উপাদান আছে। **রূপ আভ্যন্তরিক সংগঠন, উপাদানের কাঠামো, তার দ্বারাই উপাদানের অস্তিত্ব সম্ভব হয়।**

কিন্তু একটি বইয়ের উপাদান অর্থাৎ বিষয়বস্তু কি বদলে যায়, যদি তার রূপ অর্থাৎ বাঁধাই, টাইপ এইসবের বদল হয়? না, তা হয় না। আসল কথা বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রবিশেষে রূপের পার্থক্য ঘটে। আমরা আভ্যন্তরিক রূপের কথা আগেই বলেছি। একটা বইয়ের বাঁধাই, কোন বস্তুতে রঙের প্রলেপ—এইসব উপাদানের সম্বন্ধে বাহ্যিক রূপ।

বাহ্যিক আকার উপাদানের উপর কোন মৌলিক প্রভাব বিস্তার করে না, সেই উপাদানের কাছে তার চূড়ান্ত কোন তাৎপর্য নেই। কিন্তু **আভ্যন্তরিক রূপ** যেমন, বইয়ে প্রধান ভাবটি কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, অথবা বাড়ির অংশগুলির সঙ্গে তাদের আয়তনের সম্বন্ধ, যার ফলে বাড়িটা একটা বিশেষ সৌষ্ঠব অর্জন করেছে, এই গুলি সরাসরি উপাদানকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে **উপাদানেরই নিজস্ব রূপ আছে।**

অতএব রূপ ও উপাদান ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। যে কোন বস্তুতে বা প্রক্রিয়ায় তারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত থাকে। প্রশ্ন হতে পারে: এই মূলপ্রত্যয়গুলির প্রতিটির আলাদাভাবে ভূমিকা কি? এই ঐক্যে কোন্ উপকরণটি প্রধান ও নিশ্চায়ক?

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অনুশীলনের ক্ষেত্রে উপাদান বা বিষয়বস্তুই প্রধান, তারই অনুরূপ রূপ নির্ধারণ করে নিতে হয়। বক্তৃতামালা, পাঠচক্র, স্বাধীন রচনা—এই সবই রূপ; তা নিধারিত হয়, কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ছাত্ররা কোন ধরণের, তারা কতখানি তৈরী হয়েছে ইত্যাদি, অর্থাৎ উপাদান অনুযায়ী। সর্বদা এই রকমই হয়ে থাকে। উপাদান রূপ নির্ধারণ করে।

উপাদান রূপ নির্ধারণ করে

লেনিন শিক্ষা দিয়েছিলেন, পার্টিতে যখন বড় ধরণের নূতন কোন কর্তব্য-পালনের দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন হয়, তখন তার সাংগঠনিক রূপগুলি, তার আভ্যন্তরিক জীবনের নিয়ম ও আদর্শ এমনভাবে ঠিক করে নেওয়া উচিত, যাতে সেই কর্তব্য পালন সুনিশ্চিত হয়। অতএব কোন বস্তুর রূপ তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ তার উপাদানের উপর নির্ভর করে। উপাদানই চরম নির্ণায়ক।

উপাদানের উপর রূপের নির্ভরতা মানে এই নয় যে, একটি নির্দিষ্ট উপাদান একটিমাত্র রূপ গ্রহণ করতে পারে। সামাজিক জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সেখানে রূপ উপাদানসঞ্জাত এবং সেই উপাদান প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সর্বদা সম্বন্ধযুক্ত। অতএব একটিমাত্র অনড় অটল রূপ থাকতে পারে না।

সামাজিক অভ্যুত্থানের উপাদান হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনেক রূপেই হতে পারে। তা শান্তিপূর্ণ হতে পারে, অশান্তিপূর্ণও হতে পারে, বিপ্লবের সময় পার্লামেণ্টের ব্যবহার হতে পারে; তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সেক্ষেত্রে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করা হয় না, পার্লামেণ্ট রীতিসম্মত এমন শাসনপদ্ধতি ব্যবহার কবা হয় যা জনসেবায় নিয়োজিত এবং নতুন এক উপাদানে সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন করতে পারেন, "রূপ যদি উপাদানের অধীনস্থ হয়, তাতে কি এই বোঝায় না, তার কোন ভূমিকাই নেই এবং তাকে অগ্রাহ্য করা চলতে পারে?"

না, রূপকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। যদিও তা উপাদানের উপর নির্ভরশীল, তা উপাদানকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। নিচের উদাহরণটা বিবেচনা করে দেখুন। একজন বক্তা আন্তর্জাতিক অবস্থার উপর বক্তৃতা দিচ্ছেন। হাল আমলের যে সব প্রশ্ন পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার সম্পর্কে নানা তথ্য তিনি আহরণ

রূপের সক্রিয় ভূমিকা

করেছেন ; তথ্য সম্পর্কে তাঁর ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু তাঁর বক্তব্যবিন্যাসের রূপ অস্পষ্ট ও অমনোজ্ঞ, এবং তাঁর ভাষা 'রসকষহীন'। এই প্রকার রূপ উপাদানকে কি প্রভাবিত করে? নিঃসন্দেহে করে ; শ্রোতাদের কাছে উপাদানের অর্থাৎ বিষয়বস্তুর পৌছানো মুস্কিল, বক্তার উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে সার্থক হয় না। অপর একজন বক্তা একই তথ্য মনোজ্ঞ ও সুস্পষ্টভাবে এবং চিত্তাকর্ষক করে পরিবেশন করতে পারেন। তখন ফল হয় অন্য প্রকার ; শ্রোতারা তা চমৎকার অনুধাবন করে এবং বক্তার উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

এর থেকে বলা যায়, উপাদানই যে রূপের উপর কাজ করে, তাই নয়, রূপেরও উপাদানের উপর প্রতিক্রিয়া আছে। উপরন্তু, এই প্রতিক্রিয়ার দুটি ধরণ সম্ভব। রূপ যদি উপাদান অনুযায়ী হয়, তাহলে তা উপাদানের বিকাশে সহায়তা করে, যেমন, উল্লিখিত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি রূপ উপাদান অনুযায়ী না হয়, তবে তা উপাদানের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা করে, যেমন, উল্লিখিত প্রথম ক্ষেত্রে।

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে রূপের সক্রিয় ভূমিকা অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র উপাদানকে চূড়ান্ত নির্ণায়ক বলে ধার্য করা মোটেই ঠিক নয়। রূপের বিপরীত ক্রিয়াকেও গণ্য করা অবশ্যকর্তব্য। যেমন, বক্তৃতাবলী কেবলমাত্র উপাদানের দিকে ভাল হলেই চলবে না, রূপের দিক থেকেও তা স্পষ্ট ও মনোজ্ঞ হওয়া দরকার।

কমিউনিস্ট পার্টি যদিও তার কার্যাবলীর উপাদানের বা বিষয়বস্তুর উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে তার প্রকাশের উপযুক্ত রূপ নির্ধারণ করতে কখনও তা ভোলে না। যেমন, পার্টির এবং সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ সম্পাদন করতে যে কার্যকর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, তা তখনই সম্ভব, যখন নিয়ন্ত্রণের রূপ নির্ধারিত হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে। সেইজন্যে, পার্টির শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রাথমিক সংস্থাগুলিতে শাসননিয়ন্ত্রণ চালু করার জন্যে কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, **সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক রূপ উপাদানের বিকাশের সহায়তা করে।** সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে : "পার্টি নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার কাজের রূপ ও পদ্ধতিতে উন্নতি সাধন করে যাবে, যাতে জনসাধারণের উপর, সাম্যবাদের বাস্তব

ও প্রয়োগিক ভিত্তি গঠনেব উপব, সমাজেব আত্মিক জীবন-বিকাশেব উপব তার নেতৃত্ব সাম্যবাদী গঠনের যুগে নিয়ত বর্ধিষ্ণু চাহিদাব সঙ্গে তাল বেখে চলতে পারে।"[১]

রূপ উপাদানেব বিকাশে সহায়তা করতে পাবে, এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হলেও, পাঠক প্রশ্ন করতে পাবেন: "রূপ যদি উপাদানেব উপব নির্ভব কবে এবং তাব সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে রূপ কি কবে বিকাশেব বাধা হতে পাবে?"

রূপ ও উপাদানের মধ্যে বিরোধ

এ ব্যাপাবটা সহজেই বোঝা যায়, যদি একথা মনে থাকে যে, সবকিছুই বিকাশমান। তাহলে উপাদান কখনও একই স্তবে স্থিব থাকে না। তাব বিকাশ হয় এবং সেই সঙ্গে রূপেবও বিকাশ হয়। কিন্তু রূপ তুলনায় বেশী স্থায়ী এবং কম নমনীয়। তা উপাদানেব পিছনে পড়ে থাকে। রূপ ও উপাদান পবস্পবে বিপবীতধর্মী। যখন রূপ ও উপাদানেব মধ্যে এই বৈপবীত্য সংঘাতেব সৃষ্টি করে, তখনই তাব মীমাংসা প্রযোজন হয়।

প্রাচীন রূপেব মধ্যেই সাধাবণত নূতন উদ্ভাবনেব জন্ম হয়। যেমন, প্রথম যন্ত্রযান ঘোড়াব গাড়ীব নকলে তৈবী হযেছিল। প্রথম সেলাই কলেব 'যান্ত্রিক হাত" ছিল। কিন্তু সময়ে দেখা যায়, প্রাচীন রূপ যন্ত্রেব নতুন গুণগুলি বা নতুন উপাদান বিকাশেব পথে বাধা হযে দাঁড়াচ্ছে। যন্ত্রযানেব প্রাচীন রূপ তাব গতিবেগবৃদ্ধিব পথে বাধা হযে দাঁড়াল, অতএব তাকে গতি সহাযক রূপ গ্রহণ কবতে হল।

রূপ ও উপাদানেব মধ্যে বৈবিতা সহসা দেখা দেয না, তা ধীবে ধীবে বিকাশলাভ কবে। প্রথমে উভযেব মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা দেয। কিভাবে তা দেখা দেয়, তা স্পষ্ট বোঝা যায: বিকাশমান উপাদান নূতন নূতন লক্ষণ অর্জন কবে। কিন্তু দিনে দিনে রূপবদল সম্ভব হয না। কিছু কালেব জন্য পুবনো রূপ থেকে যায়। কিন্তু পার্থক্যগুলি ক্রমে ক্রমে জমতে থাকে এবং এমন একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছোয, যখন রূপ ও উপাদানেব মধ্যে বিপবীত সম্বন্ধ দেখা দেয। তাদের মধ্যে বিবোধ, সংঘাত ও বৈবিতাব উদ্ভব হয। সমাজজীবনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইগুলির মীমাংসা বিভিন্নভাবে কবা হয। পুঁজিতন্ত্রেব আমলে সামাজিক বিকাশধারায় রূপ ও উপাদানের মধ্যে সংঘাত শ্রমিকবিপ্লবের দ্বারা নিরসন হয়।

---

১ দি রোড টু কমিউনিজম, পৃঃ ১৭৩।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রাচীন রূপগুলির ক্রমিক রূপান্তর হয় এবং তারই ফলে বিরোধগুলির নিরাকরণ হয়। কিন্তু এইসব বিরোধের আবির্ভাবক্ষেত্র যাই হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রে তার নিরাকরণ এমনভাবে হয় যাতে, লেনিনের মতে, "উপাদানের সঙ্গে রূপের এবং রূপের সঙ্গে উপাদানের দ্বন্দ্ব চলে।"১

এর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে কেউ যেন সামাজিক জীবনের অচলায়তন ধরে না থাকে, নব্যভাব প্রবর্তকের মনোভাব নিয়ে তা যেন সাহসের সঙ্গে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে।

উদাহরণ প্রতি পদক্ষেপে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, সোভিয়েট গ্রামাঞ্চলের জীবন। পুঁজিতন্ত্রের আমলে তারা দারিদ্র্যে, জীর্ণ কুটীরে জীবন কাটাতে বাধ্য হত। কৃষি সমূহীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা নবজন্ম লাভ করল। তাদের জীবনের উপাদানের আমূল পরিবর্তন ঘটল। এর প্রভাব গ্রামগুলির বাহ্যিক আকারে প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। যেমন ধরুন, নিএস্টার নদীর ধারে অবস্থিত বেসারেবিয়ার গ্রাম কোপাঙ্কা। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যখন বেসারেবিয়া সোভিয়েট গণপরিবারের সঙ্গে যোগ দেয় নি, এই গ্রামটি ছিল দারিদ্র্যপীড়িত দীনহীন অবস্থায়। যৌথ খামার সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন নূতন জীবনের জোয়ার এল। এই নূতন উপাদান থেকে দ্রুতগতিতে এক নূতন রূপ দেখা দিল। গ্রামাঞ্চলের চেহারা ফিরে গেল। শহরের কায়দায় দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে সেখানে, একটি আবাসিক বিদ্যালয় হয়েছে এবং রাস্তাঘাট হয়েছে পিচঢালা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলিতে এবং রাজ্যগুলিতে এই রকম দৃষ্টান্ত অনেক মিলবে। একথা অবশ্য বলা চলে না, যে সর্বত্র প্রাচীন রূপগুলিকে ইতিমধ্যে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে এবং যৌথ খামার জীবনের নব্য উপাদানের সঙ্গে সর্বত্র তার সঙ্গতি আছে। এখানে সেখানে গ্রামাঞ্চলের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এখনও পিছিয়ে-পড়া ভাব আছে। সাম্যবাদ গঠনের কাজ যখন সর্বাত্মকভাবে পুরোদমে চলবে খামারজীবনের নব্য উপাদানের সঙ্গে প্রাচীন রূপের বিরোধ ধীরে ধীরে লোপ পাবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে একথা অকারণে বলা হয় নি যে, দেশ যত সাম্যবাদের দিকে

---

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ৩৮ পৃঃ ২২২।

অগ্রসর হবে ততই "আগেকার ধরণে কৃষকদের বাড়িগুলোর জায়গায়, মোটামুটি-ভাবে, নতুন ধরণের আধুনিক বাসগৃহ গড়ে উঠবে, কিংবা, যেখানে যেখানে সম্ভব, সেগুলির যথাযোগ্য সংস্কারসাধন করে নূতন করে তা নির্মাণ করা হবে।"[১]

অতএব প্রাচীন রূপ ও নূতন উপাদানের মধ্যে আন্তর সম্বন্ধ ঠিকমত বুঝে তারই জোরে এদের বিরোধ নিরাকরণ করা হচ্ছে।

সারসত্তা ও আকৃতি

সারসত্তা কি ?
আকৃতি কি ?

বিজ্ঞান এবং ব্যাবহারিক জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, জগতে যত বস্তু আছে এবং যত প্রক্রিয়া ঘটছে তাদের দুটো দিক আছে: একটি **আভ্যন্তরিক** দিক, যা আমরা দেখতে পাই না, আরেকটি **বাহ্যিক** দিক, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যখন আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন জিনিসকে জানি, আমরা প্রথমে কেবল সেইসব জিনিসের স্বতন্ত্র আকৃতিগুলোকে, কেবল তাদের বাহ্যিক সম্পর্কগুলোকে অবধারণ করি। তাহলে, যা শুধু বহির্ভাগে আছে, যা আমাদের সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে, আমরা তারই সঙ্গে পরিচিত এবং অনেক ঘটনার বাহ্যিক যোগটুকুই জানতে পারি। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই আকৃতির জগৎটা এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু বিজ্ঞান বা মানুষের ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্র, কোনটাই কেবলমাত্র স্বতন্ত্র ঘটনা, তথ্য বা জগদ্‌ব্যাপার অবধারণ ও বর্ণনা করাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের লক্ষ্য ঘটনাসমূহের নিত্য ও সারাত্মক ও মৌলিক নিয়মসূত্রগুলি, তাদের কার্যকারণিক নির্ভরতা, তাদের **আভ্যন্তরিক যোগ** খুঁজে বার করা। সমাজ বা প্রকৃতির নিয়মসূত্রগুলি সরাসরি অবধারণ করা যায় না, তারা আকৃতির সমানুপাতিক নয়। প্রক্রিয়ার নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিকাশ আবিষ্কার করা মানে তাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্পর্কে জানা, তার অর্থ, যার দ্বারা বহুধা জগদ্‌-ব্যাপার এক সমগ্রতায় যুক্ত, যা তাদের মৌলিক প্রধান অংশ, তারই মধ্যে অনুপ্রবেশ করা।

নিচের দৃষ্টান্ত থেকে এই কথাটা বোঝা সহজ হবে।

---

১ **দি রোড টু কমিউনিজম**, পৃ ৫৪১-৪১।

জগতে অসংখ্য জীবদেহী আছে, সরলতম জীবদেহ থেকে মানুষ পর্যন্ত। প্রতিটি প্রাণী আরসবার থেকে পৃথক। কিন্তু তাদের সবার যে সাধারণ ভিত্তি, তাই সবাইকে একক সমগ্রতায় মিলিত করে। এঙ্গেলস্ এই সারসত্তার সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছিলেন যে, তারা সবাই প্রোটিন দেহসত্তার নানা রূপ।

বহুরূপী আকৃতির আড়ালে আছে তাদের সারসত্তা অর্থাৎ তাদের আভ্যন্তরিক যোগ, তাদের ভিত্তিমূল, তাদের বিকাশধারার নিয়মসমূহ। লেনিন তাইজন্যে বলেছিলেন "সারসত্তা এবং নিয়ম একই ধরণের (একই বর্গের), বরঞ্চ একই ক্রমের প্রত্যয়, যা জগৎপ্রপঞ্চ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ করে।"১

"সারসত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করা" এই উক্তিটির অর্থ বস্তুসমূহের ভিত্তি, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নিয়ম, ঘটনাসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী আভ্যন্তরিক যোগ অবধারণ করা এবং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সমুদয় ঘটনাসমূহে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলিতে ও তাদের বিকাশের নিয়মসূত্রগুলিতে অনুপ্রবেশ করা ছাড়া কিছুই নয়।

একথা তাহলে সুস্পষ্ট হল যে, সারসত্তা বিষয়াত্মক জগতের আভ্যন্তরিক যোগসূত্রটি প্রকাশ করে, বহুরূপী জগৎপ্রপঞ্চের এই হচ্ছে ভিত্তিমূল। আকৃতি সারসত্তার বাহ্যরূপায়ণ, তার আত্মপ্রকাশের বাহ্যিক রূপ। অতএব সারসত্তা এমন কিছু নয়, যার অস্তিত্ব আকৃতির পূর্বজ এবং আকৃতিস্বতন্ত্র। সারসত্তা এবং আকৃতি এক ও অভিন্ন বস্তুজগতের বিভিন্ন দিকের প্রতিফলন মাত্র। সারসত্তা তার আভ্যন্তরিক ও মৌলিক দিকগুলি এবং আকৃতি তার বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ দিকগুলি প্রতিফলিত করে।

সারসত্তা ও আকৃতির মধ্যে যোগ ও বিরোধ

সারসত্তা ও আকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কী? প্রথমত অবিচ্ছেদ্য ঐক্যে তাদের মিলিত হওয়া উচিত। "সারসত্তা আকার গ্রহণ করে। আকৃতি তাই মৌলিক", একদা লেনিন বলেছিলেন।২ মানুষের আন্তরিক উপাদানে এবং কার্যে ও আচরণে তার বহিপ্রকাশের মধ্যে অনতিক্রম্য কোন সীমারেখা নেই। তাই জন্যে বলা হয়ে থাকে, "মানুষকে বোঝা যায় তার কাজ থেকে"। তার থেকেই

১। লেনিন কলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ১৫২।

২। লেনিন কলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩৮ পৃঃ ১৩৩

আভ্যন্তরিক উপাদান, তার সারসত্তা বোঝা যায়। সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী, রাজনৈতিক দল, সবার সম্পর্কেই একই কথা প্রযোজ্য।

প্রতিটি আকৃতি সারসত্তার একটি প্রকটন, যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়, তবে, লেনিন যেমন বলেছিলেন, "তার কোন একটি উন্মুখতা, কোন একটি দশা, কোন একটি মুহূর্ত।" ২ শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের দিকে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য অত্যধিক। কিন্তু তাতেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সারসত্তা প্রকাশ পায় না, তা শুধু তার একটি দিকের বিশেষত্ব প্রকাশ করে, যথা, মানুষের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা।

আকৃতি ও সারসত্তার ঐক্য অর্থ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তারা পরস্পরের সমানুপাতিক, এমন যেন ভাবা না হয়। মার্কস তাই বলেছেন, "বস্তুর বাহ্যিক আকৃতির সঙ্গে তার সারসত্তা যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমানুরূপ হত, তাহলে সব বিজ্ঞান অবান্তর হয়ে যেত,"৩ বাহ্যিক আকৃতি থেকেই তাহলে সবকিছু বোঝা যেত, প্রকৃতির ও সমাজের বিকাশধারার নিয়মগুলি তাহলে এক নজরেই ধরা যেত। আসলে কিন্তু তা হয় না; সারসত্তা আবিষ্কার করার জন্যে বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিজ্ঞানী ও লক্ষ লক্ষ লোকের কঠিন ও ঐকান্তিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। এর জন্যে দরকার ব্যাবহারিক প্রয়োগের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যেকেই এর প্রমাণ দিতে পারবে। প্রায়শই আকৃতি বা ঘটনার বাহ্যিক দিক সারসত্তার শুধু যে সমানুপাত হয় না, তা নয়, সারসত্তাকে বিকৃত করে।

যেমন, সূর্য মনে হয় পৃথিবীকে পরিক্রম করছে, আর পৃথিবী মনে হয় স্থির হয়ে আছে। এই আকৃতি কিন্তু সারসত্তার বিরোধী, যে সারসত্তা আবিষ্কার করেন পোলিশ জ্যোতির্বেত্তা কোপারনিকাস।

সামাজিক জীবনে অচল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা সারসত্তাকে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করে বা আড়াল করে রাখে। প্রচারকেরা ধর্মবিশ্বাসীদের বলে থাকেন, "অতএব তোমরা সাপের মত ধূর্ত হও এবং কপোতের মত নিরীহ হও"। এইসব ক্ষেত্রে বলা উচিত: "ধর্মপ্রচারের বাইরের আপাত দিকটাতে বিশ্বাস ক'রো না, তার সারসত্তায় অনুপ্রবেশ করো, নইলে ঠকবে!" কিংবা,

২। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ১৩৩

৩। মার্কস, **ক্যাপিটাল**, খণ্ড ৩, পৃ ৭৯৭।

পুঁজিতন্ত্রের আওতায় শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের কথা ভেবে দেখুন। তাও আড়ালে রাখা, মুখোশে ঢাকা। উপরে উপরে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে সম্পর্ক দেখে মনে হবে তারা যেন স্বাধীন ও সমান পর্যায়ের পণ্যাধিকারী। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যা ঘটে তা সাধারণ কেনা-বেচার লেন দেন বলেও বোঝানো যেতে পারে, যাতে শ্রমিক তার শ্রম বিক্রী করছে এবং পুঁজিপতি তা পুরো দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে।

প্রলেটারিয়েট ও বুর্জোয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিমূলে যে শোষণের সারসত্তা রয়েছে তা আবিষ্কার করতে মার্কসের মত প্রতিভার দরকার হয়েছিল। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতির গভীরতম সারসত্তায় অনুপ্রবেশের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মার্কসের "ক্যাপিটাল" গ্রন্থ। মার্কস লিখেছিলেন: "আমরা তাহলে কিছুকালের জন্য এই হট্টগোলের জগৎ থেকে বিদায় নিই, যে জগতে সব ঘটনা উপরে উপরে সব লোকের চোখের সামনে ঘটে। ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করে আমরা চলে যাই উৎপাদনের গোপন কন্দরে, যার দরজায় "বিনা প্রয়োজনে প্রবেশ নিষেধ" এই হুকুমনামা আমাদের থমকিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানে পুঁজি থেকে কি করে উৎপাদন হয়, শুধু তাই আমরা দেখতে পাব না, পুঁজি কি করে উৎপন্ন হয়, তাও দেখতে পাব। শেষ পর্যন্ত মুনাফা করার গোপন তথ্যটি আমরা আদায় করে নেব।" ৪

মার্কস্ প্রমাণ করেন যে, পুঁজিপতি শ্রমিকের সমগ্র শ্রমের মূল্য দেয় না, যা দেয় তা শ্রমের আংশিক মূল্য। শ্রমের যে অংশের মূল্য দেওয়া হয় না, তাই হয় উদ্বৃত্ত মূল্য এবং পুঁজিপতিরা তাই গ্রাস করে। বুর্জোয়া শ্রমিককে শোষণ করে। সেইজন্যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে একদিকে জনসাধারণের অধিকাংশের দারিদ্র্য, অনাহার ও বেকারি কেন্দ্রীভূত, অপরদিকে পরগাছা পুঁজিপতিদের অজস্র অর্থসম্পদ ও বিলাস।

একথা সুস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সময় আমরা বাহ্যিক রূপের, আকৃতির মধ্য দিয়ে আভ্যন্তরিক সত্তায়, সারসত্তায় অনুপ্রবেশ করি। এইভাবেই মার্কসীয় দর্শন সারসত্তা ও আকৃতির পারস্পরিক যোগের সমস্যা সমাধান করে। ভাববাদী মত এই সমাধানের বিপরীত মার্গ অনুসরণ করে।

ভাববাদীরা সারাংশ ও আকৃতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে।

৪। মার্কস্, **ক্যাপিটাল**, খণ্ড ১ পৃঃ ১৭৬

কাণ্টের দর্শন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বস্তুজগৎকে তিনি "আকৃতির জগৎ" এবং "সারসত্তার জগৎ" এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। শেষের জগৎ, বা তাঁর নামকরণ অনুযায়ী "স্বরূপ বস্তুগুলি" আমাদের অনধিগম্য। আকৃতির অতীতে এদের অস্তিত্ব।

সারসত্তা ও আকৃতির সমস্যা হেগেল কিছুটা ভিন্নভাবে সমাধান করেছিলেন। সারসত্তা ও আকৃতির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান আনার জন্য তিনি কাণ্টের সমালোচনা করেন। হেগেল সারসত্তা ও আকৃতির আন্তর যোগসূত্রটি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে সারসত্তা বিষয়াত্মক জগতের আভ্যন্তরিক উপাদান বলে প্রতিভাত হয় নি, তাঁর মতে সারসত্তা বস্তুজগতে প্রকট "পরম ভাব"। আকৃতির মধ্যে দিয়ে যা প্রকট হয়, তা বস্তুর সারসত্তা নয়, তা পরম ভাব।

নব্য টমবাদের ধর্ম-ভাববাদী দর্শনের অনুগামীরা শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী সারসত্তা ও আকৃতিকে বিচার করে। এই বিচারে পরিদৃশ্যমান জগতের মূলে রয়েছে চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এক স্বর্গীয় সারসত্তা। প্রতিটি নিয়ম, নবাবিস্কৃত প্রতিটি সারসত্তা ভগবৎ ইচ্ছারই লীলারূপ। স্বতন্ত্র পদার্থগুলিকে তারা মনে করে, স্বর্গীয় সারসত্তার প্রতিভাস।

সারসত্তা ও আকৃতি—প্রশ্নটির এই প্রকার ভাববাদী ও ধর্মীয় ব্যাখ্যার ফলে জগতের প্রকৃত যোগসূত্রগুলিকে বিকৃত করা হয়। এর দরুন লোকে ঘটনার সারমর্মে অনুপ্রবেশ করতে অক্ষম হয় এবং তার সম্মুখীন হয়ে অসহায় বোধ করে। সারসত্তা ও আকৃতিবিষয়ক দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদীতত্ত্ব তত্ত্বগতভাবে ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার ও জগৎব্যাপারের সারসত্তায় যে অনুপ্রবেশ করতে জানে, একমাত্র সেই ন্যস্ত কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে পারে। বৃহৎ হোক, ক্ষুদ্র হোক, সর্বক্ষেত্রেই আমাদের এই প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন।

আজ যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, যখন ঔপনিবেশিক মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী বিকাশের গতিপথ ও সম্ভাবনা কেবলমাত্র এ যুগের সারস্বরূপকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেই বোঝা যেতে পারে। শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সাম্যবাদী সংগ্রামের নীতি ও কৌশল এই গচরিত্রের প্রশ্নের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবেযু

জড়িত। অতএব, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সারসত্তা সম্পর্কে জ্ঞান কর্মক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক।

জগৎব্যাপারের সারসত্তায় অনুপ্রবেশ করতে হলে, যে সব প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে থেকে তা প্রকট হয়েছে, সর্বদা তা খেয়ালে রাখতে হয়। যথা, সাম্রাজ্যবাদের সারসত্তা, লেনিন যেমন দেখিয়েছিলেন, যুদ্ধের সঙ্গে, পৃথিবী নিয়ে ভাগাভাগি করার ও জাতিসমূহকে পদানত রাখার লড়াইয়ের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত। আজও এই অবস্থাই চলছে। আধুনিক অবস্থায়, অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে নূতন একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবার সুযোগ প্রভূত পরিমাণে সীমাবদ্ধ, কারণ শক্তির জোট শান্তির ও গণতন্ত্রের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েট সরকার এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দুই তন্ত্রের সহ-অবস্থান সমর্থন করে। অতএব, যে অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ প্রকট হয়, তা গণ্য না করে, নির্বিচার মতান্ধদের মত "সাম্রাজ্যবাদের সারসত্তা" সম্পর্কে বাঁধাধরা সূত্রগুলি আউড়িয়ে গেলেই এখন আর চলে না। এক্ষেত্রেও নির্বিচার মতান্ধতা দারুণ ক্ষতি করে। যে বাস্তব অবস্থায় সারসত্তা প্রকট হয়, সেই অবস্থা থেকে এই মতবাদ তাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সারসত্তাকে দেখে বস্তুজগৎ থেকে সম্পর্কচ্যুত এক পরম বস্তুরূপে।

আমরা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার প্রধান প্রধান নিয়মসূত্র ও মূলপ্রত্যয়গুলি পরীক্ষা করে দেখলাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বিজ্ঞান কিভাবে এইসব যোগসূত্র, সম্বন্ধ ও নিয়মসূত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। পরবর্তী কথায় এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

নবম কথা

পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে আমরা কিভাবে জ্ঞান লাভ করি

জ্ঞানের শক্তি অসীম। জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান মানুষ অজেয়। কিন্তু

জগৎকে জানার সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার

জ্ঞান কি আমাদের অধিগম্য? প্রশ্নটা এইভাবে উত্থাপন করাতে আপনার হয়ত আপত্তি থাকতে পারে। জগতে কি ঘটছে আমরা যদি না জানতাম, তাহলে এখানে বাস করা বা কাজ করা, কিছুই আমরা পারতাম না। স্পুটনিক, মহাকাশগামী রকেট, পারমাণবিক শক্তি, মানবপ্রতিভার এইসব সৃষ্টি আমাদের নাগালের বাইরে তো থাকতই, বিনা জ্ঞানে সামান্যতম কাজও আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব হত।

তা সত্ত্বেও, এমন লোক আছে যারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে থাকে মানুষ জগৎ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে পারে না, তার মানে, সে জগৎকে জানতে পারে না। কেমন করে এই ধারনা এল পরীক্ষা করে দেখা যাক।

প্রাচীন এক প্রবচনে বলে জ্ঞান আলোক। কিন্তু সব মানুষই আলো পছন্দ করে না। তার কারণ মানুষের যুক্তির শক্তিশালী আলোয় জগৎকে দেখা মানে এর ভিতরকার অনেক কিছুই, এর সম্পর্কে অনেক কিছুই দেখা এবং এতে অনেক কিছু করার ক্ষমতা অর্জন করা।

অন্ধকারের নানা জাতীয় পরিবেশক ঠিক এইটেই ভয় পায়। কারণ মানুষ যখন তার সামাজিক রাজনৈতিক এবং অন্য সব রকম দাস্যতা থেকে মুক্ত হয় এবং নিজেই নিজের প্রভু হয়, সে সর্বপ্রথমে তার উপরওয়ালাদের ও বন্ধনকারীদের উচ্ছেদ করে, তারা পার্থিব হোক বা স্বর্গীয় হোক। সম্ভবত এই কারণেই ধর্মের রোষ সেই মানুষের উপর পড়েছিল যে "জ্ঞান বৃক্ষে"র দিকে হাত বাড়িয়েছিল। ধর্মই এই পুরাণকথা সৃষ্টি করে যে, জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের জন্যে, তা মানুষের অনধিগম্য, "জ্ঞানের সীমান্তরেখা" পার হওয়া এবং পার হবার চেষ্টা করা "মহাপাপ।"

"এ এক মহা রহস্য। স্বর্গীয় জ্ঞানের অন্তরতম রহস্য অবধারণ করা সাধারণ

মরমানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়," ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরবিশ্বাসীদের কাছে এই বাণী প্রচার করেন। মানুষের তাহলে কী করার রইল? ধর্ম এর জবাবে বলে "বুদ্ধি ও যুক্তিকে নম্র কর, বিশ্বাস ও প্রার্থনা কর।" বুদ্ধি, আলোক ও জ্ঞান ধ্বংস হোক—এই সব প্রচারের সারার্থ এই। "ঈশ্বরের কর্মপন্থা দুর্জ্ঞেয়" এবং আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

এই ব্যাপারে ধর্মযাজকদের কোন কোন ভাববাদী দার্শনিক সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন, জগৎ অজ্ঞেয়। তাঁদের বলা হয় অজ্ঞাবাদী। ১

অজ্ঞাবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবর্তক হিউম এবং কাণ্ট। কাণ্ট এই মত পোষণ করতেন যে, জগতের বস্তুগুলি আমাদের কাছে গুপ্ত, যেন তারা খোলের মধ্যে ঢাকা আছে। তাদের অন্তর্নিহিত উপাদানকে জানা অসম্ভব। কেবলমাত্র তাদের বাহ্যিক রূপ আমাদের অধিগম্য। আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনে অজ্ঞাবাদের অধিবক্তার অভাব নেই। যেমন, পশ্চিম জার্মানীর দার্শনিক পেটের্‌স্ ডোরফ্‌ বলেন, ধর্মের মহান সত্যগুলি প্রকট না হলে, "খ্রীষ্টীয় রহস্যগুলি" না থাকলে, বিশ্ব-জগতের চরম রহস্যের সামনে আমাদের দুবল বুদ্ধি ও যুক্তি অসহায় বোধ করত।

অজ্ঞাবাদীরা তাঁদের মতবাদের সমর্থনে কী যুক্তি প্রদর্শন করেন, এবং সেই সব যুক্তি কি অকাট্য? আমরা জানি এ জগৎ আমাদের গোচরীভূত হয় কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ইত্যাদির সাহায্যে। কিন্তু অজ্ঞাবাদীরা বলে থাকেন,এইগুলি অত্যন্ত অনিভরযোগ্য সাক্ষী। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রায়ই আমাদের প্রতারণা করে। একটা পেন্সিলের কিছুটা জলে ডোবান আছে, যদি তার দিকে তাকান, দেখবেন পেন্সিলটা বাঁকা। এই সবের জন্যে, অজ্ঞাবাদীদের মতে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর ভরসা রাখা অসম্ভব। এ কি সত্য?

১। লেনিন এই দার্শনিক ধারার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন: "অজ্ঞাবাদীর ইংরেজী 'অ্যাগনস্টিক্' আসলে একটি গ্রীক শব্দ; গ্রীকে '**আ**'র অর্থ **না**, **গ্নসিস**-এর অর্থ **জ্ঞান**। অজ্ঞাবাদী বলে: **আমি জানি না** কোন বিষয়ীভূক্ত সদ্বস্তু আমাদের সংবেদনে প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত হয় কিনা: আমি বলছি এইপ্রকার বস্তুকে জানবার কোন উপায় নেই।" (লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ১৪, পৃ ১২৮)।

অজ্ঞাবাদীদের কথা শুনে মনে হয়, মানুষের একমাত্র করণীয়, তার পারি-পার্শ্বিক বস্তুগুলির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা। আসলে কিন্তু এ জগতে মানুষের ভূমিকা দর্শকের নয়, স্রষ্টার, কর্মীর। তার ইন্দ্রিয়গোচর ধারণাকে আরও পরিচ্ছন্ন করতে, বস্তুর সারসত্তায়, পরীক্ষাধীন ঘটনার গভীরে অনুপ্রবেশ করতে, যা কিছু দরকার, পরিশ্রম ও ব্যবহারিক কাযের মধ্য দিয়ে সে সবই তার আয়ত্তাধীনে। আগে যে দৃষ্টান্তটা দেওয়া হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তাকে শুধু জল থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে দেখতে হবে তা বাকা কিনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জগৎটা জানা যায় কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় জীবন দ্বারা, ব্যবহারিক কায দ্বারা। শ্রম ও উৎপাদন ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগতের সারসত্তায় অনুপ্রবেশ করে তা জানতে পারে।

জ্ঞানলাভের উপায় কি?

মনে করুন, আপনাকে কোন এক কারখানার কাজ পরীক্ষা করতে হবে। কি করে আরম্ভ করবেন? অবশ্যই আপনি তথ্য সংগ্রহ করা থেকে শুরু করবেন, যেমন, শ্রমিকদের সংখ্যা কত, যন্ত্রপাতিগুলি আধুনিক কি না, ইত্যাদি। এই সব তথ্য আহরণ করার পরেই কারখানাটির জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

যে কোন বিষয় সম্পর্কে মানুষ এইভাবেই কাজ করে। প্রকৃতির নিয়ম-সূত্রগুলি আবিষ্কার করা, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, **তথ্যসংগ্রহ** থেকেই শুরু হয়। তা হয় কোনক্ষেত্রে নিছক পর্যবেক্ষণ দ্বারা, কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা। কিন্তু সর্বদাই **জ্ঞানেন্দ্রিয়** মারফৎ। এইটিই হচ্ছে জ্ঞানের প্রথম স্তর—**ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান** বা **জীবনধর্মী উপলব্ধি**।

যথেষ্টসংখ্যক তথ্য আহরণের পর, আমাদের বিচারবুদ্ধি তার বিশ্লেষণ করে, তাদের মধ্যে মিল ও গরমিল খুঁটিয়ে দেখে, তারপরে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এইটি হচ্ছে জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর—**যুক্তি সম্মত জ্ঞান** বা **পরম চিন্তা**। জ্ঞানের উভয় স্তরেরই ভিত্তি কিন্তু ব্যবহারিক কায। ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে, প্রত্যক্ষ জীবন থেকে আমরা তথ্য আহরণ করি, তা বিশ্লেষণ করার জন্যে। বিপরীত ভাবেও, এই সব তথ্য থেকে আমরা যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা জীবনের জন্য, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন। যেমন ধরুন, আমরা যে কারখানাটি পরীক্ষা করছিলাম তার উন্নতিবিধান

করতে কিংবা যে ফসল নিয়ে গবেষণা করছিলাম, তার ফলন বাড়াতে এই সিদ্ধান্তগুলি আমাদের কাজে লাগে।

তাহলে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ার দুটো দিক, ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান এবং যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান, এই দুই প্রকার জ্ঞানই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। "জীবনধর্মী উপলব্ধি থেকে বিমূর্ত চিন্তা এবং তার থেকে ব্যবহারিক প্রয়োগ —সত্য সম্পর্কে, বিষয়ীভূত সদ্বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের এই হচ্ছে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী পথ," লেনিন এ কথা বলেছিলেন।[১]

ইন্দ্রিয়গোচর উপলব্ধি জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর

বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ আছেঃ চিকিৎসক বোটকিনের কাছ থেকে শুনে শারীরবিজ্ঞানী সেচেনভ ঘটনাটি বিবৃত করেন। একজন রোগীকে চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়। তার প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সবগুলিই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায়। সে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, আঘ্রাণ বা স্পর্শ, কিছুই করতে পারে না। মাত্র একটি হাতের চামড়ায় বোধশক্তি ছিল, থাকবার মধ্যে কেবল এইটুকুই ছিল। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ওই-টুকুই ছিল তার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই জ্ঞান কী অকিঞ্চিৎকর! রোগীটি প্রায় সব সময়ই বহির্জগৎ সম্বন্ধে অনবহিত থাকত। এর থেকে কী বোঝা যায়? এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে পথ, তাদের মধ্যে দিয়ে চারদিককার জগতের জ্ঞান মানুষের চেতনায় অনুপ্রবেশ করে। বহির্জাগতিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংবেদন জাগিয়ে তোলে। লেনিন বলে গেছেন, আমরা সংবেদনের মধ্যে দিয়ে ছাড়া পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না।

আপনি বলতে পারেন, "কিন্তু, এটা তো জানা কথা যে, একটা, এমন কি দুটো জ্ঞানেন্দ্রিয়ও যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও মানুষের মানসিক কর্মক্ষমতার তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সেক্ষেত্রে, যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মারফৎ ছাড়া জগৎ সম্পর্কে কিছু জানা অসম্ভব, তাহলে কি একটু বাড়াবাড়ি করা হয় না?" এক্ষেত্রে এই কথাটুকুই ঠিক যে, একটি বা দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে গেলে বহির্জগতে যা ঘটছে, তা জানতে মানুষ অপারগ হয় না। এমন ঘটনাও জানা আছে, যেখানে দর্শন, গ্রহণ ও বাক্‌শক্তি—এই

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ৩৮, পৃ১৭১।

তিনটি ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েও মানুষ শুধু লিখতে বা পড়তেই শেখে নি, উচ্চমার্গের মানসিক বিকাশের অধিকারী হয়েছে।

মানুষ যখন একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হারায়, সেই ক্ষতি সে অপরগুলি দিয়ে পূরণ করে। কিন্তু যদি সে সবগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত হয়, তার বস্তুজগৎ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাই থাকে না। সে জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না।

সংবেদনের প্রভূত গুরুত্ব স্বীকার করলেই সব হল না। তার অর্থও সম্যক বোধগম্য হওয়া দরকার, কারণ এমন অনেক দার্শনিক আছেন (কেবল-বিজ্ঞান-বাদীরা), যাঁরা সংবেদনের ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, সেগুলি মানুষের মধ্যে আপনাআপনিই জাগতে পারে, তার জন্যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বহির্জাগতিক কোন ক্রিয়ার প্রক্ষেপ দরকার হয় না। যথা, তাঁদের মতে, একটি আপেলের স্বরূপে হলুদ রঙও নেই, তার বিশিষ্ট আকারও নেই। মানুষ এইগুলি আপেলের উপর আরোপ করে, তার ফলে আপেল আর কিছুই নয়, মানুষেরই সব সংবেদনের সমাহার।

এর থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পদার্থমাত্রই সংবেদনের সমাহার বা মিশ্রণ। কিন্তু বস্তুজগতে বিপরীতটিই সত্য। আপেল তার সব কটিগুণ নিয়ে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে আছে এবং তা যখন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে, তা ক্রিয়ানুরূপ সংবেদনও জাগিয়ে তোলে—যথা, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি। লেনিন বুঝিয়ে বলেছেন যে, **আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর বহির্জাগতিক বস্তুর ক্রিয়ার ফলেই সংবেদন জাগে।** এই কারণেই, এই থেকে আমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমরা যথার্থ ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করি।

আপনাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে যে, অজ্ঞাবাদীরা ঠিক এর বিপরীত কথা বলেন এবং আপনারাও প্রশ্ন করতে পারেন, "সংবেদন থেকেই যে জগৎ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা যায়, কি করে তা প্রমাণ করতে পারা যায়?" প্রধানত আমাদের ব্যবহারিক কাযসূত্রেই তার প্রমাণ। সংবেদন থেকে যদি মোটামুটি সঠিক জ্ঞানলাভ না হত, মানুষ তাহলে বহির্জগতের বস্তুগুলিকে কার্যত ব্যবহার করতে পারত না। সেক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যেসব বস্তুকে জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে উপস্থাপিত করত, তাই অনিষ্টকর হতে পারত। তেমনি এর বিপরীতও হতে পারত।

যেমন, আমাদের চোখ। তা যেন, আমরা যে বস্তুটি দেখি, ফোটোগ্রাফের মত তার ছবি তুলে নেয়। বস্তুটি যদি নড়াচড়া করে, গতিশীল বস্তুটির প্রতিচ্ছবি অক্ষিপটে দেখা দেয়। যদি তা নড়াচড়া না করে, একটি যস্থিতিশীল বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বহির্জগতে যা ঘটছে চোখ তা হুবহু তুলে নিয়ে **প্রতিফলিত করে** সব কটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কে একই কথা খাটে। এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, অজ্ঞাবাদীরা যখন বলেন যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্য নির্ভরের অযোগ্য, তাঁরা ভুল করেন।

কিন্তু ইন্দ্রিয় যে মাঝে মাঝে সত্যিই প্রতারণা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ব্যাপার সম্পর্কে তাহলে কি বলা হবে? যা ঘটে তা কিন্তু এই: মানুষ যদি কেবলমাত্র তার সংবেদনগুলি দিয়েই জগৎ পর্যবেক্ষণ করত, তাহলে সে শুধু বস্তুর বাহ্যিক দিকটুকুই জানতে পারত। এবং একথা সত্যি, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মাঝে মাঝে আমাদের ভুল খবর দেয়। আমার ইন্দ্রিবোধে সূর্য "উদয় হয় এবং অস্ত যায়।" কিন্তু আমরা জানি, এটা মিথ্যামায়া। একইভাবে, আমরা এক গেলাস জলকে মনে করি "স্ফটিকের মত স্বচ্ছ"। আসলে কিন্তু তাতে কোটি কোটি জীবাণু রয়েছে। মোটকথা, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে যে সঙ্কেতগুলি আসে সেগুলিকে আমরা চিন্তার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে, মিলিয়ে দেখতে এবং আরো বেশী পরিচ্ছন্ন করতে পারি। অজ্ঞাবাদীরা যেহেতু সংবেদনের স্তর পার হয় না, সেই জন্যে লেনিন তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। চিন্তার সাহায্যে মানুষ সংবেদনের সীমা অতিক্রম করে। এর অর্থ, সংবেদনের উপর আস্থা রেখেও এবং তার সঙ্কেতগুলি ব্যবহার করেও মানুষের বিচারবুদ্ধি এমন রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে, যেখানে সংবেদনের গতিরুদ্ধ।

বিমূর্ত চিন্তা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর

সোভিয়েট শহর কুর্স্ক্-এর কাছে অভাবিত একটি প্রাকৃতিক ঘটন ঘটতে দেখা যায়; একটি কম্পাসের কাঁটা অস্বাভাবিক ভাবে আচরণ করতে থাকে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওই অঞ্চলে মাটির গর্ভে নিশ্চয়ই আকরিক লোহার বিরাট খনি আছে। তারই ফলে কম্পাসের কাঁটার "নড়চড় হয়েছে। ভূতত্ত্বীয় অনুসন্ধানে এই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়। একই প্রকারে কুস্টানাই অঞ্চলে আকরিক লোহার সন্ধান পাওয়া যায়। দেখা গেল, কাজাখ

স্তানের এই অঞ্চলের উপর দিয়ে যখনই বিমান উড়ে যায়, বিমানে কম্পাসের কাঁটাটা ঠিক উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে নড়ে যায়। ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত হল— "এখানে নিশ্চয় আকরিক লোহার খনি আছে"।

যদিও এই সিদ্ধান্তগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্কেতের উপর নির্ভর করেই হয়েছে, এগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সিদ্ধান্ত নয়। তা তাই অনুধাবন করতে পারে, যা সরাসরি দেখা যায়, শোনা যায় ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক কিন্তু আকরিক লোহার খনি দেখেন নি, দেখেছিলেন কম্পাসের কাঁটার অস্বাভাবিক "আচরণ", ঘটনাটির উপরিভাগে এইটুকুমাত্র ছিল। আকরিক লোহাব খনি ছিল গভীর ভূগর্ভে।

এইসব তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বৈজ্ঞানিককে দারুণ ও ব্যাপক মানসিক প্রয়াস করতে হয়। অতএব, চিন্তার সাহায্যে আভ্যন্তরিক যোগাযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে, অর্থাৎ যে নিয়মে জগৎব্যাপারের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় সে সম্পর্কে মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংবেদন বাহ্যিক জগতের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ যোগসাধন করে, কিন্তু চিন্তা পরোক্ষভাবে তা প্রতিফলিত করে। এর অর্থ, অনুমানগুলির ভিত্তি পরোক্ষ তথ্য। যেমন ধরুন, মহাকাশগামী বিমানে ভ্রমণকালে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে কিনা, এইটি জানবার জন্য জীবজন্তুর উপর প্রথম পরীক্ষা চালানো হয়। লাইকা, বেল্‌কা এবং স্টেলকা নামের কুকুরগুলিকে রকেটে করে এবং মহাকাশগামী বিমানে শূন্যে পাঠানো হয়। যে সব তথ্য পাওয়া গেল, তার থেকে মহাকাশযাত্রায় মানুষের নিরাপত্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সমর্থ হলেন। সোভিয়েট 'মহাকাশ-যাত্রীদের' যাত্রায় এই সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি সমর্থিত হল।

তথ্য না থাকলে সিদ্ধান্ত হয় না। বৈজ্ঞানিকের কাছে তথ্যের অপরিহার্যতা, যে বাতাসে তিনি নিশ্বাস নেন, তার মত। এবং এই তথ্যগুলি পাওয়া যায় সংবেদনের বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাছ থেকে। কিন্তু শুধু তথ্য আহরণ নিয়ে থাকলেই হয় না। রুশবৈজ্ঞানিক পাভলভ সোভিয়েট তরুণদের উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "নিজেকে মহাফেজখানার তথ্য সংগ্রাহক করো না। তাদের গোড়ায় কি রহস্য আছে তা জানবার চেষ্টা কর। যে নিয়মে তারা চালিত হয়, অক্লান্তভাবে তার অনুসন্ধান কর।" শুধু বিমূর্ত চিন্তার দ্বারাই এ কাজ সম্ভব।

তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত কি উপায়ে গ্রহণ করা হয়?

ধরা যাক, কলেজের শিক্ষকরা যে কাজ করেন, তার অভিজ্ঞতাকে সামান্যী-

স্মরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই কাজের মধ্যে পড়ে, তাঁদের সার্থক অভিজ্ঞতার টুকরোগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করা এবং তাই থেকে ভালো ফল পেতে হলে কাজটি কিভাবে সংগঠিত করা দরকার সে বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের কাজের সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হওয়া দরকার।

অন্য সব বিষয়ের মত, এ ক্ষেত্রেও যে সব উপকরণ আছে, তার মধ্যে কিছু যেমন প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য, তেমনি কিছু আছে, যা অপ্রয়োজনীয় ও পরিহার্য। শিক্ষকেরা কি ভাবে তাঁদের বক্তৃতা তৈরি করেন, তা চিত্তাকর্ষক করার জন্য তাঁরা কি করে থাকেন, এগুলি অপরিহার্য উপকরণ। কিন্তু কখন তাঁরা তা করে থাকেন, রাত্রে না দিনে, এ ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয়, তা বিশেষ ও স্বতন্ত্র অবস্থার উপর নির্ভর করে। যা সামান্যীকরণ করতে হবে তার মধ্যে স্বভাবত অপরিহার্য ও প্রধান উপকরণগুলি পড়ে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে না। তাদেরই উপর উপদেশের মান নির্ভর করে। যা অবান্তর, চিন্তা তা পরিহার করে, তার থেকে নিজেকে নিষ্কাষিত করে, মনে হয় যেন, তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না।

জানিত ঘটনার শুধুমাত্র মৌলিক উপাদানগুলিকে পৃথক করাই চিন্তার চারিত্রিক বিশেষত্ব। এইভাবেই প্রত্যয় গঠিত হয়। অতএব, এবারে স্পষ্ট জানা গেল যে, চিন্তায় **বিমূর্তন সামান্যীকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত**।

তাহলে বিমূর্তন সেই প্রক্রিয়া যা পরীক্ষাধীন ঘটনার অবান্তর লক্ষণগুলিকে সংহরণ করে এবং তার মৌলিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিন্তায় পৃথক করে। সিদ্ধান্ত সেই সামান্যীকরণকে বোঝায় যার মধ্যে কেবলমাত্র যা গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষত্বজ্ঞাপক, তা ঘনাভূত রূপে থাকে।

এবারে পরিষ্কার বোঝা যাবে, প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রকৃতি কেন সাধারণ, কেন তা একটি সমগ্র শ্রেণীর ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সেই শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে নয়। চিন্তার সামান্যীকরণ ক্ষমতা আছে বলেই এই রকম সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। এর কারণ চিন্তা তথ্যসমূহ থেকে সংগৃহীত প্রধান প্রধান মৌলিক লক্ষণগুলিকে একটি সমগ্রতায় একত্রীভূত করে তার দ্বারা প্রত্যয়, সাধারণ ভাব ও ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে, এবং সমগ্র শ্রেণীর ঘটনাবলী সম্পর্কে সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। **আরোহ** ও **অবরোহ** নামে পরিজ্ঞাত বিশেষ যৌক্তিক উপায়ে চিন্তা এই কর্মসাধন করে। এইগুলি কি?

আরোহী সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ বিশেষ তথ্যের পরীক্ষানিরীক্ষার উপর নির্ভর করে। যখন লাইকা কুকুরটা মহাকাশ অতিক্রম করে রকেটে করে ফিরে এল, তখন বিজ্ঞানের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই: বায়ুস্তরের উচ্চস্তর থেকে একটি জীব নিরাপদে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা একই পরীক্ষা যখন শশকের উপরে চালালেন, আরও একটি তথ্য পাওয়া গেল। এই ধরণের যথেষ্টসংখ্যক তথ্য একত্রিত করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, "মানুষশুদ্ধ যে কোন প্রাণী মহাকাশ-যাত্রাকালীন অবস্থা অনায়াসে সইতে পারে।" স্বতন্ত্র তথ্যগুলিকে সামান্যীকরণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। এই সিদ্ধান্তের অভাবে সোভিয়েট মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশযাত্রা কখনই ঘটে উঠত না।

অতএব, যে ধারায় স্বতন্ত্র বা আংশিক বিচার সাধারণ বিচারে উপনীত হয় তাকেই আরোহ বা আরোহী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করা হয়।

সিদ্ধান্তে পৌছানোর আরও একটি উপায় আছে। কিন্তু সে-উপায়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা জানি, অচল যন্ত্রপাতির অর্থনৈতিক যন্ত্রবল কম। আমরা আরও জানি, কোন একটি কারখানায় অচল যন্ত্রপাতি বসান হয়েছে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, এই যন্ত্রপাতির অর্থনৈতিক যন্ত্রবল কম হবে। এখানে আমাদের চিন্তা একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহণ করল।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা জানেন, অচল যন্ত্রমাত্রেরই অর্থনৈতিক যন্ত্রবল কম। আপনি তার থেকেই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই বিশেষ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। একটি সমগ্র শ্রেণীর ঘটনাবলীর সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে তার একটি বিশেষ অংশ সম্পর্কে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। একে বলা হয় **অবরোহী** সিদ্ধান্ত। **যে ধারায়** আমাদের চিন্তা একটি সাধারণ বিচার থেকে স্বল্প সাধারণ বিচারে বা স্বতন্ত্র বিচারে উপনীত হয় তাকে অবরোহী সিদ্ধান্ত বা অবরোহ বলা হয়।

এখন বিমূর্ত চিন্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। "বিমূর্তন" শব্দটির ব্যুৎপত্তি একটি লাটিন শব্দ থেকে যার অর্থ প্রত্যাকর্ষণ, অপসারণ। বিমূর্ত চিন্তাও ঠিক যেন মূর্ত বস্তু থেকে প্রত্যাকর্ষিত, অপসৃত হয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়: অধিকতর জ্ঞান কোথা থেকে আসে

—সংবেদন থেকে, না, চিন্তা থেকে ? আগের দৃষ্টান্তটির কথা ভাবলে এর উত্তর পাওয়া যাবে। একটি কলেজে কি করে কাজ হয়, কে বেশি জানেন : যিনি একবারমাত্র বক্তৃতা শুনেছেন এবং শুধু এই একটি মাত্র বক্তৃতার ভালো এবং মন্দ দিকগুলি জেনেছেন তিনি, না, যিনি কলেজ-শিক্ষকদের, মনে করুন, এক বছরের কাজ দেখে সামান্যীকরণ করেছেন এবং তাঁদের কাজের মধ্যে যা কিছু মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ তা সবই যাঁর জানা আছে, তিনি ? যিনি কাজের সারসত্তায় গভীর-ভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন, স্বভাবত তিনিই জানেন বেশি। কিন্তু আমরা জানি, সারসত্তা ঘটনার বহির্ভাগে থাকে না। এই জ্ঞান অসাধারণ শ্রমসাধ্য।

প্রথমে, তথ্যগুলি সযত্নে মিলিয়ে দেখা একান্ত দরকার। যদি তথ্যগুলি যেমন-তেমন করে সংগ্রহ করা হয় এবং মিলিয়ে দেখা না হয়, তাদের ভিত্তিতে সারসত্তায় পৌঁছনো অসম্ভব। লেনিন সবসময় এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি বলতেন, তথ্য মাত্রই "দ্ব্যর্থবোধক"; কেবলমাত্র যখন সেগুলিকে সযত্নে নির্বাচিত করা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করা হয়, তখনই তারা তাদের অন্তর্নিহিত সত্যটি জানায়। যদি খেয়ালখুশিমত তথ্য নেওয়া হয়, তাহলে তারা হবে, লেনিনের মতে, "কেবলমাত্র ছেলেখেলা কিংবা তার চেয়েও খারাপ কিছু।" ১

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পুঞ্জীভূত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাসমূহের সারসত্তাকে জ্ঞাত হওয়া যায়। ঘটনাগুলিকে তবে যত্নের সঙ্গে যাচাই করতে হবে এবং তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট হওয়া চাই। সেগুলি থেকে সিদ্ধান্তও ভালোভাবে চিন্তা করে গ্রহণ করা উচিত।

ইন্দ্রিয়গোচর ও যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান সম্পর্কে উপরে যা বলা হল তার থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, তারা ঐক্যবদ্ধ এবং পরস্পরের পরিপূরক।

যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞানকে যারা পৃথক করে দেখে

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি মনকে ঠিক ঠিক তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করে। তাদের উপর ভিত্তি করে মন সিদ্ধান্ত নেয় বা সামান্যীকরণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বাদ দিলে, মস্তিষ্কের বা মনের কোন কাজই হতে পারে না। এবং মনের নিয়ামক বৃত্তি না থাকলে ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞানও সম্ভব হত না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়গোচর এবং যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান জ্ঞানের একটি ধারাবাহিক

১। লেনিন : **কলেক্টেড ওয়ার্কাস** খণ্ড ২৩ পৃঃ ২১৬

প্রক্রিয়ার দুটি পর্যায় এবং এই জ্ঞানের ভিত্তি ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্র। এদের পরস্পরের মধ্যে কিছুতেই যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। দার্শনিকেরা কিন্তু সেই চেষ্টাই বারে বারে করে এসেছেন। কোন কোন দার্শনিক এ কথাও বলেছেন যে, মানুষ কেবলমাত্র যুক্তিমার্গে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে এবং সেইজন্যে তাদের যুক্তিবাদী বলা হয়।

যুক্তিবাদের থেকে পার্থক্য করা হয় তথাকথিত সংশোধনবাদের বা অভিজ্ঞতাবাদের (এর ব্যুৎপত্তিগত লাটিন কথাটির অর্থ সংবেদন, এবং গ্রীক কথাটির অর্থ অভিজ্ঞতা)। এঁরা যুক্তিবাদীদের বিপরীত পথে চলেন। এই মতবাদের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ এবং ইন্দ্রিয়-গোচর অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞান আহরণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়র সঙ্গে তুলনা করলে, যুক্তি নূতন কিছুই দেয় না।

সংবেদনবাদের সবচেয়ে নাম-করা ব্যাখ্যাতা ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক জনলক্ (১৬৩২-১৭০৪) এবং ফরাসী দার্শনিকদ্বয় এতিয়েন কঁদিলা (১৭১৫-১৭৮০) এবং ক্লোদ্ এলভেশিয় (১৭১৫-১৭৭১)। তাঁরা ছিলেন প্রগতিশীল দার্শনিক—বস্তুবাদী, কিন্তু জ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট; তাঁরা মনে করতেন ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তত্ত্বগত চিন্তার ভূমিকার উপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না।

বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ, যার সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, এবং **ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ**, যার ব্যাখ্যাতা ছিলেন কেবলবিজ্ঞানবাদী বার্কলে—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অবশ্যকর্তব্য। বার্কলে ভাবতেন ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞানের উপর সর্বপ্রকার জ্ঞান নির্ভর করে। কিন্তু "অভিজ্ঞতা" সম্পর্কে তাঁর ধারণা বস্তুবাদীদের ধারণা থেকে আলাদা ছিল। তাঁর মতে বস্তুর উপলব্ধিই বস্তুর স্বরূপ। এর অর্থ পদার্থের সবিষয় অস্তিত্ব নেই, তারা শুধু "অভিজ্ঞতায়" বিদ্যমান, অর্থাৎ মানুষ যখন তাদের প্রত্যক্ষ করে, তখনই তারা থাকে।

বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ (অথবা সংবেদনবাদ) থেকেও জ্ঞানের সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। এই সব মতানুবর্তিতার ফলে বিচারবুদ্ধির সামান্যীকরণের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ভূমিকাই থাকে না, কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় য জানায় অর্থাৎ আমাদের "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে" সার বলে স্বীকার করতে হয়।

অতএব, এই থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, **জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে যুক্তির এবং**

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কি ভূমিকা, এই সমস্যা যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয়েই একদিক থেকে সমাধান করে থাকেন।

যুক্তিবাদীদের সীমাবদ্ধতা এই যে, তাঁরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথ্য অগ্রাহ্য করেন। আসলে কিন্তু যুক্তির সহায়ে তখনই নূতন জ্ঞানলাভ সম্ভব, যখন তা অভিজ্ঞতার তথ্য দ্বারা, যে প্রতীতি পদার্থ ও ঘটনাবলীর ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে লাভ করা যায়, তার দ্বারা, সমৃদ্ধ হয়। এর অর্থ, কেবলমাত্র তেমন জননেতাই পরীক্ষাধীন সমস্যার সারসত্তায় অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম যিনি, যে কাজ হাতে নিয়েছেন, সেই কাজ সম্পর্কে প্রভূত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অধিকারী।

কিন্তু তাঁরাও ভুল করেন, যাঁরা অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো এই মত পোষণ করেন যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ বস্তুজগৎ সম্পর্কে সাক্ষাৎ উপলব্ধি থেকেই, বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। বস্তুত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করা এবং আমাদের চিন্তাসূত্রে যে সামান্যীকৃত জ্ঞান প্রতিভাত হয়, তা অস্বীকার করা— কার্যক্ষেত্রে এর অর্থ কি দাঁড়ায়? এর অর্থ, কৃত্রিম উপায়ে নিজের দিগন্তকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করা, অবাধ সম্ভাবনা থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা এবং কেবলমাত্র নিজেব দেখা, অনুভব করা, এবং পর্যবেক্ষণ করা তথ্যেব উপব নিভর করা। তবু কিন্তু, মানুষ যতই প্রভিভাশালী হোক না কেন, তাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিরাট গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেও, তা সিন্ধুতে বিন্দু ছাড়া কিছু নয়।

অতএব, জ্ঞানের একটি পর্যায়ের ভূমিকাকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে অন্য পর্যায়েব ভূমিকাকে অস্বীকার করা যে অনুচিত, তা স্পষ্ট বোঝা গেল। ইন্দ্রিগোচর জ্ঞান এবং যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান, উভয়ই জ্ঞানলাভের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটির আরেকটি ছাড়া অস্তিত্ব নেই। এর থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা এই যে, তত্ত্ব ও সাধনের মধ্যে মিল থাকা দরকার।

তত্ত্বের ভিত্তি ও চালক-শক্তি সাধন। তত্ত্ব ও সাধনের মধ্যে ঐক্য

ব্যবহারিক কার্যের সূত্রেই ইন্দ্রিয়গোচর ও যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। মানুষ যদি কিছুই না করত, তাহলে সে কোন বিষয়ে শুধু জানতেই পারত না, তা নয়, নিজের অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারত না। মানুষ যখন পশুস্তর থেকে উন্নীত হল, প্রাকৃতিক বিকাশধারা সম্পর্কে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান কিছুই

ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কাজে লেগে গেল, সে খাদ্য আহরণ করল, বাসস্থান তৈরি করল এবং দেহের আবরণ তৈরি করতে শিখল। এঙ্গেলস্ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, মানবসমাজের ভিত্তিমূলে আছে শ্রম, ব্যাবহারিক কার্য। দৈনন্দিন জীবনের সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যা কিছু দরকার তা সে শিখে নিল।

আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় আমরা এর সমর্থন পাই। মানুষ এই পৃথিবীতে যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তার কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না। সে তা অর্জন করে তার চারপাশের জগৎব্যাপারের সংস্পর্শে আসার ফলে। তার মানে সে তা অর্জন করে তার ব্যাবহারিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে। যখন একটি শিশু আগুনের শিখা ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়, তখনও সে তার স্বরূপ জানে না। শীঘ্রই সে তার নিজের ব্যাবহারিক কাযকলাপের ভেতর দিয়ে আগুনের গুণাগুণ জানতে পারে এবং তারপরে সে আর তা ধরবার জন্য হাত বাড়ায় না। সে তখন কিছু পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করেছে।

এর থেকে অবশ্য বোঝায় না যে, ব্যাবহারিক কার্যকলাপ বলতে মানুষের শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বোঝায়। আমাদের কাযকলাপে আমরা শুধু আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই যে কাজে লাগাই তা নয়, অন্য মানুষের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ সমগ্রভাবে মানবজাতির সামাজিক অভিজ্ঞতাকেও নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করি। সেইজন্য মার্কসবাদ সামাজিক সাধনের কথা বলে। এর মধ্যে মানুষের সমগ্র কর্মপ্রয়াস পড়ে, যে কর্মপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তারা বস্তুজগতের উপর ক্রিয়া করে এবং তার পরিবর্তনসাধন করে: তার মধ্যে আছে উৎপাদন, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী গঠন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সব জ্ঞানের উৎস মানবজাতির সামাজিক সাধন। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে এর সত্যতা নিঃসন্দেহে যাচাই হয়।

যেমন ধরা যাক জ্যামিতির ব্যাপারে। জ্যামিতির উদ্ভব কি করে হল? প্রাচীন কাল থেকে মানুষ জমি চাষ করার কিংবা বাড়ি তৈরি করার সময় বিভিন্ন আয়তন ও গঠনের জমি মাপবার প্রয়োজন বোধ করে এসেছে। ধীরে ধীরে তারা আবিষ্কার করেছে, মাপবার কতকগুলি পদ্ধতি আছে, সেইগুলি ত্রিকোণ, ট্রাপেজিয়াম ইত্যাদির মত নির্দিষ্ট আকারের যে কোন ভূমিখণ্ডে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ভাবে সাধনের সামান্যকরণরূপে যে কোন

বিজ্ঞান জন্মলাভ করে। জগতে নির্দিষ্ট ব্যাপার ও ঘটনা ঘটে। তা পর্যবেক্ষণ করে পরে সামান্যীকরণ করার ফলেই তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের উদ্ভব। অতএব, জ্ঞানের মূলে আছে সাধন, সাধন থেকেই দেখা দেয় তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

এইখানে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি দেখা দিতে পারে: যা বলা হল তার থেকে কি এই প্রতিপন্ন হয় না যে, মানুষ নিষ্ক্রিয়, নিরুপক্রম জীব, সম্পূর্ণভাবে বহির্জাগতিক প্রভাবের অধীন? অবশ্যই তা নয়। মার্কসের আগে তাত্ত্বিক বস্তুবাদীরা সাধনের একটা দিকই বুঝেছিলেন, সাধন বলতে তাঁরা বুঝতেন মানুষের উপর বহির্জগতের প্রভাবটুকু। কিন্তু সাধন সম্পর্কে মার্কসের ধারণা ছিল অনেক গভীর; মানুষের উপর বহির্জাগতিক ক্রিয়া যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি বহির্জগতের উপর মানুষের ক্রিয়াও। কলকারখানা বাড়িঘর তৈরি ও জমি চাষ করার ভিতর দিয়ে মানুষ তার শ্রম দ্বারা যে পরিবেশে সে বাস করে তার রূপান্তর ঘটায়। তার বাস্তব কার্যকলাপ তার চারপাশের বস্তুজগতে ছাপ রেখে যায়। মানুষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক—এই উভয় পরিবেশই মুখ্যত পূর্বপুরুষদের ব্যাবহারিক কার্যকলাপের ফল। জনসাধারণ, দল বা শ্রেণীর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সামাজিক জীবন ও সামাজিক সম্বন্ধের গতানুগতিক দিকটা মৌলিকভাবে পালটিয়ে দেয়। সেইজন্যে মানুষের জীবনে সামাজিক সাধনের নিশ্চয়াত্মক ভূমিকার কথা মার্কস বার বার বলেছেন। কিন্তু মানুষের জ্ঞানসম্পর্কিত কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও সাধনের ভূমিকা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে, মানুষের উৎপাদনী কার্যকলাপের দরুন তার ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলতে সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে।

সাধন শুধু জ্ঞানের ভিত্তিই নয়, তার **চালকশক্তি**। যদি, মনে করুন, জীবনধারণের বাস্তব প্রয়োজনে কোন একটি বিশেষ ধরণের জমিতে চাষ করার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তা বার করার ভার কৃষিবিজ্ঞানীদের উপর পড়ে, ব্যাবহারিক প্রয়োজনের এই তাগিদ কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। ব্যাবহারিক দায় সমাধান করতে হলে, নূতন নূতন সামান্যীকরণ না করে বিজ্ঞান এক পাও চলতে পারে না। এই ভাবেই বিজ্ঞান দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয় এবং উন্নতি লাভ করে। সাধন থেকে, জীবনের প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বিজ্ঞান এই গুরুত্বপূর্ণ চালকশক্তির সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। এই অর্থেই লেনিন বলেছিলেন যে, তাত্ত্বিক জ্ঞান থেকে সাধনের স্থান ঊর্ধ্বে

তাঁর শিক্ষানুযায়ী, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, সাধনের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানতত্ত্বের মূল ও প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত।

এর ফলে কি মানুষের বৈপ্লবিক বা উৎপাদনী কার্যক্ষেত্রে তত্ত্বের ও বিজ্ঞানের গুরুত্বকে হেয় করা হয় না? মার্কসবাদের যারা শত্রু, যেমন সংশোধনবাদীরা, তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনের উপর মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তত্ত্বের ভূমিকা অস্বীকার করে। কিন্তু একথা একেবারেই মনগড়া। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদাই তত্ত্বের অসাধারণ গুরুত্ব স্বীকার করে। লেনিন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তত্ত্ব সাধনের পথ আলোকিত করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, "তত্ত্ব সাধনের পথ আলোকিত করে চলবে এবং সাম্যবাদী গঠনের সাফল্যের পথে যে সব বাধাবিপত্তি দেখা দেবে, তা নিরূপণ করে দূর করতে সহায়তা করবে।" ১

সাম্যবাদী গঠনের বর্তমান অবস্থায় বাস্তব সমস্যার সমাধানের অর্থ একই কালে তত্ত্বগত সমস্যার সমাধান করা। এর থেকে দাঁড়ায় এই, দেশের ও পার্টির সামনে যে সব বাস্তব কর্তব্য আছে তার সমাধান থেকে তত্ত্বগত সামান্যীকরণ করতে হবে। সাধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিকাশ কখনো সম্ভব নয়।

অতএব "কেবলমাত্র" সাধনের গুরুত্ব, অথবা "কেবলমাত্র" তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

তত্ত্ব ও সাধন দ্বন্দ্বসমন্বয়ী এক ঐক্যসূত্রে বাঁধা। এক থেকে আরেককে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। তত্ত্বের উৎপত্তি সাধন থেকে। সেইসঙ্গে তা সাধনের সহায়ক এবং সাধনকে সমৃদ্ধ করে। সাধন বিনা তত্ত্ব হতে পারে না। কিন্তু বৈপ্লবিক তত্ত্ব না থাকলে বৈপ্লবিক সাধন হতে পারে না। সাধন না থাকলে তত্ত্ব নিষ্প্রাণ এবং তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞাগুলো দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না থাকলে, সাধন দিশাহারা এবং পরিপ্রেক্ষিত থেকে বঞ্চিত।

অতএব, তত্ত্ব ও সাধনের মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য ঐক্য মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

এর মধ্যে কোনটি এই ঐক্য গঠনে প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে?

১। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃঃ ৫০৫।

আমরা আগেই দেখেছি, সাধনের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু এর অর্থ তত্ত্বের মূল্যকে হেয় করা নয়। অপরপক্ষে তত্ত্বের ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, মানুষের এই জগৎকে জানবার উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন নয়, বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফললাভ। জগৎকে রূপান্তরিত করার মধ্যেই এইগুলি লাভ করা সম্ভব। অতএব যে তত্ত্ব জগৎকে রূপান্তর করার কাজে সহায়তা করে, তাই কার্যকারী এবং তত্ত্বনামের যোগ্য। এবং মানুষের ব্যাবহারিক কার্যই এই রূপান্তরক্রিয়া। ফলত তত্ত্ব সর্বদাই সাধনের সহায়ক, তাইজন্যে তার তাৎপর্য, তার "মূল্য" বিন্দুমাত্র কমে না।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত করে ভাবা কখনোই উচিত নয়। লেনিনের লেখায় আছে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময়, এমন সময় আসবে, যখন "তত্ত্ব সাধনে পর্যবসিত হবে, সাধনকে জীবন্ত করবে, সংশোধিত করবে এবং যাচাই করবে।"[১] মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অভূতপূর্ব সুবিধা জীবনের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য যোগে, বস্তুজগতের সর্বাত্মক বিশ্লেষণের ফলে তার নিয়ত সমৃদ্ধিতে।

যা বলা হল তার থেকে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জগতে যে সব ঘটনা ঘটে, আমাদের জ্ঞানে তার যথার্থ প্রতিফলন হয় এবং আমাদের জ্ঞান জগতে যা ঘটছে, তার সঠিক সংবাদই আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

জগৎ জ্ঞানগম্য

কিন্তু আপনার চারপাশে যদি একবার তাকান, তাহলে দেখবেন, কি বিপুল-সংখ্যক অপ্রকট "স্বরূপ বস্তু" আপনাকে ঘিরে রয়েছে। প্রকৃতি এমনই একটা গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করা যাবে না। এটি হচ্ছে অজ্ঞাবাদীদের অতিপ্রচারিত "যুক্তিগুলির" অন্যতম। বিজ্ঞান এখনো যা করতে পারে নি, তাই তাঁরা খুঁজে বার করে যেন পাশবিক আনন্দের সঙ্গে বলেন, "এই দেখ, তোমাদের বিজ্ঞানে কতগুলো ফাঁকা জায়গা রয়েছে। আর এই বিজ্ঞানের শক্তি নিয়ে তোমরা বড়াই করো।" কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে এই ধরণের মতবাদকে সাধন খণ্ডন করে চলেছে। সাধনপথে চলতে চলতে প্রকৃতির একটির পর একটি "রহস্যে"র ঘোমটা খুলে যাচ্ছে। কাল যা ছিল "স্বরূপ বস্তু" আজ তাকে জানা যাচ্ছে, এবং মানুষের কাজে লাগানো হচ্ছে।

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ২৫, পৃ ৩৭৪-৭৫।

মানবীয় জ্ঞানের সাফল্যের প্রমাণস্বরূপ, এঙ্গেল্‌স্‌ আলিজারিন্‌ নামক রঞ্জনদ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন। এই দ্রব্যটি এক জাতীয় গাছের শিকড় থেকে পাওয়া যেত, কিন্তু মানুষ তা কৃত্রিম উপায়ে আলকাতরা থেকে উৎপন্ন করার পদ্ধতি জেনেছে। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন, এই "স্বরূপ বস্তু"টি মানুষের সাধনের ফলে "সার্বিক বস্তু" হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ জিনিসটিকে জানা গেল।

কি বিরাট মানুষের সাধনশক্তি, যখন রসায়ন কৃত্রিম উপায়ে শতসহস্র যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই একই ঘটনা ঘটছে। ধীরে ধীরে প্রকৃতির গ্রন্থটির একটির পর একটি পাতা পড়া হচ্ছে এবং জনসাধারণ তার মর্ম জানতে পারছে।

একমাত্র ভূতাত্ত্বিকদের কথাই যদি ধরা যায়, পৃথিবীর কত না রহস্যই তারা উন্মোচন করল! রাশিয়ার ভূতত্ত্বীয় মানচিত্র প্রথম প্রকাশিত হয় সত্তর বছরের কিছু আগে। সেটিতে "ফাঁকা জায়গা" ভর্তি ছিল, ফাঁকা জায়গাগুলি ছিল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু কয়েক বছর পরে নূতন সামাজিক ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রের পত্তন হল এবং তার ফলে উৎপাদনে বিপুল উন্নতির পরিপোষক অবস্থার সৃষ্টি হল। অতঃপর কী ঘটল? ব্যাবহারিক চাহিদার প্রয়োজনে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূতত্ত্বীয় গঠন সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হল। তার অভাবিত ফল পাওয়া গেল। ইয়াকুটিয়ায় পাওয়া গেল হীরা, সাইবেরিয়ায় তেল, কাজাখস্তানে আকরিক লোহা, মধ্যএশিয়ায় গ্যাস। এবং গত কয়েক বছরে ভূবিজ্ঞানীরা আরো অনেক ধাতব খনি আবিষ্কার করেছেন।

বিশ্বজগতের রহস্য উন্মোচনে যাঁদের কৃতিত্ব অতুলনীয়, সেই সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কীর্তিকথা এখানে না বলে পারা যায় না। কত শত বৎসর ধরে চাঁদের উল্টো দিকটা "স্বরূপ বস্তু" হয়েই ছিল। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ওগুস্ত কোঁৎ খোলাখুলিভাবে তো ঘোষণাই করেছিলেন যে, মানুষ কখনো চাঁদের অপর দিকের রহস্যের কথা জানতে পারবে না, কারণ সেদিকটা আমাদের গ্রহ থেকে অদৃশ্য। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা যন্ত্রচালিত এক গ্রহান্তরগামী স্টেশন উদ্ভাবন করলেন, তা চাঁদের চতুর্দিকে ঘুরে তার অপর পার্শ্বের ছবি তুলে নিল।

এই বৈজ্ঞানিক কীর্তি সাধনক্ষেত্রে অজ্ঞাবাদের আরেকটি বিরুদ্ধ সাক্ষী। মানুষ এখন গ্রহলোকে পাড়ি দিয়েছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের

সীমাকে বিস্তৃত করেছে। এখন কে বিশ্বাস করবে অজ্ঞাবাদীদের এই উক্তিকে যে, মানুষের জ্ঞান কোন না কোন ভাবে "সীমাবদ্ধ"।

প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে মানুষ একটার পর একটা বাধা লঙ্ঘন করে। সে যদি বলে "আমি সব বাধা লঙ্ঘন করব" তাহলে তা অযৌক্তিক হবে না। এই মনোভাবের সঙ্গে ওতপ্রোত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের গভীর আশাবাদ, তার জীবন সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়, মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর তার গভীর আস্থা।

"জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা" সম্পর্কে কিছু বলা একালের অজ্ঞাবাদীদের পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে, কারণ একালের বিজ্ঞান জগতের জ্ঞান আহরণে যে দুর্লভ সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে, তা ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়। অতএব মানুষের বিচারবুদ্ধি "নির্বোধ", ধর্মশাস্ত্রজ্ঞরা তাঁদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যের "আপস করানোর" চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলি থেকে "সৃষ্টিকর্তা"র পরম-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলি তাঁরই চিন্তা মানুষের ভাষায় রূপায়িত। কিন্তু ধর্মযাজকদের এত চেষ্টা সবই ব্যর্থ হল! বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষী যে, বিজ্ঞানকে প্রতিটি পদক্ষেপ অগ্রসর হতে হয়েছে ধর্মের সঙ্গে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই করে। আর ভগবানই বা কেন "তাঁর রহস্যগুলি" বৈজ্ঞানিকদের গোচরে আনবেন, যখন এদের অধিকাংশই নিরীশ্বরবাদী?

এই সব থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, মানুষের জ্ঞান বিকাশ লাভ করে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে, অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে ক্রমপরিণত জ্ঞানে। প্রকৃতিতে অজ্ঞেয় স্বরূপ-বস্তু বলে কিছু নেই, শুধু এমন বস্তু আছে যা এখনও জানা যায়নি, তবে বিজ্ঞানের ও সাধনের শক্তিতে একদিন তা জানা যাবে।

কিন্তু জ্ঞানের পদ্ধতিতে যা জানা গেল তাই যথার্থ কিনা, কি করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারা যায়? এই প্রশ্নের আলাদাভাবে বিচার দরকার।

দশম কথা

সত্য কী?

এমন কোন পাঠক আছেন যিনি কখনও নিজের কাছে প্রশ্ন করেননি "সত্য কী?" সত্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য নেই এমন লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। একটি রুশ প্রবচনে বলে: যুক্তির আলো "সত্য: দেহের আলো সূর্য: আত্মার আলো সত্য।" এই প্রবচনটি অকারণে রচিত হয়নি।

হেগেল লিখেছিলেন: "সত্য একটি বড় কথা এবং আরো বড় বিষয়। যদি কোন মানুষের চিৎ ও আত্মা সুস্থ থাকে, এই কথার ধ্বনিতেই তার বক্ষপট প্রসারিত হবে।"

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের যাঁরা প্রবর্তক তাঁরা সত্যসেবার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা এবং কার্ল মার্কসের সংগ্রামী বন্ধু, লাইব্‌কৃনেখ্‌ট তাঁরা স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, মার্কস সত্য ছাড়া অন্য কোন ধর্ম জানতেন না, তিনি একমাত্র সত্যের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করতেন না এবং সত্যের মতো আর কিছুকেই শ্রদ্ধা করতেন না। "জীবন্ত, ফলপ্রসূ, অকৃত্রিম, শক্তিশালী, সর্বশক্তিক, বাস্তব, পরমমানবীয় জ্ঞানে"র শক্তি সম্পর্কে লেনিন গর্বিত ছিলেন।[১]

সময়ে সময়ে বলা হয় যে, সত্যের অনুসন্ধান করা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, লেখক ও রাজনীতিজ্ঞদের কাজ। বলা হয় "সাধারণ মানুষ সত্যের অনুসন্ধান না করেই চলতে পারে।" এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। মানুষমাত্রকেই সর্বদা অনুসন্ধান করে সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে, একেই বলে জ্ঞানাহরণ। ইস্কুলে, শিল্পক্ষেত্রে, পরীক্ষাগারে, দৈনন্দিন জীবনে—সর্বত্রই জ্ঞানের প্রয়োজন। ছোট ছোট বিষয়ে ছোট জ্ঞান দরকার হয়, বড় বড় বিষয়ে বিরাট জ্ঞানের দরকার হয়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যথার্থ জ্ঞান অপরিহার্য। মানুষ তার বৈজ্ঞানিক, উৎপাদনী ও সামাজিক কার্যকলাপের দ্বারা এই জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা করে।

---

১ লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্ক'স**, খণ্ড ৩৮; পৃ ৩৬২।

কোন ধরণের জ্ঞানকে আমরা সত্যজ্ঞান বলি ?

আপনাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের জানা আছে যে, আমরা সেই বিবরণকে সত্য বলে বর্ণনা করি, যা স্বকপোলকল্পিত নয়, যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জীবনে বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, এমন কিছু। যা কিছু বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গতিবিশিষ্ট তাই সত্য। সত্য অসত্য ও মিথ্যার বিপরীত। আমাদের বিবরণ মিথ্যা, যদি তা এমন কিছু বলে যার অস্তিত্ব বাস্তব জীবনে প্রকৃতপক্ষে নেই।

সত্য কী ?

মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের এই যে অর্থ, সত্যের দার্শনিক সংজ্ঞায় তা কি রক্ষিত হয়েছে ? হ্যাঁ, তা সত্যের বস্তুবাদী ধারণার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভাববাদীরা সত্যকে নানাভাবে বিকৃত করেন। তাঁদের মতে, প্রকৃতির স্থান গৌণ, সুতরাং তাঁরা চিন্তাকে বস্তুজগতের সঙ্গে তুলনা করেন না। অপরপক্ষে, তাঁদের কল্পিত "নীতি" ও "প্রতিজ্ঞা"র সঙ্গে বস্তুজগৎকে উপযোজিত করেন।

সত্যের ভাববাদী ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত তার ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় ধারণা, যার প্রতিপাদ্য, ঈশ্বরই একমাত্র সনাতন সত্য। কিন্তু ধর্মীয় মোহন্তদের উক্তি অনুযায়ী, ঈশ্বর বিজ্ঞানের অনধিগম্য ; অতএব সত্যও বিজ্ঞানের অনধিগম্য। সত্য নাকি জ্ঞানপ্রক্রিয়ায় অধিগম্য নয়, মানুষের উৎপাদনী কর্মপ্রয়াসের মধ্যে দিয়েও তাকে নাকি অবধারণ করা যায় না, একমাত্র ঈশ্বরবিশ্বাসেই সত্যের স্বরূপদর্শন হয়।

বহু পূর্বেই বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, "ধর্মের রহস্যপ্রকটনগুলি" সত্য থেকে এত ব্যবহিত, যেন পৃথিবী থেকে আকাশ। আজও পর্যন্ত গুহ্যবাদীরা "সত্য" এই মহাশব্দের আড়ালে তাদের যাবতীয় অপকীর্তি ঢাকতে চায়। তারা শিক্ষা দেয় "সত্যকে জানো, সত্যকে শ্রদ্ধা কর", এই প্রসঙ্গে তারা ভান করে, তারা যেন "স্বর্গীয় সত্যে"র, "ঐশ্বরিক সত্যের" সেবকমাত্র।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া, ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্যে বিজ্ঞানকে বরবাদ করা ছাড়া এইসব মতবাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই ; এইভাবে কোন কোন ধর্মের সেবক সত্যের প্রতি জনসাধারণের সহজাত আকর্ষণকে ভাঙিয়ে ব্যবসায় করে।

সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে মানবজাতির বহুযুগার্জিত ধারণাকে ভাববাদ ও ধর্ম শুধু রক্ষা করে নি, তাই নয়, তাদের বিকৃত করেছে।

একমাত্র বস্তুবাদের কাছ থেকে সত্যের সঠিক অবগতি সম্ভব। বস্তুবাদই তার অর্থ রক্ষা করে, যে অর্থ জনসাধারণের ব্যবাহারিক কর্মপ্রয়াসের ভিতর দিয়ে বিশদরূপ লাভ করেছে। বস্তুবাদী ফয়ারবাথ, যেমন, "সত্যকে বস্তুজগৎ থেকে বস্তুজগৎকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার" প্রয়াসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। রুশ বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক চেনিশেভ্স্কি মানবমনের শক্তিতে এবং বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছিলেন: "বস্তু-জগতের সর্বাত্মক, সঠিক অনুসন্ধানের দ্বারা সত্যকে লাভ করা যায়।........".

সারকথা দাঁড়াচ্ছে এই। যেহেতু মানুষের জ্ঞান তখনই সত্য যখন তা বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, এই সত্য মানুষের খেয়ালখুশী বা কামনা-বাসনার উপর নির্ভর করে না। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সত্যের বিষয়তন্ত্রতার তত্ত্ব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সর্বপ্রথম সমস্যাটির সমাধান করে এই তত্ত্বটি উপস্থাপিত করে।

লেনিন তাঁর **মেটিরিয়েলিজম অ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম** গ্রন্থে

বিষয়ীভূত সত্য

মানুষের সেইসব ধ্যানধারণাকে সত্য বলে বর্ণনা করেন, যার উপাদান "একজন জ্ঞাতার উপর নির্ভব করে না, কোন একজন মানুষ বা সমগ্র মানবজাতির উপরও নির্ভর করে না।"১

এর অর্থ কিভাবে বোঝা হবে? প্রশ্ন হতে পারে, সত্য কি তাহলে স্বয়ং প্রকৃতি, যেহেতু সত্য বিষয়গতভাবে, অর্থাৎ, মানবস্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে? না, বিষয়ীভূত সত্যের এই প্রকার ধারণা ভুল হবে। কেবলমাত্র জনসাধারণের জ্ঞান, তাদের মতামত, ভৌতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের উক্তি, সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, বস্তুজগৎ তা হতে পারে না।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে। সত্য যদি জনসাধারণের জ্ঞানই হয়, তাহলে তা মানুষের উপর নির্ভর করে না, একথা কেন বলি? একথা কি ঠিক নয় যে, জনসাধারণ তাদের শ্রম দ্বারা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা, কোন না কোন প্রকারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করে? মাকবাদী বোগডানভ এইরূপ যুক্তিই প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি বলেন, যেহেতু মানব ব্যতিরেকে সত্য নেই, বিষয়ীভূত সত্যের অস্তিত্ব নেই, সত্য সর্বদা জ্ঞাতৃগত, মানবনির্ভর। কিন্তু এই মতবাদ ভ্রান্ত।

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়াৰ্ক'স**, খণ্ড ১৪, পৃঃ ১২২

বাস্তবিকই, মানব ব্যতিরেকে সত্য নেই। কিন্তু তার উপাদান মানুষের উপর নির্ভর করে না। মানুষের পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে সত্য আহৃত হয়। কোন বিবরণ বা মতামতের সত্যতা মানুষের ইচ্ছা দ্বারা নির্ণীত হয় না, তা নির্ণীত হয় বিষয়ীভূত সদ্বস্তুর সঙ্গে, মানবস্বতন্ত্র জগতে যা বাস্তব অস্তিত্বে বিদ্যমান তার সঙ্গে সঙ্গতি দ্বারা। সেই কারণেই লেনিন বলেছিলেন যে, বিষয়ীভূত সত্য মানুষের উপর নির্ভর করে না। ভিন্ন ভাবে বলতে গেলে, মানুষের যথেচ্ছ কাজের উপর তা নির্ভর করে না। মানুষ সত্য সৃষ্টি করে না, বিষয়ীভূত সদ্বস্তুতে যে সত্য বিদ্যমান সেই অনুযায়ী মানুষ তার প্রতিফলন করে।

এর থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টি তথ্যের সর্বপ্রকার অপব্যবহারের, ঐতিহাসিক বা বিষয়ীভূত সত্যের সর্বপ্রকার অপলাপের ঘোরতর শত্রু। সত্যকে এবং মানুষকে সেবা করা একজন কমিউনিস্টের শ্রেষ্ঠ সম্মান। ব্যাবহারিক কর্মপ্রয়াসে সত্যের সামান্যতম বিকৃতি সে বরদাস্ত করে না। সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববিষয়ে সত্যকে মুখোমুখি দেখবার, মানুষের প্রতি প্রতারণাকে, সত্যের বিকৃতিকে, নিরাকরণ করার সামর্থ্য তার থাকা দরকার।

কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী, যেহেতু তা জনসাধারণকে সত্য কথা বলে এবং এইজন্য জনসাধারণও সর্বদা তাকে বিশ্বাস করে।

যে ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টি দ্বারা বুর্জোয়া দার্শনিক, কূটনীতিবিদ, সাংবাদিক ইত্যাদি চালিত, সেই বিশ্বদৃষ্টি থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। মার্কিন সাংবাদিক জন স্থইনটন, যেমন, লিখেছেন যে, একজন নিউইয়র্কের সাংবাদিককে সত্য বিকৃত করতে হয়, প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা বলতে হয়, তথ্যের অপলাপ করতে হয়, জনসাধারণের কুৎসা রটনা করতে হয় এবং ধনাধিপের কাছে নতজানু হয়ে থাকতে হয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা, এস. ডি. জ্যাকসন স্পষ্টই বলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমেরিকা সত্যকে চায় না, তার প্রয়োজন ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ। এইখানেই যথার্থভাবে আপনি দুটি বিশ্বদৃষ্টির, বস্তুজগৎ সম্পর্কে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন।

অতএব আমাদের ব্যাবহারিক কার্যকলাপে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই সব বিবরণ ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করার গুরুত্ব আছে, যর সঙ্গে বস্তুজগতের

সঙ্গতি আছে। কিন্তু কিসের থেকে মানুষ জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে, বস্তুজগতের সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গতি সম্পর্কে, নিশ্চয়তা লাভ করবে? অন্যভাবে বলতে গেলে, জ্ঞানের সত্যতা কোন মানদণ্ডে নির্ণীত হবে?

বুর্জোয়া দার্শনিকদের মতে কোন ধারণাকে সত্য বলা যেতে পারে, যদি তা জনসাধারণের কাছে লাভজনক ও উপযোগী হয়। এই ধরণের দার্শনিকেরা নিজেদের প্রয়োগবাদী বলে থাকেন। আমেরিকায় প্রয়োগবাদের প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। প্রয়োগবাদীর কাছে সত্যের মানদণ্ড বিষয়াত্মক নয়, জ্ঞাতৃগত। এমন কি কোন ভ্রান্ত, উদ্ভট তত্ত্ব বা ধারণাও কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে কিংবা সমগ্র শ্রেণীবিশেষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হতে পারে। এই ধরণের দৃষ্টান্ত সেই সব ধর্মীয় তত্ত্ব, যা মৃত্যুপারের জীবন, স্বর্গ, নরক ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এইগুলি শোষকশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক। শোষণ-কারীরা ধর্মের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, এই শিক্ষা ভ্রান্ত।

প্রশ্ন হতে পারে: "যে সব তত্ত্ব সত্য, তারা কি উপযোগী নয়? গণিতের ও পদার্থবিদ্যার প্রতিজ্ঞাগুলি কি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করে না?" নিঃসন্দেহে তারা উপযোগী। কিন্তু সেই হিসেবে তারা সত্য নয়। অপরপক্ষে, যেহেতু তারা সত্য এবং বাস্তব জগৎকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, সেইজন্যে তারা জনসাধারণের কাছে উপযোগী।

অন্যান্য দার্শনিক (যথা, মাকবাদী বোগডানভ) বলেন: তাই সত্য, যাতে সব মানুষ একমত, যা সর্বস্বীকৃত। সর্বস্বীকৃতিকে তাঁরা সত্যের মানদণ্ড মনে করেন। এই মানদণ্ডও নির্ভরযোগ্য নয়, এও জ্ঞাতৃসম্পর্কীয়। সত্যকে কমসংখ্যক লোকের কামনাবাসনার উপর নির্ভর করাই বা বেশিসংখ্যক লোকের কামনাবাসনার উপর নির্ভর করাই, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। এমন অবস্থাও দেখা যায় যেখানে অল্প লোকই নয়, বিপুলসংখ্যক লোকও ভুল করে থাকে।

আমরা জানি এমন সময় ছিল যখন ধর্মের অলৌকিক কাহিনীগুলি "সর্বজন-স্বীকৃত" ছিল। কিন্তু তার ফলে তাদের সত্যমূল্য বিন্দুমাত্র বাড়েনি। পরিশেষে বৈর শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিভক্ত সমাজে সত্যের "সর্বজনস্বীকৃতি" নেই এবং হতেও পারে না, বিশেষত যখন তা শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। এক শ্রেণী যা সত্য বলে মানে, অপর শ্রেণীর কাছে তা মিথ্যা।

তাহলে সত্যের মানদণ্ড কি, যা জনসাধারণের কামনাবাসনা মতামত থেকে স্বতন্ত্র, যে মানদণ্ড বিষয়ীভূত? এই মানদণ্ড সামাজিক সাধন। আমাদের মতামতের, তত্ত্বের, ধ্যানধারণার সত্যমিথ্যা যাচাই করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি মানুষের সামাজিক কর্মপ্রয়াস। মার্কস লিখেছিলেন "সাধনমার্গে মানুষকে সত্য প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে তার চিন্তার বাস্তবতা, শক্তি ও জীবনমুখীনতা।" ১

বস্তুজগৎ পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তা যদি সাধন দ্বারা সমর্থিত হয়, তার অর্থ আমাদের জ্ঞান সত্য, নির্ভরযোগ্য এবং সন্দেহাতীত। চন্দ্রলোকগামী সোভিয়েট রকেটের যাত্রা এমন নিখুঁত হিসেবে নিরূপণ করা হয়েছিল যে, মিনিট, সেকেণ্ডের সূক্ষ্ম তারতম্য হিসেবের মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল। রকেটটি যখন চন্দ্রলোকের পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে এবং হিসেবমাফিক ঠিক সময়ে অবতরণ করল, তখন সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের গণনার সত্যতা ব্যাবহারিক-ক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করল। অপরপক্ষে, যে সব তত্ত্ব জীবনের, সাধনের কষ্টি-পাথরে যাচাই হয় না, তারা মিথ্যা। অতএব, সাধন সব তত্ত্বের কষ্টিপাথর।

সাধনের সাহায্যে আমরা আমাদের জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করি কেন? এর উত্তর নিম্নরূপ। অলস কৌতূহলের জন্য আমরা বস্তুজগতের জ্ঞানানুসন্ধান করি না। কোন আবিষ্কারক বিজ্ঞানী বা প্রবর্তকের ধ্যানধারণা তখনই মূল্যবান, যদি তা কার্যত প্রয়োগ করা যায়। ধারণামাত্রই কার্যত প্রযোজ্য নয়। কেবলমাত্র সত্য ও সঠিক ধারণাই প্রয়োগযোগ্য। মিথ্যাধারণার প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই, কারণ তার সঙ্গে বস্তুজগতের সঙ্গতি নেই। সেইজন্যে আমরা আমাদের ধারণার সত্যতা যাচাই করি সাধনের সাহায্যে।

ফলত, যা সাধন দ্বারা সমর্থিত, সুতরাং সাধন লভ্য, তারই সঙ্গে বস্তুজগতের সঙ্গতি আছে। বিষয়ীভূত সত্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত উচিত সাধনের মানদণ্ড এবং প্রতিফলন নীতি। মানুষের সেই জ্ঞানকে বিষয়ীভূত সত্য বলা যায়, অভিজ্ঞতার দ্বারা, সাধন দ্বারা, যার যাচাই হয়েছে, এবং যা পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। লেনিন লিখেছিলেন: "মানুষের মস্তিষ্কে প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। এইসব প্রতিফলনের সত্যতা যাচাই

১ মার্কস অ্যাণ্ড এঙ্গেলস্, **সিলেক্টেড ওয়ার্কস**, (দুই খণ্ডে, ১৯৫৫) খণ্ড ২, পৃ ৫০৩।

করে এবং তা সাধনে, যান্ত্রিককৌশলে প্রয়োগ করে মানুষ বিষয়ীভূত 'সত্যে' উপনীত হয়।"১

সত্যের মানদণ্ড সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তার থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদনী, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের মূল্যায়নে তাদের ব্যাবহারিক ফলাফলের মানদণ্ড দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত। এইসব ক্ষেত্রে জীবনই সর্বোচ্চ বিচারক। বস্তুজগৎ যদি আমাদের গণনা, প্রস্তাব বা প্রকল্প সমর্থন না করে, সেইগুলিকে বর্জন করার সৎসাহস আমাদের থাকা উচিত। এবং আমাদের জ্ঞানের গভীরতা আরও বৃদ্ধি করে যাতে তা অভিজ্ঞতা ও সাধনের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করতে পারে তার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা অনমনীয় হই এবং জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি, আমাদের কপালে দুঃখ অনিবার্য।

আমরা দেখিয়েছি যে, সাধনই সত্যের মানদণ্ড, একাধারে জ্ঞানের উৎস ও উদ্দেশ্য। জ্ঞানের প্রয়োজন প্রথম দেখা দেয় এইখান থেকে, এই সাধনই জ্ঞানের মুখ্য কারণ। প্রকৃতিকে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে মানুষের যে উৎপাদনী কর্মপ্রয়াস, সাধন তারই সমাহার। (কৃষি ও শ্রমশিল্পের ক্রমবিকাশে সমগ্র ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা)। সমাজকে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে যে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস, সাধন তারই সমাহার। (শ্রেণীসংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিগত সংগ্রাম) সাধন বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক কর্মপ্রয়াসও। এককথায়, বস্তুজগৎকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রয়াসই সাধনপর্যায়ভুক্ত।

লেনিন তাঁর **মেটিরিয়েলিজম্ অ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম্** গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, দুটি প্রশ্ন সত্য-সমস্যার অন্তর্ভুক্ত: (১) বিষয়ীভূত সত্য বলতে কিছু কি আছে? (২) যদি থাকে, তাহলে বিষয়ীভূত সত্যকে প্রকাশক্ষম মানুষের ধ্যানধারণা কি সম্পূর্ণভাবে একসঙ্গে, সমগ্ররূপে, নিরপেক্ষভাবে, চরমভাবে প্রকাশ করতে পারে, না, কেবল আপেক্ষিকভাবে, স্থূলত প্রকাশ করতে পারে? ২ আমরা প্রথম প্রশ্নটি আগেই পরীক্ষা করে তার ইতিবাচক

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কাস**, খণ্ড ৩৮, ২০১।
২। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্ক্স**, খণ্ড ১৪, পৃ ১২২।

উত্তর দিয়েছি। এবারে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি, অর্থাৎ আপেক্ষিক ও পরম সত্যের প্রশ্ন।

"মানুষ বাঁচতে বাঁচতে শেখে" এই জনপ্রবাদটি যেন উপরের প্রশ্নটির জবাব; আমরা সত্যকে সাক্ষাৎভাবে, সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণভাবে, নিরপেক্ষভাবে জানতে পারি কিনা—এই প্রশ্নের জবাব। রুশ বৈজ্ঞানিক পাভলভ বলেছিলেন যে, একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একটি-মাত্র জীবন অত্যন্ত স্বল্পকাল। যত গোপন রহস্যই তিনি উদ্‌ঘাটন করুন না কেন, অনেক অনেক সমস্যার সমাধান বাকি থেকে যায়। সমগ্রভাবে বিজ্ঞানও কখনও জ্ঞানের প্রক্রিয়াকে সমাপ্ত করতে পারে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় না, আবিষ্কার হয় ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। কেন এই রকম হয়?

আপেক্ষিক সত

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে মানুষের চিন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাক। মানুষের চিন্তা কি কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা? না, তা নয়। জগৎকে যারা জানতে পাবে এবং পর্যবেক্ষণ করে, এই চিন্তা সেই সব মানুষের। সেই মানুষেরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, তাদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সবাই প্রকৃতিকে একসঙ্গে অনুশীলন করে নি। প্রত্যেকে আলাদা-ভাবে সমাজের কাছ থেকে পাওয়া তার আয়ত্তাধীন উপায়টুকু দিয়ে প্রকৃতিকে অনুশীলন করে। যে যুগে মানুষ জন্মায় সেই যুগের উৎপাদনের, বিজ্ঞানের ও যন্ত্রকৌশলের উত্তরাধিকারসূত্র দ্বারা সেই যুগের প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তা সীমায়িত।

এমন একসময় ছিল যখন বৈজ্ঞানিকদের অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দূরের কথা! সামান্য ওজন করবার যন্ত্র বা থার্মমিটারও ছিল না। এর ফলে অবশ্য জগৎ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। একালে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত জটিল। সন্দেহ নেই, ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আরও অনেক নিখুঁত হবে এবং মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে আজ যা জানে তার থেকে অনেক বেশি জানতে পারবে। অতএব আজকের দিনেও কেউ "শেষ" বা "চূড়ান্ত" জ্ঞানের কথা বলতে পারে না। বর্তমানে তা আপেক্ষিক, অযথার্থ।

অতএব, লেনিনের কথামত "প্রতিটি বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞা সত্যের যে

সীমাঙ্কিত, তা আপেক্ষিক, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কখনো তার ব্যাপ্তি হচ্ছে, কখনো সংকোচন হচ্ছে"।[১] মানবীয় জ্ঞান সমাজের ক্রমবিকাশের স্তর দ্বারা সীমাঙ্কিত, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের কাঠামো দ্বারা, ইতিপূর্বে অর্জিত জ্ঞানের স্তর দ্বারা তা সীমায়িত। কেউই এই সকল সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে না কিংবা এই সব অবস্থা অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, প্রতিটি সত্য, ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার ছাপ বহন করছে। অতএব ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক। আপেক্ষিক সত্য এমন একটি ধারণা, প্রত্যয় বা প্রতিজ্ঞান, যা মূলত সত্য। অর্থাৎ বা বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অথচ তা অসম্পূর্ণ, এবং বিজ্ঞানের ও সাধনের ক্রমবিকাশের ফলে আরও গভীর, আরও যথার্থ হয়।

এই প্রসঙ্গে সম্ভবত আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন: চূড়ান্ত, শেষ জ্ঞান বলে যদি কিছু না থাকে, জ্ঞান যদি সর্বদাই আপেক্ষিক হয়, **পরম সত্য** বলে কিছু কি থাকতে পারে? অর্থাৎ এমন সত্য কি থাকতে পারে। যা চূড়ান্ত, শেষ, সম্পূর্ণ সত্য?

পরম সত্য

কোন কোন দার্শনিক এই প্রশ্নের জবাব এই ভাবে দেন: যেহেতু প্রজ্ঞানের প্রক্রিয়ালব্ধ আমাদের জ্ঞান প্রায়শই গতব্যবহার, এমনকি ভ্রান্ত প্রমাণিত, এর থেকে বোঝা যায়। পরমসত্য বলে কিছু নেই, যা আছে তা আপেক্ষিক সত্য। আমাদের জ্ঞানে সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, সবকিছুই বিকারী, কিছুই শাশ্বত নয়। এই দার্শনিকেরা বলেন, সবকিছুই আপেক্ষিক। অতএব তাদের বলা হয় **অপেক্ষ-বাদী**।

অন্য দার্শনিকেরা ভিন্ন প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে, যে সব সত্য গতব্যবহার, যার অনেক বেশি যথার্থতা কিংবা অধিকতর অনুশীলন প্রয়োজন, তা সত্যই নয়। "যথার্থ" সত্য কখনও ব্যবহারাতীত হয় না। তারা শাশ্বত, আদি ও অনন্ত। এইগুলি পরম, নিখুঁত, চূড়ান্ত সত্য। যে সব দার্শনিক এইভাবে তর্ক করেন, তাঁরা নির্বিচার মতান্ধ: তাঁদের কাছে সত্য শাস্ত্রবাক্য, অর্থাৎ শাশ্বত, অবিকারী, আদি ও অনন্ত প্রতিজ্ঞা।

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, পৃ ১৩৫।

প্রথমত লক্ষণীয় যে, নির্বিচার মতাবলম্বীরা পরম সত্যের প্রশ্নটিকে একান্তভাবে "শাশ্বত" সত্যের প্রশ্নে পরিণত করেন। তাঁরা বলেন: দুই আর দুই-এ সর্বদাই চার হবে, একটি ত্রিভুজের কোণগুলির যোগফল সর্বদাই দুই সমকোণের সমান হয় এবং হবে, প্যারিস ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত আছে ও থাকবে—এই সত্যগুলি সম্পর্কে কোন সন্দেহ হতে পারে না। এইগুলি শাশ্বত, শেষ, চূড়ান্ত সত্য, অর্থাৎ পরম সত্য।

আপনি বলতে পারেন। "কিন্তু এই প্রকার সত্য সত্যই তো আছে। তাহলে তাকে কেন সমস্যাটির নির্বিচার মতবাদী ব্যাখ্যা বলা হবে?"

বাস্তবিকই এই ধরণের সত্য যথার্থই আছে। তাদের সন্ধান পাওয়া যায় অজৈব প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞানগুলিতে, যেমন গণিতে, জ্যোতিষে, বলবিদ্যায়। এইসব ক্ষেত্রে দুই আর দুই-এ চার-এর মতো সত্য আছে। এমন কি, তথাকথিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানগুলিতেও প্রতিজ্ঞাগুলি নির্বিচারবাদীরা যতখানি মনে করেন, ততখানি শাশ্বত নয়। জ্যোতিষে, পদার্থবিদ্যায়, রসায়নে শত শত প্রকল্প বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশের আলোয় মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, জীববিদ্যার মতো স্যামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে "শাশ্বত" সত্যের সংখ্যা আরও কম এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে যা আছে তা যৎ-সামান্য। এই ক্ষেত্রে একমাত্র শাশ্বত সত্য এই প্রকার প্রতিজ্ঞা হতে পারে: নেপোলিয়ন ১৮২১ সালের ৫ই মে ইহলোক ত্যাগ করেন, এবং এই ধবণের উক্তি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, তথাকথিত শাশ্বত সত্যের অধিকাংশই চর্বিত-চর্বন অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। আমরা কিন্তু সাধারণত আমাদের ব্যাবহারিক কর্মপ্রয়াসে এই ধরণের নূতনত্বহীন অধর্তব্য সত্যের সন্ধান করি না, আমরা এমন জ্ঞানের প্রত্যাশী যা নূতন কিছু দিতে পারে।

কিন্তু শাশ্বত বৈজ্ঞানিক সত্য বলতে কি কিছু নেই, অর্থাৎ এমন সত্য কি নেই যা ভবিষ্যতে কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না? এবং তাহলে সমগ্রভাবে প্রকৃতির পরিচ্ছন্ন জ্ঞান কি শাশ্বত, অখণ্ডনীয়, পরম সত্যরূপে থাকতে পারে না?

এই প্রশ্নটিও প্রণিধানযোগ্য, যেহেতু প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জনের পথে বাস্তবিক কোন অন্তরায় নেই। কাল যা অজানা ছিল, আজ তা আমরা

জানি, এবং আজ যা অজানা আছে আমরা আগামীকাল বা পরশু তা জানতে পাব।

এতৎসত্ত্বেও, সমগ্র প্রকৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান অর্থে পরমসত্যের কথা বলা অসম্ভব। বাস্তবিক, এ কথা মেনে নেওয়া কি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব যে, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে যা কিছু পরিদৃশ্যমান, মানুষ তা অবধারণ করবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনুশীলন করা তার শেষ হয়ে যাবে এবং সেই অর্থে পরম সত্যকে সে জানতে পারবে? জগতের শেষ সমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্তও মানুষ তাকে কখনই বুঝতে পারবে না। কারণ প্রকৃতি অনন্ত এবং নিয়ত বিকাশমান। অতএব মানবীয় জ্ঞানকে সীমাঙ্কিত করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে পারেন, পরমসত্যের অর্থাৎ চূড়ান্ত, শাশ্বত, পরমজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধ কি? তা কি এমন কিছু যা চিরকাল মানুষের নাগালের বাইরে থাকবে?

তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে যদি এই প্রকার জ্ঞানের এই ধারণা করা হয় যে, তাই শাশ্বত সত্য, যে সত্যের পর জ্ঞান লয় পায়, তাহলে বাস্তবিক এই রকম "চূড়ান্ত" সত্য বলে কিছু নেই। কিন্তু আমরা যদি এই প্রশ্নটি একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অর্থাৎ দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, পরম সত্যের অস্তিত্ব আছে এবং সেই সত্য অধিগম্য।

বক্তব্যটি প্রাঞ্জল করার জন্য, লেনিনের সেই উক্তিটি স্মরণ করা যাক, যাতে তিনি বলেছেন যে, সত্য একটি প্রক্রিয়া এবং তার অর্জনও একটি প্রক্রিয়া। সমগ্র প্রকৃতির চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ হিসেবে যেন সত্যকে ধারণা করা না হয়। চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াটি তাৎক্ষণিক ক্রিয়া নয়, তা অবগতির একটি জটিল, ঐতিহাসিকভাবে অনন্ত প্রক্রিয়া, যা সম্পূর্ণভাবে মানুষ কোনকালেই শেষ করতে পারবে না।

আপেক্ষিক সত্যের সঞ্চয়ন থেকেই পরম সত্যে উপনীত হওয়া যায়। জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এই জন্য বলা হয় যে, এই আপেক্ষিক সত্যগুলি ক্রমে ক্রমে জমা হয়ে মানুষকে সমগ্র প্রকৃতির জ্ঞানের, তার ঘটনাপুঞ্জ ও নিয়মাবলীর জ্ঞানের সান্নিধ্যে আনে। যেমন একটি অখণ্ডতা তার অন্তর্গত খণ্ডগুলি থেকে গঠিত হয় তেমনি জ্ঞানের ক্রমবিকাশের শাশ্বত প্রক্রিয়ায় পরমজ্ঞান আপেক্ষিক সত্য দ্বারাই গঠিত হয়।

তত্ত্বগত ধারণানুযায়ী পরমসত্য আপেক্ষিক সত্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয়। এর বিপরীত ধারণা, পরমসত্য বিকাশমান আপেক্ষিক সত্যের সমাহার। এর থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই দুই সত্যের অন্তর্বর্তী কোন দুর্ভেদ্য ব্যবধান নেই। আপেক্ষিক সত্যের জ্ঞান থেকে আমরা পরমসত্যের মূল্যবান বিন্দুগুলি আহরণ করি।

আমাদের জ্ঞান একই কালে পরম ও আপেক্ষিক। মূলত তা পরম-জ্ঞানই, কারণ বস্তুজগতকে গভীর থেকে গভীরতরভাবে অনুশীলন করার পথে মানবজাতির কোন অন্তরায় নেই। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, জ্ঞান আপ-ক্ষিকও, কারণ একটি বিশেষ যুগের সীমায়িত সম্ভাবনা দ্বারা তা পরিচ্ছিন্ন।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, "এখানে কি তাহলে বিরোধ থাকছে না?" হ্যাঁ, বিরোধ আছে। একদিক থেকে মানুষের চিন্তা জগতের সব কিছু অবধারণ করতে সমর্থ; অপরদিক থেকে এই জ্ঞান সর্বাত্মক হতে পারে না, কারণ তা ব্যক্তিবিশেষকে অর্জন করতে হয় এবং তাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ। এটি একটি দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বিরোধ, যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহায়ক এবং বিজ্ঞানকে এক স্থানে স্থির থাকতে দেয় না।

আপনি বলতে পারেন, "সেক্ষেত্রে তাহলে পরমসত্য একটি লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে পৌছানোর আকাঙ্ক্ষা মানবজাতির আছে কিন্তু কখনোই পৌছাতে পারে না।" না, তা প্রতীত হয় মাত্র। সামান্য একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। "জীবন অজৈব পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে," "মস্তিষ্ক চিন্তার অঙ্গ," "পদার্থসমূহ অণুদ্বারা গঠিত"—এই সব এবং অনুরূপ প্রতিজ্ঞান অখণ্ডনীয় বিজ্ঞান ও সাধন দ্বারা তারা প্রমাণিত। পরমজ্ঞানের তারা সত্যকার বিন্দু কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই তত্ত্বগুলি "চূড়ান্ত" সত্য। পরমসত্য [illegible] অবস্থার উপর নির্ভর করে না, তাকে আরও ত্রুটিহীন ও সম্পূ[illegible] [illegible] নেই, তার সঙ্গে কিছু যোগ করা বা তার থেকে কিছু বাদ দেও[illegible] [illegible] বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমবিকাশ তাকে প্রভাবিত করে না—এই প্রকার মত পোষণ করা ঠিক নয়। বস্তুজগতে এই ধরণের সত্যের অস্তি[illegible] নেই এবং তার সন্ধান করাও পণ্ডশ্রম মাত্র।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করে দেখুন। দুই সহস্রাধিক বৎসর আ[illegible] ডিমক্রিটাস শিক্ষা দিয়েছিলেন: পদার্থমাত্র সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণিকায়—অণু[illegible]

গঠিত। বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করেছে যে, পদার্থ বাস্তবিকই অণু দ্বারা গঠিত, কিন্তু অণুগুলি বিভাজ্য। অতএব ডিমক্রিটাসের প্রতিজ্ঞানটি ছিল আপেক্ষিক। কিন্তু তার মধ্যে পরম সত্যের একটি বিন্দুও ছিল। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান তাঁর তত্ত্বকে আরও দূরাবগাহ করেছে। পরমাণু যে একটি পজিটিভ-আহিত নিউক্লিয়াস ও একাধিক নেগেটিভ ইলেক্ট্রন দ্বারা গঠিত, পারমাণব নিউক্লিয়াসে যে ব্যবহার্য শক্তি নিহিত থাকে, এবং পারমাণব তত্ত্বের এই ধরণের আরও অনেক প্রতিজ্ঞা অনাপেক্ষিক সত্য, তা ভবিষ্যতে কখনোই খণ্ডন করা যাবে না। কিন্তু এর দ্বারা বোঝায় না যে, এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। পরমাণুর গঠন গভীর থেকে গভীরতরভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং তার ফলে পারমানব তত্ত্বেরও অনিবার্যভাবে আরও বিকাশ ঘটবে। এই থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদিও মানবীয় জ্ঞান আপেক্ষিক, তার দ্বারা কদাচিৎ এই বোঝায় না যে, তার অন্তর্নিহিত কোন অনাপেক্ষিক উপাদান নেই। প্রতিটি আপেক্ষিক সত্য অনাপেক্ষিক সত্যের একটি কণিকা।

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রতিটি প্রাকৃতিক নিয়ম আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক সত্যের ঐক্য।

এর থেকে বলা যায় যে, **বাস্তব সত্য সম্পর্কে জ্ঞান** অব্যবহিত ও চূড়ান্ত-ভাবে লাভ করা যায় না, তা **লাভ করতে হয়** ধীরে ধীরে, **আপেক্ষিক** সত্যের জ্ঞান মারফৎ। বিকাশমান আপেক্ষিক সত্যের যোগফল থেকে সমগ্র ভাবে প্রকৃতির এবং বিষয়ীভূত সদ্বস্তুর বিশেষ দশাগুলির সম্পূর্ণ, দূরাবগাহ, পরমজ্ঞান লাভ করা যায়

মানুষের ব্যাবহারিক কার্যকলাপে এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিক থেকে সমস্যাটির এই সমাধানের তাৎপর্য কি?

যে সব তত্ত্ব বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে "নিষ্ফল প্রয়াস" ছাড়া কিছু দেখে না, কমিউনিস্ট পার্টি সেইসব তত্ত্বের বিরোধিতা করে, এবং এই বিরোধিতার তত্ত্বীয় ভিত্তি মার্কসীয়-লেনিনীয় এই মতবাদ যে, "চূড়ান্ত" "শেষ" সত্য বলে কিছু নেই, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সত্য আপেক্ষিক এবং পরমসত্য অবধারণের পথে একটি স্তর। কমিউনিস্ট পার্টির এই নির্দেশ যে, ইতিপূর্বে যা অর্জিত হয়েছে তাইতেই খুশি না থেকে, উৎপাদনপ্রয়াসে সমস্ত নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগানো হোক। বিজ্ঞান ও উৎপাদন যত উচ্চস্তরেই

পৌঁছোক না কেন, তা কখনোই বন্ধ্যা দশায় উপনীত হতে পারে না।

সত্য যে অব্যবহিতভাবে এবং অবিলম্বে প্রকট হয় না, সত্য আবিষ্কারের পথ যে দুর্গম, এই প্রতিজ্ঞার উপর অসামান্য ব্যবহারিক তাৎপর্য আরোপ করা হয়। এই কারণেই বিজ্ঞানে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল মিলিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন। এর থেকে মতের সংঘর্ষ শুরু হয়। লেনিনের এই উক্তিটি সর্বদা মনে রাখা দরকার যে,বাদানুবাদ, বিতর্ক, "মানবীয় প্রক্ষোভ" ছাড়া মানুষ কখনও সত্যানুসন্ধান করেনি, করতে পারেও না।

বৈজ্ঞানিক গবেষকরা ভুলত্রুটির হাত থেকে কদাচিৎ রেহাই পেয়ে থাকে। তার কারণ প্রথমত প্রতিটি ব্যক্তির জগৎসম্পর্কে জ্ঞানঅবধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতার শেষ নেই। সেইজন্যে জ্ঞানাহরণের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ভ্রান্তির কিছু কিছু উৎস নিহিত থাকে।

কমিউনিষ্ট পার্টি শিক্ষা দেয় যে, ভুলের প্রকারভেদ আছে। এমন অনেক ভুল আছে যা অনাবধানতাজনিত এবং কোন কোন সময়ে আপরাধিক দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত। এইগুলি নিদারুণ ক্ষতিকর এবং এইগুলির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালানো দরকার। কিন্তু যা নূতন ও অদ্যাবধি অনিরূপিত, তার গবেষণায় ভুল দেখা দিতে পারে। সত্যান্বেষণে এই প্রকার ভুক্রুটি অস্বাভাবিক নয়। এইসব ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। এখানে নিজের কাজ সম্পর্কে আত্মসমালোচনার মনোভাব সৃজনশীল প্রক্রিয়ার সমতুল্য। নিজের ভুলত্রুটি সংশোধনের মধ্যে দিয়েই উন্নতি লাভ করা যায়।

সার্থক সৃজনের অপরিহার্য শর্ত নিজের কর্মপ্রয়াসের ফলাফল সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাব। অপরপক্ষে, ভুলকে বজায় রাখা, আত্মসমালোচনায় সঙ্কোচ বোধ করা, "চূড়ান্ত সত্যে" উপনীত হওয়া গেছে এবং যে ফলপ্রাপ্তি ঘটেছে তার থেকে আরও উৎকর্ষ সম্ভব নয়, এই চিন্তা নিদারুণ ক্ষতিকারক।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র বিষয়ে আমরা আপেক্ষিক সত্য থেকে ভুলত্রুটি ও বাধাবিপত্তি অপসারণ করতে করতে মানবীয় কর্মপ্রয়াসের কোন-না-কোন ক্ষেত্রের পূর্ণতর জ্ঞানলাভে সমর্থ হই এবং এই ভাবেই আমরা আমাদের জ্ঞানকে অধিক থেকে অধিকতর পরিণত করে উন্নতির পথে অগ্রসর হই।

জ্ঞানার্জনকালে "শেষ" এবং এই অর্থে পরমজ্ঞান প্রত্যাশা করা চলে

না। আত্মপ্রসাদ বা আত্মতৃপ্তি প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত নয়, যেহেতু জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনপ্রক্রিয়ার ক্ষান্তি নেই। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আরো একটি দিক আছে। সত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সর্বদা বিশেষ বাস্তব অবস্থানির্ভর।

সত্য সর্বদাই মূর্ত

মনে করুন আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: "কি প্রকারে ফসলের যত্ন নেওয়া দরকার?" আপনি নিশ্চয় বলবেন যে, তার আগে জানা দরকার, ঠিক কোন প্রকারের কৃষিমণ্ডল এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, বৎসরের কোন্ সময়ে তা জন্মায় ইত্যাদি।

প্রশ্নটি করা হয়েছিল নির্বিশেষভাবে। বাঁধাখাতে না চলে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করা দরকার, এই কথা জানিয়ে দিয়ে আপনি প্রশ্নটিকে আরও সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করলেন। "শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সাম্যবাদী সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি কি হবে?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমান অসম্ভব। এইসব প্রশ্নের তখনই জবাব দেওয়া যায়, যখন যে প্রত্যক্ষ অবস্থায় এই ঘটনাগুলি বিকাশলাভ করে তা ব্যক্ত করা হয়। এইখানেই আমরা দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিতে উপনীত হই: "নির্বিশেষ বা বিমূর্ত সত্য বলে কিছু নেই, সত্য সর্বদাই মূর্ত।"[১] লেনিন নির্দেশ করেন যে, বাস্তব চিন্তার দাবি, অর্থাৎ যে অবস্থায় কোন ঘটনা বা ব্যাপার বিকাশলাভ করে তার বিশ্লেষণের দাবি দ্বারা "দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার প্রকৃতি ও সারমর্ম" ব্যক্ত হয়।

মূর্ত সত্য বলতে সেই সত্য বোঝায়, যা বিশেষ ঘটনাবলীর এবং যে অবস্থায় তারা বিকাশলাভ করে, তার সারসত্তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। তুলনায় ঠিক এর বিপরীত—বিমূর্ত সত্য; যে মূর্ত অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে ঘটনাবলীর বিকাশ হয়, বিমূর্ত সত্য তা অস্বীকার করে।

নির্বিচার মতান্ধতার বৈশিষ্ট্যই এই যে, বস্তুজগতের বিশ্লেষণে তা সাধারণ ও বিমূর্ত সত্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যে অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় তার দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে এইগুলিকে প্রয়োগ করা হয়। লেনিন বারংবার জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, সৃজনধর্মী মার্কসবাদের সারমর্ম, তার প্রাণসত্তা "মূর্ত পরিস্থিতির মূর্ত বিশ্লেষণ।"[২]

আমরা আগেই বলেছি, সংঘটনের সময় ও অবস্থার উপর বিকাশ নির্ভরশীল।

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কাস**, খণ্ড ৭; পৃঃ ৪১২

২। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্ক'স**, খণ্ড ৩১, পৃ ১৪৩।

সৃজনধর্মী মার্কসবাদ চায় যে, যে মূর্ত অবস্থায় এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মপ্রয়াস চালিত করতে হয়, সেই দিকে সর্বদা যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে মূর্ত ও ঐতিহাসিক অভিমুখিতার সারমর্ম এই।

জীবনে যা-কিছু ঘটছে সবকিছুর উপর সুবিদিত সাধারণ প্রতিজ্ঞাগুলির যান্ত্রিক প্রয়োগ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধর্মবিরুদ্ধ। অবস্থার পরিবর্তনে যখন পুরাতন তত্ত্বীয় প্রতিজ্ঞাগুলি, সংগ্রামের কৌশলগুলি, কিংবা অর্থনীতির পরিচালন-রূপগুলি নূতন অবস্থার সঙ্গে, সাধনের সঙ্গে আর সঙ্গতি রক্ষা করে না, তখন সেইগুলিকে সাহসের সঙ্গে পরিবর্তিত করে উন্নত করা উচিত। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা এইভাবে কাজ করে থাকে, তার প্রতিটি কার্যে সৃজনী মনোভাব ও প্রকৃত অভিনবত্ব সুপরিস্ফুট।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশল, শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের জন্য তার সংগ্রাম-পদ্ধতি কখনোই "সনাতন" "অপরিবর্তনীয়" থাকেনি। ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এইগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনের স্পন্দন কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই শুনতে পেয়েছে। জীবনকে চিরকালের জন্য একটা বাঁধাছকে ধরে রাখা যায় না; জীবন অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী। এই জীবনের ব্যাপারে বহু অজানিত তথ্যসমন্বিত "রাজনৈতিক সমীকরণের" সমাধান অনবরত করার দরকার হয়। যারা নির্বিচার মতান্ধ তাদের পক্ষে তা সাধ্যাতীত। প্রাচীন অচলায়তনগুলি ধরে রেখে, জীবনের সব সম্পদ তারই মধ্যে তারা নিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কমিউনিস্ট পার্টি এই অভিমুখিতাকে অস্বীকার করে। তা অনিবার্যভাবে লেনিনের নির্দেশ দ্বারা চালিত হয়। লেনিনের কাছ থেকেই আমরা কাজের রূপ ও পদ্ধতিতে এবং কর্মকৌশলে নমনীয়তা শিক্ষালাভ করেছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেস সাম্যবাদের সব সংগঠকদের নির্দেশ দেয় যে, তাঁরা যেন তাঁদের কার্যকলাপে সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। যে কোন প্রকার গতানুগতিকতার সঙ্গে এই সৃষ্টিশীলতা অসমঞ্জস। অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে সবকিছু স্থান ও কালের অবস্থাচক্রের উপর নির্ভর করে।

অতএব উৎপাদন সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রয়াসের সকল ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি বস্তুজগতের ইতিহাসসম্মত প্রত্যয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও নমনীয়তার পরিচয় দেয়।

প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিউনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে উপস্থাপিত করে এবং সেইগুলিকে মুখ্য বিবেচনা ক'রে সেইগুলির সমাধান করে। লেনিন রূপকপ্রয়োগে এই সমস্যাগুলিকে "প্রধান জোড়" বলে বর্ণনা করেন। পার্টির ও দেশের জীবনেতিহাসের প্রতিটি স্তরে ঘটনাধারার প্রধান জোড়টিকে নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করার কথা তিনি বলেন। এই জোড়টিকে আয়ত্ত করতে পারলে সমগ্র শিকলটাকে আয়ত্তাধীনে আনা যায়।

আমাদের ব্যাবহারিক কার্যক্ষেত্রে আমরা সর্বদা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হই। তার প্রত্যেকটির সমাধান প্রয়োজন। তা করতে গেলে প্রধান সমস্যাটি নিয়ে আমাদের শুরু করা উচিত। প্রধান সমস্যার সমাধানের ফলে অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান সহজসাধ্য হয়, লেনিনের কথানুযায়ী আমরা তখন সমগ্র শিকলটাকে আয়ত্তাধীনে আনতে পারি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেনিন যখন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে প্রবৃত্ত হন, তাঁর কাছে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন দেখা দেয়: এই পার্টি কিভাবে সংগঠিত করা হবে? এই বিষয়ে তিনি একটি বিশেষ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তাতে প্রধান জোড় কি, তা তিনি দেখান: এই জোড়টিকে আয়ত্ত করলে রাশিয়ান মার্কসবাদীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার সমাধান সম্ভব হত। লেনিন প্রস্তাব করেন যে, মার্কসবাদীদের উচিত প্রথমে সর্বরুশীয় একটি সংবাদ-পত্রের প্রকাশ ব্যবস্থা করা। এই সংবাদপত্র মার্কসীয় ধ্যানধারণার সাধারণ প্রচারক্ষেত্র এবং সামুদয়িক সংগঠক হতে বাধ্য, একেই কেন্দ্র করে যা-কিছু সর্বোৎকৃষ্ট এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল তার সমাবেশ ঘটবে। সবাই জানে লেনিন-বাদী **'ইসক্রা'** ছিল এই প্রকার সংবাদপত্র।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে কারিগরি উন্নতি প্রধান জোড়। এই জোড়টি আয়ত্ত করে পার্টি এবং জনসাধারণ সাম্যবাদের বাস্তব ও প্রাযোগিক ভিত্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব করছে। সোভিয়েট কৃষিবিকাশের প্রধান উপায় যে সর্বপ্রকার কৃষিফলনের ভিত্তিস্বরূপ শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি, তা এখনও স্বীকৃত। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, "উত্তরোত্তর ফসলোৎপাদন বৃদ্ধি কৃষির অধিকতর

বিকাশে প্রধান জোড় এবং গো-প্রজনন দ্রুততর বৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি।"১

সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির প্রধান জোড় শান্তির জন্য, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য, নূতন এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ নিবারণের জন্য সংগ্রাম। পৃথিবীর সব কমিউনিস্ট পার্টি "শান্তির জন্য লড়াইকে তাদের মূখ্য কর্তব্য বলে মনে করে।"২

অতএব, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, উৎপাদনের এবং রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঘটনাধারাব প্রধান জোড়টি নির্ণয় করা অত্যন্ত দরকাব। বস্তুজগতের বিশ্লেষণে সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হলে এইটির প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১ **দি রোড টু কমিউনিজম**, পৃ ৫২৪-২৫

২ দি ষ্ট্রাগল্ ফব পিস, ডিমক্রেসি এণ্ড সোশ্যালিজম্, পৃ ৫৭

শেষ কথা

এই পুস্তক দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞাগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদতত্ত্বের অনুশীলন এইখানেই থেমে যাওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে গভীরতর জ্ঞানার্জনের জন্য পরবর্তী কর্মপন্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? শ্রেষ্ঠ পন্থা মূল গ্রন্থগুলি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রবর্তকদের রচিত ক্লাসিক রচনাবলী পাঠ করা। এই রচনাগুলির কোন্‌টি দিয়ে শুরু করা উচিত? প্রশ্নটি সহজ নয়।

আসলে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের এমন একটিও রচনা নেই যা কিছু পরিমাণে সাধারণ বিশ্বদৃষ্টির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে নি। মার্কসের রচনায় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, একথা সুবিদিত যে 'ক্যাপিটাল' অর্থনীতিবিষয়ে রচিত মার্কসের মহান গ্রন্থ। অথচ দার্শনিক ধ্যানধারণার কি বিরাট ঐশ্বর্য এতে নিহিত। অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক সাধনসম্পর্কিত বাস্তব প্রশ্নের বিশ্লেষণে মার্কসের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী পদ্ধতির প্রয়োগের আদর্শ দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের এমন কোন একটি বিভাগও নেই যেক্ষেত্রে অধিকতর বিকাশ এই পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে হয়েছে। এই গ্রন্থেই মার্কস তাঁর এই ধারণার রূপদান করেন যে, "তাঁর (হেগেলের) কাছে দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি রহস্যাবৃত খোলশের অন্তর্নিহিত যুক্তিযুক্ত শাঁসটার সন্ধান পেতে চান, এটাকে আবার ঠিকমত সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।"১ মার্কস এখানে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়পদ্ধতি ও হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়পদ্ধতির মধ্যে পুরোপুরি বৈপরীত্য প্রকট করেন। লেনিন যখন বলেন যে, মার্কস যদিও যুক্তিবিদ্যার উপর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করে যাননি, তিনি কিন্তু আমাদের জন্য 'ক্যাপিটাল'-এর যুক্তি রেখে গেছেন, তিনি যথার্থ কথা বলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদবিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তকগুলির মধ্যে

১। মার্কস, ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃ ২০।

কয়েকটি মার্কসবাদী দর্শন অধ্যয়ন করার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিচে লিপিবদ্ধ করছি।

এঙ্গেলসের **অ্যান্টি-ডুহ্‌রিং** সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন একটি চিন্তামূলক রচনা।

অ্যান্টি ডুহ্‌রিং

জার্মান পেটি বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদী অয়গেন ডুহ্‌রিং, যিনি নিজেকে "বাস্তববাদী" এবং "সমাজতন্ত্রী" বলতেন, অথচ আসলে বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্র, উভয়েরই এক অপব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, অ্যান্টি-ডুহ্‌রিং তাঁকেই আক্রমণ করে লেখা। প্রত্যক্ষ বাদানুবাদ থেকেও এঙ্গেল্‌স্‌-এর এই পুস্তকের তাৎপর্য অনেকগুণ বেশী। এটি ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে। তার কারণ, মার্কসবাদের যে তিনটি অঙ্গ— দর্শন, অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ—এই পুস্তক সেই তিন বিষয়ের উপরই ব্যাপক আলোকপাত করে। এই পুস্তক রচনায় মার্কস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ; তিনি এঙ্গেল্‌স্‌-এর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তার উপর যথোচিত মন্তব্য করেন, তা সম্পাদনা করেন এবং নিজেও একটি অধ্যায় লেখেন।

বইটির তিনটি অংশ : দর্শন, অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্র। প্রথম অংশটিতে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে।

এই অংশটি অধ্যয়ন করলে জগতের অস্তিত্ব যে বাস্তবনিয়মধর্মী এবং মানুষ যে এই জাগতিক প্রক্রিয়াগুলিই প্রতিফলিত করে— এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠকের জ্ঞান গভীর হয়। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন, বিজ্ঞানমাত্রই বস্তুজগৎকে প্রতিফলিত করে। গণিতের উদাহরণ থেকে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এঙ্গেল্‌স্‌ লেখেন : "বস্তুজগতের বাইরের অন্য কোন উৎস থেকে সংখ্যা ও চিত্রের প্রত্যয় আসে নি।···আর-আর বিজ্ঞানের মতোই গণিতও মানুষের **প্রয়োজন** থেকে উদ্ভূত : যেমন, জমি মাপবার প্রয়োজন, আধারের আধেয় মাপবার প্রয়োজন, সময়ের হিসাব রাখার প্রয়োজন এবং বলবিদ্যার প্রয়োজন।"[১]

এখানেও এঙ্গেল্‌স্‌-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাটির সন্ধানলাভ করা যায় : "জগতের যথার্থ ঐক্য তার বাস্তবতায় বিধৃত এবং তা দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও বাধাসঙ্কুল বিকাশধারার দ্বারা প্রমাণিত।"[২] এঙ্গেল্‌স্‌-এর

১। এঙ্গেল্‌স্‌, অ্যান্টি-ডুহ্‌রিং (১৯৫৪), পৃ ৫৮-৫৯।

২। ঐ, পৃ ৬৫-৬৬।

এই উক্তির বিরাট তাৎপর্য আছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের সমগ্র ইতিহাস এই কথাই প্রত্যায়িত করে যে, কেবলমাত্র একটিই জগৎ আছে, যা বাস্তব, এই "ইহলোক"। এর দ্বারা তা ভাববাদ ও ধর্মের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানে।

এঙ্গেলস্-এর বইটিতে বস্তু ও গতির ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের অন্যতম মৌলিক প্রতিজ্ঞার তিনি রূপদান করেন, তা এই, "গতিহীন বস্তু কখনো কোথাও নেই, থাকতেও পারে না।"১ এই প্রতিজ্ঞাটির গভীর একটি নিরীশ্বর-বাদী তাৎপর্য আছে: যেহেতু বস্তুর চিরন্তন অনুষঙ্গ গতি, "ঐশ্বরিক প্রথম স্পন্দন"-এর প্রশ্ন আর উঠতেই পারে না।

বইটির সেই সেই বিভাগগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়-বিদ্যার প্রধান সূত্রগুলিকে বিবৃত করে।২ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা ও গণিত—এদের তথ্যের ভিত্তিতে সেইসব সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সবিষয়, আপেক্ষিক ও বিমূর্ত সত্যের সমস্যা সম্পর্কে বিশদ ও ব্যাপক পরীক্ষা এঙ্গেল্স্-এর এই বইটিতে আছে। ডুহ্‌রিং-এর তথাকথিত শেষ ও চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে এঙ্গেল্সের সমালোচনা মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ।৩ এর দ্বারা তিনি সাধারণ-ভাবে নির্বিচার মতান্ধতাকে সমালোচনা করেছেন। আধুনিক মতান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমালোচনার সমসাময়িক তাৎপর্য সম্পর্কে পাঠক যদি চিন্তা করেন, তাহলে তাঁর উপকারই হবে। এই মতান্ধতা মার্কসবাদী তত্ত্বের নানা প্রতিজ্ঞাকে "সনাতন" "অপরিবর্তনীয়" ঐতিহাসিক অবস্থানিরপেক্ষ শাস্ত্রবাক্যে পরিণত করার চেষ্টা করে।

স্বাধীনতার সমস্যাটি এঙ্গেল্স্ বইটির তৃতীয় অংশে আলোচনা করেছেন। এইখানেই তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি পাওয়া যায়— সাম্যবাদ "প্রয়োজনের

১। ঐ, পৃ ৮৬।

২। ঐ, বিপরীতের ঐক্য ও সংঘর্ষ সূত্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পৃ ১৬৫-৬৬, পরিমাণ-গত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পৃ ৯৫, ১৭০, অনস্তিত্বের অনস্তিত্ব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পৃ ১৯০, ১৯৪-৯৫।

৩। এঙ্গেল্স্, অ্যান্টি-ডুহ্‌রিং, পৃ ১১৯-১২২।

রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে উদ্‌গমন।"১ তা একটি উল্লম্ফন। সোভিয়েট জনসাধারণ সাম্যবাদ গঠন করার ভিতর দিয়ে এখন এইটুকাজই করছে।

এই বইটিও একটি ক্লাসিক রচনা। এতে এঙ্গেল্‌স্ সংক্ষিপ্তভাবে মার্কসবাদী দর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। লেনিন লিখে গেছেন যে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র মতো অ্যান্টি-ডুহ্‌রিং ও লুডভিগ ফয়ারবাখ্ শ্রেণীসচেতন প্রত্যেক কর্মীর সর্বক্ষণের সঙ্গী হওয়া উচিত।"২

লুড্‌ভিগ ফয়ারবাখ অ্যাণ্ড দি এণ্ড অফ ক্লাসিকাল জার্মান ফিলসফি।

লুডভিগ ফয়ারবাখ্-এর প্রথম অধ্যায়টি পাঠ করার সময় হেগেলীয় দর্শনের সূক্ষ্ম বিচারের প্রতি এবং বিশেষ করে হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর দর্শনের ভাববাদী উপাদানের বিরোধ নিয়ে যে বিশ্লেষণ আছে তার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা দরকার। আমাদের দ্বিতীয় কথায় এই বিরোধ সম্পর্কে পাঠক অবহিত হয়েছেন।

তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন— যে প্রশ্ন সত্তার সঙ্গে চিন্তার, প্রকৃতির সঙ্গে অধ্যাত্মশক্তির সম্বন্ধবিষয়ক, যে প্রশ্ন যে কোন দার্শনিক বাদ বোধগম্য করার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তার অনবদ্য রূপদান করেন।৩ এর দ্বারা দর্শনের ভাববাদী ধারা যে কোন মুখোশের আড়ালেই আত্মগোপন করে থাকুক না কেন, তাকে চেনা এবং তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভবপর হয়েছে। এক্ষেত্রেও এঙ্গেল্‌স্ বলছেন যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ বস্তুজগতের অবধারণ, এবং তারজন্যে পূর্বকল্পিত ভাববাদী অঙ্কুশগুলি দূর করে মুক্ত মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার।৪

'লুডভিগ ফয়ারবাখ্'এ দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের দ্বিতীয় দিকটির, যথা মানবীয় মন বহির্জগৎকে জানতে সক্ষম কিনা, পাঠক তারও সূত্ররূপের সন্ধান পাবেন। এঙ্গেল্‌স্ অজ্ঞাবাদের সমালোচনা করেন এবং তার প্রতিবাদীরূপে সামাজিক সাধনের চূড়ান্ত ভূমিকার উপর জোর দেন। এইখানে মার্কস তাঁর 'থিসিস অন ফয়ারবাখ্' রচনায় চুম্বকরূপে যা বলেছিলেন, তাকেই বিশদ রূপদান করে এঙ্গেল্‌স্

১। ঐ, পৃ ৩৯১।

২। লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ১৯, পৃ ২৪।

৩। মার্কস অ্যাণ্ড এঙ্গেলস্, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২, পৃ ৩৬৮-৬৯।

৪। মার্কস অ্যাণ্ড এঙ্গেল্‌স্ সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২, পৃ ৩৮৬ দ্রষ্টব্য।

সাধনকে জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি এবং সত্যের মাপকাঠি বলে গণ্য করেন। তিনি এই মত প্রতিপাদন করেন যে, আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ যে জ্ঞানগম্য, তার একমাত্র প্রমাণ সাধন।

দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদী তত্ত্বের সারমর্ম সম্পর্কে এঙ্গেলস যে বর্ণনা দিয়েছেন, পাঠক তার পরিচয় পাবেন চতুর্থ অধ্যায়ে। ফয়ারবাখ্ হেগেলকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন বলে তিনি তাঁর সমালোচনা করেন। অথচ হেগেল সম্পর্কে যা করণীয় ছিল তা হচ্ছে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলিকে বরবাদ করা এবং তা এমনভাবে করা যাতে তাঁর দর্শনের "যুক্তিযুক্ত শাঁসটিকে" অর্থাৎ দ্বন্দ্বসমন্বয়-বাদকে রক্ষা করে কাজে লাগানো যায়। মার্কসবাদের প্রবর্তকরা ঠিক এইটিই সম্পাদন করেন: ফয়ারবাখের বস্তুবাদ এবং হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয়বাদকে মৌলিক-ভাবে নবরূপায়িত করে তাঁরা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত দর্শন— দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ সৃষ্টি করেন।

মার্কসবাদী দর্শনের বিকাশে লেনিনের এই বইটি একটি যুগান্তকারী রচনা।

মেটিরিএলিজম এণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম

১৯০৫-০৭ সালের প্রথম রাশিয়ান বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যুদস্ত হবার পর যে প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার কাল দেখা দেয়, এই বইটি সেই সময়ে, ১৯০৯ সালের মে মাসে, প্রকাশিত হয়। লেনিনের 'মেটিরিএলিজম অ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম্' বোঝার পক্ষে এই উপলক্ষটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবদিকে তখন প্রতিক্রিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল: অর্থনৈতিক, রাজ-নৈতিক ও ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রের কোনটিই বাদ ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে মার্কসবাদী দর্শনকে সংশোধন করার প্রচেষ্টা বিশেষরূপে বিপজ্জনক। একদল রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমক্র্যাট: বোগডানভ, বাজারভ, ইউশকেভিচ, ভালেনটিনভ এবং আরো অনেকে, এই প্রকার সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে আক্রমণ করে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে পুস্তক ও প্রবন্ধা-বলী প্রকাশ করতে থাকেন।

তাঁরা মার্কসীয় দর্শনের "উন্নতিসাধনে"র ও নব "রূপায়ণে"র প্রয়োজনে ওই দর্শনের সংশোধন যে যুক্তিসম্মত তা এই বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তাঁদের মতে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ "সেকেলে" হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞানের নূতন স্তরের সঙ্গে তার আর "সঙ্গতি নেই"। মার্কসবাদী দর্শনের স্থলে তাঁরা ভাববাদী ধারার

আরেকটি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। পশ্চিমাঞ্চলে সেই সময় এই দর্শনের খুব প্রচলন হয়। একে বলা হত "এমপিরিও ক্রিটিসিজম" বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ: এই দর্শনের প্রতিপাদ্য হয় "বিচারমূলক অভিজ্ঞতা"। এই মেকি বৈজ্ঞানিক নামের মুখোশ পরিয়ে তাঁরা তাঁদের জ্ঞাতৃগত ভাববাদী মতবাদকে চালাবার চেষ্টা করেন। লেনিন এই দর্শনকে এর প্রবর্তক, অস্ট্রীয়ান পদার্থবিদ্ ও দার্শনিক আর্নস্ট মাখ্-এর নাম অনুযায়ী মাখ্-বাদ বলে বর্ণনা করতেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষের কথা স্মরণ রাখা উচিত। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে পদার্থবিদ্যায় অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার ঘটে এবং তারই ফলে নূতন দার্শনিক সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়। আমরা তৃতীয় কথায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, মাখ্‌বাদীরা বস্তুবাদকে "মিথ্যা প্রতিপন্ন" করার জন্য সেইগুলিকে কাজে লাগান এবং সেইসূত্রে নিজেদের দর্শনকে বিংশ শতাব্দীর "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দর্শন" বলে অভিহিত করেন।

এই মিথ্যাবাদের সুযোগ রাশিয়ান মাখ্‌বাদীরা গ্রহণ করেন। তাঁরা বলতে চান যে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ "সেকেলে"। এই পুস্তকে লেনিন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক তথ্যগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং তা সামান্যীকরণ করে দেখান যে, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে পদার্থবিদ্যায় যে বিপ্লব দেখা দেয় মাখ্‌বাদ তার সারমর্ম ও তাৎপর্যকে বিকৃত করে।

লেনিনের এই রচনার কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত?

আমরা আগেই দেখেছি যে, দর্শনের সমগ্র ইতিহাস বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। মাখ্‌বাদীরা কিন্তু প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তাঁরা বস্তুবাদ ও ভাববাদ এদের উভয়েরই "ঊর্ধ্বে উঠতে" সমর্থ হয়েছেন, এবং একটি "নিরপেক্ষ" দর্শন সৃষ্টি করেছেন। লেনিন তাঁর ভূমিকায় বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মাখ্‌বাদীরা কোন "নূতন" "নিরপেক্ষ" দর্শন সৃষ্টি করেননি। তাঁদের দর্শন বার্কলের জ্ঞাতৃগত ভাববাদের পুনরুজ্জীবন মাত্র। বইটির ভূমিকার শিরোনামা "১৯০৮ সালে কোন কোন মার্কসবাদী এবং ১৯১০ সালে কোন কোন ভাববাদী কিভাবে বস্তুবাদকে খণ্ডন করেন।" দুশো বছর পূর্বেকার বার্কলের উক্তির সঙ্গে রাশিয়ান মাখ্-বাদীর উক্তির তুলনা করে লেনিন দেখিয়ে দেন যে, উভয়ের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে এক।

প্রথমে তিনটি অধ্যায়ে অন্যতম মৌলিক সমস্যা, জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ম্যাখ-বাদীদের "যুক্তি"র শূন্যগর্ভতাকে লেনিন প্রকট করেন এবং প্রমাণ করেন যে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদী নীতি অকাট্য। এই অধ্যায়গুলি পাঠ করার সময় পাঠকের পক্ষে কিছু পরিমাণে দুরূহ বোধ হতে পারে, তবে এরজন্যে দায়ী মাখ্‌বাদীরা নিজেরাই। তাঁরা তাঁদের মতবাদ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

মাখ্‌বাদী তত্ত্বের আসল অর্থ লেনিন প্রকট করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাখ্‌'এর "বিশ্ব উপাদান" তত্ত্ব সম্পর্কে এবং আভেনেরিয়াস (অন্যতম মাখ্‌বাদী) যাকে প্রধান অঙ্গাঙ্গীকরণ বলেছেন, সেই তত্ত্ব সম্পর্কে লেনিনের সমালোচনা আমরা উল্লেখ করছি। ১

সংবেদনের সমস্যা সূত্রে মাখ্‌'এর "বিশ্ব-উপাদান"এর সমালোচনা করা হয়। এখানে লেনিন দুই ধারার— বাস্তববাদী ধারার এবং ভাববাদী ধারার—সূত্র উপস্থাপিত করেন। "আমাদের কি পদার্থ থেকে সংবেদন ও চিন্তায় উপনীত হতে হয়? না, আমাদের চিন্তা ও সংবেদন থেকে পদার্থে উপনীত হতে হয়? প্রথম ধারা অর্থাৎ বাস্তববাদী ধারা এঙ্গেল্‌স্ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ ভাববাদী ধারা মাখ্‌ গ্রহণ করেন।"২

মাখ্‌-এর "বিশ্ব-উপাদান" তত্ত্বে সংবেদনের সমস্যাটি ভাববাদী ধারানুযায়ী বিচার করা হয়। মাখ্‌ সংবেদনকে "বিশ্ব-উপাদান" বলেন। তিনি বলেন, এই জগৎ সবিষয় পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়, তার গঠনে কেবলমাত্র আছে সংবেদন="বিশ্ব-উপাদান"। পদার্থ "সংবেদনসমূহের জটিল মিশ্রণ"। অতএব তাঁর মতে, আমাদের সংবেদন অনুশীলন করা দরকার, পদার্থ নয়। এই দৃষ্টি-ভঙ্গি জ্ঞাতৃগত-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্যে মাখ্‌ কূটতর্কের আশ্রয় নেন। লেনিন মাখ্‌'এর "বিশ্ব-উপাদান"-তত্ত্ব সম্পর্কিত এই কূটতর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

এইটি বুঝতে হলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধান করা দরকার। মাখ্‌ বলেন উপাদানের দুটি শ্রেণী আছে: ১। যে সব উপাদান মানুষের উপর নির্ভর করে না (এইগুলিকে তিনি পদার্থগত উপাদান বলেন) এবং ২। যেসব উপাদান মানুষের উপর নির্ভর করে (এইগুলিকে তিনি মানসিক উপাদান বলে)।

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়াকর্স**, খণ্ড ১৪, পৃ ৫৩-৭৪।

২। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়াকর্স**, খণ্ড-১৪, পৃঃ ৪২।

এর মধ্যে মিথ্যা, কূটচাল, কোথায়? পদার্থগত ও মানসিক—এই দুটি শ্রেণীর চিরন্তন সহ-অবস্থান। এদ্বারা প্রকারান্তরে বোঝানো হয় যে বস্তুজগৎ, অর্থাৎ "পদার্থগত শ্রেণী"র, বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব "মানসিক শ্রেণী"র উপর নির্ভর করে। কিন্তু আত্মগত ভাববাদের সারকথাঠিক এইটেই। পদার্থের অস্তিত্ব তখনই মাত্র থাকে যখন তা জ্ঞাতার অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষগোচর হয়।

আভেনেরিয়াস-এর "প্রধান অঙ্গাঙ্গীকরণ" সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। তাঁর মতে, বিষয়ী এবং তার বাস্তব পরিবেশের মধ্যে, কিংবা, তাঁর পরিভাষা অনুযায়ী, আত্ম এবং অনাত্মর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটি যোগ (একটি "অঙ্গাঙ্গীকরণ") থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতি ও বিষয়ী কেবলমাত্র একত্রেই অবস্থান করতে পারে। লেনিন এই মতবাদকে কিভাবে খণ্ডন করেন?

লেনিন অত্যন্ত সরল, অথচ গভীরভাবে বৈজ্ঞানিক, একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন: "প্রকৃতির অস্তিত্ব কি মানুষের আগে ছিল?" আমাদের চতুর্থ কথায় আমরা আগেই বলেছি যে, এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর বস্তুর আদিমতা এবং চেতনার গৌণপ্রকৃতিবিষয়ক বস্তুবাদী তত্ত্বকে অদ্ভুতভাবে সমর্থন করে। সেই সঙ্গে তা বিভ্রান্তিকর "প্রধান অঙ্গাঙ্গীকরণ"কে চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করে।

মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই প্রকৃতি রয়েছে, ফলত, মানুষ এবং প্রকৃতি কখনই অবিচ্ছেদ্যভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতির অস্তিত্ব বিষয়াত্মক, তা মানুষের থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

মাখবাদের সমালোচনা এবং তার যুক্তির শূন্যগর্ভতা প্রদর্শনপ্রসঙ্গে লেনিন মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সত্যতা বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন ও তার বিকাশসাধন করেন। এইখানেই তিনি বিশদ এক বর্ণনায় দেখিয়েছেন যে, আমাদের জ্ঞান বস্তুজগতের একটি নকল, একটি প্রতিফলন মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায় প্রায় সবটাই এই বিষয় নিয়ে লেখা।১ অজ্ঞাবাদের সমালোচনার ভিত্তিতে লেনিন জ্ঞান-শাস্ত্র বিষয়ক যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানে গ্রহণ করেন, পাঠক এখানে তার সন্ধান পাবেন। সিদ্ধান্তগুলি এই: ১। আমাদের চেতনা, আমাদের উপলব্ধি থেকে স্বাধীনভাবে, আমাদের বহিঃস্থিতরূপে পদার্থসমূহ অবস্থান করে। ২। নীতিগতভাবে আকৃতি ও "স্বরূপ বস্তুর" মধ্যে

১। ঐ, পৃ ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৭, ১১৪, ১১৫।

কোন প্রভেদ নেই; এইরূপ কোন প্রভেদ থাকতেও পারে না। প্রভেদ থাকে কেবলমাত্র যা জানা গেছে এবং যা জানা যায়নি, এই দুয়ের মধ্যে। ৩। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কেও আমাদের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী পদ্ধতিতে চিন্তা করা দরকার। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয়, ছকে-তৈরী জিনিস বলে ধারণা করা মোটেই উচিত নয়। উপরন্তু আমাদের নির্ণয় করা দরকার কিভাবে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, কিভাবে অসম্পূর্ণ, অযথার্থ জ্ঞান অধিকতর সম্পূর্ণ ও যথার্থ হয়ে ওঠে।

জ্ঞানের সমস্যাগুলি পাঠ করার সময় তথাকথিত প্রতীকতত্ত্বের উপর লেনিন যে সমালোচনা করেছেন তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিআরোপ করা দরকার। চতুর্থ অধ্যায়ের একটি বিশেষ বিভাগ এই বিষয় নিয়েই লেখা।১ এখানে লেনিন "প্রতীক তত্ত্বের" অথবা "সাঙ্কেতিক তত্ত্বের" (সময় সময় তা যা বলা হয়) সারসত্য সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন।

আমরা আগেই দেখেছি যে, আমাদের জ্ঞান বস্তুজগতের প্রতিরূপ, ভাস প্রতিভাস দ্বারা নিরূপিত। উল্লিখিত মতের প্রবক্তারা এই মত পোষণ করেন যে, মানুষের জ্ঞান কেবলমাত্র বাস্তব পদার্থের "সঙ্কেত" "প্রতীক" দ্বারাই গঠিত, তাদের প্রতিরূপ দ্বারা নয়। বস্তুজগতের সঙ্গে সে-সবের কোন মিল আছে, তাঁরা অস্বীকার করেন। লেনিন দেখান যে সাঙ্কেতিক তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক, কান্টিয় তত্ত্ব, কারণ, আমাদের জ্ঞান বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে না, এই মত ব্যক্ত করে জাগতিক জ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে তা অস্বীকার করে।

লেনিনের বইএর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বস্তুসমস্যাবিষয়ে রচিত। আমরা এর আগে তৃতীয় কথায় লেনিন বস্তুর যে দার্শনিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করেছি।২ বলতে গেলে বইটির প্রত্যেক অধ্যায়েই তিনি এই মূল প্রত্যয়টির বিষয়ে ফিরে ফিরে আলোচনা করেছেন এবং বারে বারে নূতন আলোকপাত করেছেন।৩

পাঠক লেনিনের বইটির পঞ্চম অধ্যায়টি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে যেন পাঠ

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কাস**, খণ্ড ১৪, পৃ ২৩২-৩৮।

২। পৃঃ দ্রঃ

৩। লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ১৪, পৃ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৬, ৬৭, ৬৩, ৭৫, ৪৬, ৯২, ৯৩, ১৪৬, ২৭৪-৭৭, ২৭৯-৮২, ২৯৭-৯৮, ৩০৮, ৩১২-১৩।

করেন। এই অধ্যায়ে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত দার্শনিক সমস্যাগুলি আলোচনা করেছেন। উক্ত অধ্যায়ে এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, যথা: পদার্থ বিদ্যায় বিপ্লবের প্রকৃতি কি? পদার্থবিদ্যার সঙ্কটের প্রধান প্রধান লক্ষণ কি? এই সঙ্কটগুলির আবির্ভাব কিভাবে ঘটল? এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

লেনিন দেখান যে, পদার্থবিদ্যার বিপ্লবাত্মক নূতন আবিষ্কারগুলিই (আমরা তৃতীয় কথায় তার বর্ণনা দিয়েছি) যে পদার্থবিদ্যার সঙ্কটের কারণ, তা নয়। বুর্জোয়া দার্শনিকেরা এইসব আবিষ্কার থেকে যে ভাববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সঙ্কট তারই ফলে সৃষ্ট হয়। আসলে ভাববাদী দার্শনিকেরা— মাখ্‌বাদীরা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদীরা— প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিপ্লবকে নিজেদের সার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিলেন। পদার্থবিদ্যায় বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিক ভাববাদের এই যোগসূত্রের কথাই লেনিন উল্লেখ করেন যখন তিনি লেখেন: "আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্কটের সারমর্ম পুরনো সূত্রগুলি ও মৌলিক নীতিগুলি ভেঙে পড়ার মধ্যে, মনের বহিস্থিত বিষয়ীভূত সদ্বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মধ্যে, অর্থাৎ ভাববাদ ও অজ্ঞাবাদকে বস্তুবাদের স্থলাভিসিক্ত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে। 'বস্তু অন্তর্হিত হয়েছে'— সঙ্কট সৃষ্টিকারী যে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নগুলি দেখা দেয়, তাদের অনেকের সম্পর্কেই মৌলিক বিশিষ্ট ও প্রতিবন্ধকতা এই উক্তি দ্বারা ব্যক্ত করা যেতে পারে।"১ এরই ভিত্তির উপরে "পদার্থগত" ভাববাদের মত উদ্ভট ঘটনার উদ্ভব হয়। লেনিন এই ভাববাদের গভীর বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করেন।

আধুনিককালের মাখ্‌-বাদীদের, সর্বস্তরের কমিউনিস্ট বিরোধীদের ও সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে লেনিনের এই বইটি পাঠ করার গুরুত্ব অসাধারণ।

লেনিনের এই রচনাটিকে দার্শনিক জ্ঞানের কোষগ্রন্থ বলা যায়। যে বিস্তৃত পরিধির সমস্যাসমূহ নিয়ে লেনিন আলোচনা করেছেন তা এই পুস্তকের প্রকৃতি থেকেই নির্ণীত। বিভিন্ন সময়ে তিনি

ফিলসফিকাল নোটবুক

যখন দর্শন নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি নানা ধরণের দার্শনিক গ্রন্থ থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেন। বিশেষত মূল্যবান লেনিনের গভীর বিশ্লেষণ

১। ঐ, পৃ ২৫৮।

সমালোচনাগুলি, তাঁর মন্তব্যগুলি, তাঁর সিদ্ধান্ত ও সামান্যীকরণ। বিশেষ নিবিষ্টতার সঙ্গে তিনি ১৯১৪-১৬ তে দার্শনিক সমস্যাবলীর উপর কাজ করেন। তাৎপর্যপূর্ণ এমন কোন দার্শনিক সমস্যা নেই যা লেনিন তাঁর এই বইএর অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্লেষণ করেন নি।

দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্নগুলি এই পুস্তকের প্রধান বিষয়। এই পুস্তকের কাছ থেকে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বাদের অধিকতর বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার বাস্তব উপাদান লেনিন যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, নীতির দিক থেকে তার গুরুত্ব অশেষ। এই সূত্রে তিনি বলেন যে,"**পদার্থের** দ্বন্দ্বসমন্বয় থেকে **ধ্যানধারণার** দ্বন্দ্বসমন্বয়ের উদ্ভব হয়, বিপরীত প্রক্রিয়া সত্য নয়।"১ এর অর্থ প্রকৃতির নিজস্ব ও সমাজের দ্বন্দ্বসমন্বয় দার্শনিক প্রত্যয়ে ও মূলপ্রত্যয়ে প্রতিফলিত হয়। এতে এঙ্গেল্‌স্‌এর সেই সুবিদিত কথাকে আরও স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, ভাবের দ্বন্দ্বসমন্বয়, অথবা, তাঁর অভিধা অনুযায়ী, জ্ঞাতৃগত দ্বন্দ্বসমন্বয় পদার্থের দ্বন্দ্বসমন্বয়ের, বিষয়মুখ দ্বন্দ্বসমন্বয়ের, বস্তুজগতের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রতিফলন মাত্র।

লেনিন আরও দেখান যে, বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বসমন্বয় অবিচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, সেই সঙ্গে একথাও জোরের সঙ্গে বলেন যে, মার্কসবাদী দর্শন কেবলমাত্র বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হেগেলকে তাঁর দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার ভাবাদর্শবাদী চরিত্রের জন্য সমালোচনা করে লেখেন: "দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার সমর্থক হেগেল বস্তু থেকে গতিতে, বস্তু থেকে চেতনায়—বিশেষত দ্বিতীয়টিতে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী উত্তরণ বুঝতে পারেন নি। মার্কস এই ভাববাদীর ভুল (কিংবা দুর্বলতা) সংশোধন করেন।"২

লেনিন বিকাশের প্রশ্নদুটি পরীক্ষা করার সময় গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দ্বন্দ্ব সমন্বয়বিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যার মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে দেন। "অন দি কোয়েসচন অফ ডায়ালেক্‌টিক্‌স"৩ নামক খণ্ড প্রবন্ধটিতে এইটি পাওয়া যাবে। এই-খানে লেনিন প্রাকৃতিক ঘটনা বিকাশের আভ্যন্তরিক উৎসের সমস্যাটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এই সমস্যাটি তিনি যে ভাবে দেখেছেন তার থেকেই দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে তীব্রতম বিভেদ সৃষ্টি হয়।

১। লেনিন, **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

২। ঐ, পৃঃ ২৮৩।

৩। ঐ, পৃ ২৫৯-৩৬৩।

লেনিন বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার সূত্রগুলির উপর গভীর মনোনিবেশ করেন। সারা বইটিতে তিনি এইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা কতকগুলি মৌলিক ও প্রধান প্রশ্নের কথা বলব। বিপরীতের সংঘর্ষ ও ঐক্যসূত্রটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের তথ্যের উপর নির্ভর করে, লেনিন এই সূত্রটির সার্বিক প্রকৃতি প্রকট করেন এবং সেইসঙ্গে দেখান যে, জগতের সমুদয় ঘটনাবলী আন্তর বিরোধবিশিষ্ট এবং বিপরীত দশা ও প্রবণতা দিয়ে গঠিত।১ এইখানে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন যে, "সমগ্র এককে খণ্ডিত করা এবং তার বিরোধাত্মক অংশগুলিকে জ্ঞানত অবধারণ করা দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার সারমর্ম।"

লেনিনের রচনার এই অংশের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের সূত্রে "ঐক্যে"র আপেক্ষিক চরিত্র এবং বিপরীতের "সংঘর্ষের" অনাপেক্ষিক চরিত্র সম্পর্কে আরও গভীরভাবে অনুশীলন করা যেতে পারে।২ সেই সঙ্গে বিকাশের উৎসরূপে বিরোধের প্রশ্নটিও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

উল্লিখিত 'অন দি কোয়েস্চ্ন অফ ডায়ালেক্টিক্স' নামক খণ্ড প্রবন্ধটিতে লেনিন পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ সূত্রটির সারমর্ম এবং এই বিষয়ে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ও তত্ত্ববিদ্যাগত মতের বৈসাদৃশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন। লেনিন বলেন, তত্ত্ববিদ্যার মতে "বিকাশ অর্থ হ্রাস ও বৃদ্ধি, পুনরাবৃত্তি।"৩ বিকাশের সূত্রটিকে তা দেখতে পায় না।

দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যা কিন্তু বিপরীতের সংঘর্ষকে বিকাশের উৎসরূপে গণ্য করে এবং এই মতানুযায়ী "উল্লম্ফনের, ধারাবাহিকতায় ছেদের, বিপরীতের রূপান্তরের, প্রাচীনের বিলয়ের এবং নবীনের আবির্ভাবের রহস্যসূত্রটির সন্ধান এইখানেই পাওয়া যায়।"৪ বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি সূত্রের মধ্যে যোগ তাদের মধ্যে আভ্যন্তরিক ঐক্য, লেনিন যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিয়েছেন, তা বেশ বোঝা যায়।

পূর্বতন গুণ থেকে নবতর গুণে রূপান্তরের মুহূর্ত রূপে উল্লম্ফনকে গণ্য করে

১। ঐ, পৃ ৩৫৯-৬০।

২। ঐ, পৃ ৩৬০।

৩। ঐ

৪। ঐ

সেই সম্পর্কে গভীর গবেষণা এই পুস্তকে করা হয়েছে। "ক্রমিকতার সঙ্গে যদি উল্লম্ফন না থাকে, তারদ্বারা কিছুই ব্যাখ্যা হয় না", লেনিনের এই মত প্রণিধান করা উচিত।১ এই প্রসঙ্গে লেনিন যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তার যে জবাব দেন তা বোঝা সহজ হয়ঃ "দ্বন্দ্বহীন রূপান্তর থেকে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য কোথায়? উল্লম্ফনে। বিরোধে। ক্রমিকতাব ছেদে।"২

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্যার মূলপ্রত্যয়গুলি অবধারণ করার পক্ষে লেনিনের এই রচনাটির গুরুত্ব অনেক। এইখানে এই মূলপ্রত্যয়গুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। লেনিনের মতে এই মূলপ্রত্যয়-গুলি বস্তুজাগতিক জ্ঞানের কয়েকটি পর্যায়।

মানবীয় জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় মূলপ্রত্যয়গুলি কিভাবে গঠিত হল এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে কিভাবে তারা বিকাশ লাভ করল? তাদের উপাদান কি বিষয়াত্মক? তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ কি? এইসব প্রশ্নের সর্বাঙ্গীণ উত্তর লেনিনের এই পুস্তক পাঠে যাওয়া যাবে। লেনিন লিখেছেন, 'মানুষের ব্যাবহারিক কার্যকলাপ থেকে তার চেতনা লক্ষ লক্ষ বার নানা নৈয়ায়িক লক্ষণার পুনরাবৃত্তি করে চলে, যাতে এই লক্ষণাগুলি স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য লাভ করতে পারে।"৩

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মূলপ্রত্যয়গুলি সর্বপ্রকার মানবীয় সাধনের, জাগতিক জ্ঞানের ইতিহাসের সিদ্ধান্ত বা পরিণামফল। অতএব, তাদের উপাদান বিষয়াত্মক, সেইগুলি মানুষ তার চেতনা থেকে, তার চিন্তা থেকে সৃষ্টি করে নি, নিজের "সুবিধার" জন্য মানুষ সেইগুলিকে আবিষ্কার করে নি। এই প্রসঙ্গে লেনিন মূলপ্রত্যয়ের ভাববাদী ধারণার সমালোচনা করেন।৪

লেনিনের এই পুস্তকের সাহায্যে আমরা প্রতিটি মূলপ্রত্যয়কে গভীরভাবে অনুশীলন করতে পারি। কারণ ও পরিণাম অনুশীলন করার সময়, লেনিনের এই উক্তিটি প্রণিধান করা কর্তব্য; "কারণতা, আমরা কারণতা সম্পর্কে সাধারণত যা বুঝি, সর্বময় আন্তর্যোগের একটি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র, কিন্তু তা (একটি বস্তুবাদী প্রসার) এমন একটি কণিকা যা বিষয়ীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা

১। ঐ ১২৩

২। ঐ ২৮৪

৩। ঐ পৃঃ ১৯০

৪। লেনিনঃ **কলেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড ৩৮ পৃ১৭৮, ২০৬-০৭,২০৮-০৯।

যথার্থ বিষয়গত যোগের অন্তর্ভুক্ত।"১

লেনিনের এই চিন্তা কিভাবে আমাদের বোঝা দরকার? কারণিক যোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সর্বময় এবং জগতে এর তাৎপর্য বিপুল। কিন্তু যোগের একমাত্র রূপ বলে যেন একে মনে করা না হয়। লেনিন বলেন যে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে আন্তরযোগ কারণিক যোগ থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও সমৃদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়। কারণিক যোগ সর্বময় আন্তরযোগের "একটি ক্ষুদ্র কণিকা" মাত্র।

অপরিহার্যতা ও স্বাধীনতার মূলপ্রত্যয়গুলি পরীক্ষাপ্রসঙ্গে লেনিন মানুষের স্বাধীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপের প্রশ্নটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, মানুষের লক্ষ্য নিয়ম দ্বারা, অপরিহার্যতা দ্বারা নির্ধারিত হয়, যদিও কখনো কখনো "মানুষের কাছে মনে হয় যেন তার লক্ষ্যগুলি জগতের বাইরে থেকে আমদানী হয়েছে এবং তা জগৎ থেকে স্বাধীন ('স্বাধীনতা')"২ অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে স্বাধীনতাকে লেনিন যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষত "স্বাধীন" পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের উপর তাঁর সমালোচনা।৩

লেনিন রূপ ও উপাদানের ঐক্যকে, তাদের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী যোগকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। তিনি লিখেছেন: "রূপ সারাত্মক। সারসত্তা রূপ লাভ করে। কোন না কোন ভাবে সারসত্তার উপর নির্ভরতাও থাকে।"৪ এর থেকে বোঝা যায় যে রূপ ও উপাদানের ঐক্য প্রকট করতে গিয়ে আমরা ঘটনাবলীর সার-সত্তায় গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

সারসত্তা ও ঘটনা—মূলপ্রত্যয়গুলি পরীক্ষা করার সময় এই বিষয়ে লেনিনের ভাববাদ ও তত্ত্ববিদ্যার উপর সমালোচনাটি পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার।৫ বিরাট

১। ঐ, পৃ ১৬০

২। ঐ, পৃ ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯

৩। ঐ, পৃ ১৮৯

৪। ঐ, পৃ ৩৯

৫। ঐ, পৃ ৯২, ১৩৩-৩৪।

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও সারসত্তার ঐক্যের উপর লেনিনের বিশ্লেষণ এবং তাঁর এই প্রতিজ্ঞা "**নিয়ম** এবং **সারসত্তা** একই ধরণের প্রত্যয় (একই শ্রেণীভুক্ত), বরং, একই মাত্রার। এই দুইএর দ্বারা ঘটনাবলী, জগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পায়।"১ এর অর্থ এই যে, নিয়ম সারসত্তার কোন বিশেষ দিকের প্রকাশরূপ। ঘটনাবলীর সারসত্তা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত স্বতন্ত্র নিয়মাবলী দ্বারা প্রকাশিত হয়। নিয়মের মূলপ্রত্যয় সারসত্তাকে মূর্ত করে।

লেনিনের এই রচনাতে পাঠক সারসত্তা ও আকৃতি (সাদৃশ্য) বিষয়ক মূল-প্রত্যয়গুলির আলোচনাও পাবেন। নামের থেকেই বোঝা যায়, আকৃতি (সাদৃশ্য) বস্তুজগতের, সারসত্তার স্বতন্ত্র দিকের সেই প্রকাশরূপ, যা সাক্ষাৎভাবে মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। অতএব, সাদৃশ্যের মধ্যে একটি জ্ঞাতৃগত মুহূর্ত থাকে। কিন্তু এটিও, লেনিন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন, "এর অন্তর্নিহিত সারসত্তার **প্রতিফলন**।"২

লেনিনের '**ফিলসফিকাল নোটবুক**'-এ আলোচিত কয়েকটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ আমরা করলাম। এর থেকেই অবশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হলে তাদের গুরুত্ব অসাধারণ।

এইটি লেনিনের শেষ দার্শনিক পুস্তক। এইটির রচনাকাল ১৯২২। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'আনডার দি ব্যানার অফ মার্কসিজ্‌ম্‌' এর সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে চিঠির আকারে এটি রচিত। এটিকে যথার্থই লেনিনের দার্শনিক চরমপত্র বলা হয়।

অন দি সিগনিফিকান্স অফ মিলিটান্ট মেটিরিএলিজম

বইটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, এটি সংগ্রামী বস্তুবাদের চমৎকার একটি ব্যাখ্যা, বিশুদ্ধ লেনিনবাদী পক্ষপাতিত্বের একটি আদর্শ। যে মূলসুর সারা বইটি ছেয়ে আছে তা লেনিনের এই দাবি যে, "পুরোহিততন্ত্রের উপাধিধারী চাটুকারেরা" যে কোন মুখোশের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখুক না কেন, তাদের স্বরূপ নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই জঙ্গী কর্মসূচী বর্তমানে পশ্চিমী দেশগুলির উচ্চকোটিতে প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক ভাবধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পক্ষে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১। ঐ পৃ ১৫২।

২। ঐ পৃ ১৩৩।

লেনিন এই পত্রিকাটির উপর সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হবার দায়িত্ব অর্পন করেন এবং তার এই কর্তব্য স্থির করে দেন—অক্লান্তভাবে নিরীশ্বরবাদী প্রচারকার্য চালনা এবং নাস্তিক মতবাদের পক্ষে অক্লান্ত লড়াই।১ এই প্রবন্ধে লেনিন তাঁর সুবিদিত প্রতিজ্ঞাটির এই সূত্ররূপ দান করেন। ধর্মবিশ্বাসীদের বোঝাতে হলে "এদিক থেকে হোক, ওদিক থেকে হোক, এমনভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার যাতে তাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়, যাতে তাদের ধর্মের ঘোর থেকে জাগিয়ে তোলা যায়। এইজন্যে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য আনতে হবে।"২

এখানে লেনিন বুর্জোয়া "স্বাধীনতা" এবং "গণতন্ত্রের" উপর যে সমলোচনা করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এই স্বাধীনতা কিছুই নয়, বুর্জোয়াদের যাতে সুবিধা বাড়ে তাই প্রচারের স্বাধীনতা। যথা, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা, ধর্ম, গুহ্যবাদ শোষকদের স্বার্থ সমর্থন ইত্যাদি।৩

লেনিন দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি সংগ্রামী মৈত্রী স্থাপনের কর্তব্য নির্ধারিত করেন। তিনি লিখেছেন, "প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে আধুনিক বস্তুবাদী হতে হবে।৪ মার্কস কর্তৃক প্রবর্তিত বস্তুবাদের সচেতন সমর্থক হতে হবে অর্থাৎ তাকে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদী হতে হবে।" আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যসমূহের উপর দার্শনিক সামান্যীকরণের ব্যাপারে লেনিনের এই দাবির গুরুত্ব অত্যধিক। এই প্রসঙ্গে লেনিন পাঠকদের কাছে ইতিপূর্বে সুবিদিত সেই কথাটির উপর পুনরায় জোর দেন, যাতে তিনি বলেন "আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সুতীব্র অভ্যুত্থান চলেছে, বস্তুত তারই ফলে এত ঘন ঘন প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি থেকে অপ্রধান সম্প্রদায় ও ভাবধারাগুলির উদয় হচ্ছে।"৫ এই সব ভাববাদী দার্শনিক "সম্প্রদায়গুলিকে" প্রতিরোধ করতে হলে মার্কসবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মৈত্রী একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ, লেনিনের কথা অনুযায়ী, "যদি দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি না থাকে,

---

১। লেনিন, **মার্কস এঙ্গেলস, মার্কসিজম** পৃ ৫৭১ দ্রষ্টব্য

২। ঐ পৃ ৫৭২

৩। ঐ পৃ ৫৭৫।

৪। ঐ পৃ ৫৭৬।

৫। ঐ

কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং কোন বস্তুবাদ বুর্জোয়া ভাবধারার অবঘাত ও বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির পুনঃপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে না।"১

লেনিনের নির্দেশ দ্বারা চালিত হয়ে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি তার কার্য-সূচীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক সমস্যাগুলির বিস্তার সাধনকে জরুরী কর্তব্য বলে উপস্থাপিত করে। লেনিনের চিন্তাধারার যথার্থ পরবর্তী ঘটনা-ধারায় পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়েছে। আজকের ভাবাদর্শগত সংগ্রামে তাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

* * *

আমাদের কথা শেষ হল। আমরা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ, সময়ে সময়ে জটিল, কিন্তু সর্বদাই চিত্তাকর্ষক সমস্যা পরীক্ষা করেছি। তা অনুধাবন করে আপনি কতখানি লাভবান হলেন? আপনার দিগন্তে কি তারা বিস্তারিত করেছে। মানবচিন্তার অবদান কি আপনার মনকে সমৃদ্ধ করেছে? তা যে করেছে, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন। এসবসত্বেও মার্কসীয়দর্শন অধ্যয়নের তাৎপর্য কেবল এতেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

আমরা আগেই দেখেছি, মার্কসীয় দর্শনের শিকড়গুলি জীবন, বস্তুজগৎ সাধন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দৈনন্দিন জীবনে ও কার্যকলাপে এটি সুপরীক্ষিত দিঙ্-নির্ণয়যন্ত্র ও পথপ্রদর্শক।

মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়নের সঙ্গে, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টি আয়ত্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত মেহনতী মানুষের আশাবাদ, বিশ্বময়, সমস্ত মানুষের সুখ-তৃপ্ত জীবনে তাদের অবিচল আস্থা। এবং এই বিশ্বাস নির্বোধও নয়, নিষ্ক্রিয়ও নয়। অপরপক্ষে মার্কস, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন সমাজবিকাশের যে সার্বিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করে গেছেন, তারই জ্ঞানের গভীরতা থেকে এই বিশ্বাস উৎসারিত।

১। ঐ

২। ঐ

পরিশিষ্ট

পা রি ভা ষি ক শ ব্দ

প্রচলিত পরিভাষা ছাড়াও নানা সূত্র থেকে পরিভাষা সংকলন করা হয়েছে। পরিভাষা নির্বাচনে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিভাষা অসঙ্গত বোধে বরবাদ করতে হয়েছে এবং নতুন শব্দ কল্পনা করে নিতে হয়েছে। বাচ্যার্থের প্রয়োজনে এবং ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের অর্থ সুবোধ্য করার জন্যে, একই ইংরেজী পরিভাষার স্থলে একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই অনুবাদে ব্যবহৃত পরিভাষা অন্যত্র প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

Absolute অনন্যসাপেক্ষ, নিরপেক্ষ, অনাপেক্ষিক, পরম
—Idea পরমতত্ত্ব
Absolutism স্বৈরতন্ত্র
Abstract বিমূর্ত, অবচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ
—thought পরম চিন্তা
Abstraction বিমূর্তন, বিয়োজন
Accident আপতন, উপপাত
(by) Accident দৈবক্রমে
Accidental আপতিক, আকস্মিক
Activity কার্যকলাপ, ক্রিয়াকাণ্ড
Actual প্রত্যক্ষ
Actuality বাস্তবতা
Actually প্রকৃতপক্ষে
Aggravation বিবর্ধন
Agnosticism অজ্ঞাবাদ
Alien স্বভাববিরুদ্ধ
Allsidedness সর্বদেশিকতা
Anarchist নৈরাষ্ট্রবাদী
Anarcho-Syndicalism ট্রেড ইউনিয়ন বিবর্তনবাদী
Ancestral কৌলিক
Antagonism বৈরভাব, বৈরত্ব
Antagonistic সবৈর
—Contradiction সবৈর বিরোধ
Anthropoid ape মানবাকৃতি বানর, বনমানুষ
Anthropological নৃতাত্ত্বিক
Anthropologism নৃতত্ত্ববাদ
Appearance আকৃতি

Apprehend অবধারণ করা
Approach পথ, অভিমুখিতা
—to the question প্রশ্নাভিমুখিতা
Approximately স্থূলত
Arbitrary স্বেচ্ছানুরূপ
Argument যুক্তিতর্ক
Aristocratic অভিজাত
—Republic অভিজাত সাধারণতন্ত্র
Ascent উৎক্রান্তি
Aspect দশা, দিক
Assertion প্রতিজ্ঞান
Assimilation আত্তীকরণ
Astronomy জ্যোতিষ
Atheism নিরীশ্বরবাদ
Atomic পারমাণব
— Bomb পারমাণবিক বোমা
Attitude মনোভাব
Autocracy স্বৈরতন্ত্র
Basis ভিত্তি, বনিয়াদ
Being সত্তা
Biology জীববিজ্ঞান
Body দ্রব্য, পদার্থ, বস্তুসত্তা
Camp শিবির
Capacity ধারকত্ব
Capitalism পুঁজিতন্ত্র
Capitalist পুঁজিপতি
Category মূলপ্রত্যয়, প্রত্যয়পর্যায়
Causal কারণিক
Cause কারণ, ব্রত

Cell জীবকোষ
Chance আকস্মিকতা
Changing পরিণামশীল
Characteristic স্বভাবসূচক
— feature স্বভাবসূচক বৈশিষ্ট্য
চারিত্রিক লক্ষণ
Charged (physics) আহিত
Chauvinistic উগ্র জাতীয়তাবাদী
Chemistry রসায়ন
Church গির্জা, গির্জার মোহন্ত
Class interest শ্রেণীগত স্বার্থ
Classical চিরায়ত, সাবেক
Clericalism পুরোহিততন্ত্র
Cognition জ্ঞান, প্রজ্ঞান, অবগতি
Coherent সর্বাঙ্গসম্মত
Coincide সমানুপাত হওয়া
Collective সমূহ, সামূহিক
Collectivisation সমূহীকরণ
Combination সংযোগ, সংযুক্তি
Common অভিন্ন
Communist manifesto সাম্যবাদী
ইস্তাহার
Competition প্রতিযোগ
Concept ধারণা, প্রত্যয়
Conception বোধ
— of the World বিশ্ববোধ
Conclusion সিদ্ধান্ত
Concrete মূর্ত, বাস্তব
Conditon উপকারণ

Conditioned পরিচ্ছিন্ন
Conflict সংঘাত
Connected whole অন্তর্যোগশীল সমগ্ররূপ
Consciousness চৈতন্য, চেতনা
Conscious life সচেতন জীবন
Conservation of energy শক্তির নিত্যতা
Constant ধ্রুব, নিত্য
Contending যুধ্যমান
Content অন্তরবস্তু, উপাদান (রবীন্দ্রনাথ) অন্তরবিষয়
Continuation ক্রমান্বয়
Continuity অনুক্রম, নিরবচ্ছিন্নতা
— and discontinuity নিরবচ্ছিন্নতা ও অবচ্ছেদ
Contradiction বিরোধ, অন্তর্বিরোধ, স্ববিরোধ
(In) Contrast (to) প্রতিপক্ষরূপে
Conversion রূপপরিগ্রহ
Conviction প্রত্যয়, প্রতীতি
Co-ordination অঙ্গাঙ্গীকরণ
Cosmological সৌরজাগতিক
Cosmonaut মহাকাশযাত্রী
Course of events ঘটনাপরম্পরা
Crop rotation শস্যাবর্ত
Cyclical চক্রাকারে
Data তথ্য
Deception ধাপ্পাবাজি
Decisive নির্দেশক, অবধারিত
—factor নির্দেশক,[অবধারিত] কারণ
Definiteness অবচ্ছিন্নতা
Definition সংজ্ঞা
Democracy গণতন্ত্র
Democrat গণতন্ত্রী
Democratic Centralism গণতান্ত্রিক কেন্দ্রবদ্ধতা
Derivation সমুৎপন্ন, যোগজ
Derived form ব্যুৎপন্ন
Determinism নির্ধারণবাদ
Determinists নির্ধারণবাদী
Develop বিকাশলাভ করা, বিস্তার-সাধন করা
Development বিকাশ, বিকাশন
Dialectical Materialism দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
Dialectical Method দ্বন্দ্বসমন্বয়পদ্ধতি
Dialectician দ্বন্দ্বসমন্বয়বিদ্
Dialectics দ্বন্দ্বসমন্বয় [বিদ্যা] তত্ত্ব
Difference বৈসাদৃশ্য
Dimension মাত্রা
Direction দিশা, অভিমুখ, দিক
Discontinuity বিচ্ছিন্নতা, অবচ্ছেদ
Displacement স্থানচ্যুতি
Dissimilation অনাত্তীকরণ
Dissociation বিযুক্ত
Divergence বৈভিন্ন

Divine ঐশী
Divorce অবচ্ছিন্ন
Doctrine মতবাদ
Dogma শাস্ত্রবাক্য, আপ্তবাক্য
Dogmatism নির্বিচার মতবাদ, যুক্তিহীন মতান্ধতা
Dualist দ্বৈতবাদী
Duration স্থিতিকাল
Eclecticism সারসংগ্রহবাদ
Effect পরিণাম
Elaboration বিস্তারসাধন
Electrification বিদ্যুতায়ন
Elementary মৌলিক
Elite বিদগ্ধজন
Emotion প্রক্ষোভ
Empirical প্রয়োগসিদ্ধ, প্রত্যক্ষবাদী
Empiricalism প্রত্যক্ষবাদ
Emperio-criticism ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ
Energy শক্তি
Erect gait ঋজু গতিভঙ্গি
Essence সারমর্ম, সারসত্তা
Essential সারভূত, সারাত্মক, মৌলিক
Essentially মূলত
Eternal চিরন্তন
Eternally শাশ্বতকালব্যাপী, নিত্যকাল
Event সামাজিক ঘটনা
Evolution অভিব্যক্তি, বিবর্তন
Evolutionary অভিব্যক্তিমূলক, অভিব্যক্তিক

Exception ব্যতিক্রম
(Without) — অব্যতিক্রমে
Exist বিরাজ করা, বিদ্যমান থাকা
Experimental পরীক্ষণমূলক
— investigation পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধান
Exploiter শোষক
Exponent প্রবক্তা
Extension ব্যাপ্তি
Factor কারণ, উপকরণ
Fantasy মনোমরীচিকা, কুহক
Fatalist নিয়তিবাদী
Feature লক্ষণ, আকৃতিপ্রকৃতি
Field ক্ষেত্র
Forelimb অগ্রপদ
Form আকারপ্রকার, রূপ
Formal আকারগত, বিধিমত, বিধিবৎ
— logic রূপগত ন্যায়
— logical রূপগত নৈয়ায়িক
Fraternal ভ্রাতৃস্থানীয়
Function বৃত্তি
Fundamental মৌলিক, মৌল
Gait গতিভঙ্গি
General সাধারণ, সামুদায়িক, ব্যাপক, সামান্য
(In) — অবস্থানিরপেক্ষ
Generalisation সামান্যীকরণ
Gigantic অমিত
Gradual ক্রমিক, ধীরে ধীরে

— Conversion ধীরে ধীরে রূপপরিগ্রহ
Group দল
Guide দিশারী
Guiding star ধ্রুবতারা
Habitat নিবাস, বাসস্থান, আস্তানা
Harmonious সুসঙ্গত
Heredity বংশগতি
Hieroglyph সংকেত
Hostile বৈর
— classes বৈর শ্রেণী
Human Organism জীবমানব
Humanist Socialism মানববাদী সমাজতন্ত্র
Hypotheses প্রকল্প
Idea ধারণা : "আদিভাব"
Ideal (adj.) ভাবনাগতিক, জ্ঞানগত (n.) আদর্শ
Idealism বিজ্ঞানবাদ, ভাববাদ
Ideas ধ্যানধারণা
Identity অভেদ, সারূপ্য
Ideological ভাবাদর্শগত, ভাববাদী
Ideologist ভাবতত্ত্বজ্ঞ
Illusory মায়াময়
Image প্রতিরূপ
Immediate সাক্ষাৎ
Immediately অব্যবহিতভাবে
Immutable অব্যয়, অবিনাশী
Impartiality নিরপেক্ষতা
Impermisible অগ্রাহ্য
Impulse উদ্দীপক, আবেগ
Inactive নিষ্ক্রিয়
Independent স্বতন্ত্র, নির্ভরশীল নয়
Indestructible অবিনশ্বর
Indeterminism অনির্ধারণবাদ, অনির্ণেয়বাদ
Individual (phenomenon) স্বকীয়
Indivisible অবিভাজ্য
Industrialisation শিল্পায়ন
Inessential অসার
Inherent অন্তর্নিহিত
Initial আদি
Inner আভ্যন্তরিক
Innovation নবায়ন
Instantaneous তাৎক্ষণিক
Integral অখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ, একীভূত
— whole একীভূত সাকল্য
Integrity পূর্ণত্ব
Interaction আন্তঃক্রিয়া, পারস্পরিক ক্রিয়া
Interconnection আন্তর্যোগ
Interest স্বার্থ
Internal স্বদেহে, আন্তর
Interplanetary গ্রহান্তর্বর্তী
Interruption নিরোধ
— of gradualness ক্রমিকতার নিরোধ
Interstellar তারান্তপ্রদেশীয়
Intervention হস্তক্ষেপ

Investigation অনুসন্ধান
Irreconcilable অসমন্বেয়
Irreversibility অনিবর্তনীয়তা
Issue বাদবিষয়
Law নিয়ম, সূত্র, বিধি, নিয়মসূত্র
— governed নিয়মানুগ
Leap উল্লম্ফন
Line মার্গ
Living fire প্রাণময় অগ্নি
— Organism জীবশরীর
— Perception জীবনধর্মী উপলব্ধি
Local স্থানিক
Location অবস্থান
Logical নৈয়ায়িক
— Cognition নৈয়ায়িক জ্ঞান
Machism মাকবাদ, মাখ্‌বাদ
Marxist-Leninist মার্কসীয়-লেনিনীয়
Marxist Philosophy মার্কসীয় দর্শন
Material ভৌতিক
Materialism জড়বাদ, বস্তুবাদ
Matrialist বস্তুবাদী
Mathematical গাণিতিক
Matter বস্তু, জড়বস্তু, জড়জগৎ
— in motion গতিশীল জড়বস্তু
Meaning তাৎপর্য
Measure মাপ
Mechanics যন্ত্রগণিত, বলবিজ্ঞান
Mental মনোজাগতিক
— Phenomena মনোজাগতিক ঘটনা
Metaphysical তত্ত্ববিদ্যাগত, আধিবিদ্যক, তত্ত্ববিচারমূলক
— materialist তাত্ত্বিক বস্তুবাদী আধিবিদ্যক বস্তুবাদী
— method তত্ত্ববিচারপদ্ধতি
Metaphysician তত্ত্বজ্ঞানী, তত্ত্ববাগীশ
Metaphysics তত্ত্ববিদ্যা, পরাবিদ্যা
Method পদ্ধতি, বিচারপদ্ধতি, মার্গ
— of Cognition জ্ঞানমার্গ
Microparticle সূক্ষ্মকণা, অভেদ্য-কণা, কণিকাণু
Militant জঙ্গী, সংগ্রামী
Monarchy রাজতন্ত্র
Motion গতিক্রিয়া
Motive force প্রয়োজক শক্তি
Mysticism রহস্যবাদ
Naive অপরিপক্ব, অপরিণত
Nature phenomena প্রাকৃতিক ঘটনাবলী
Naturally স্বাভাবিকভাবে
Nature প্রকৃতি, প্রকার, চরিত্র
Necessary আবশ্যিক
Necessity আবশ্যকতা
(By virtue of) — আবশ্যিকভাবে
Negation অনস্তিত্ব, নাস্তিত্ব
Negative নঞর্থক
— aspect নঞর্থক দিক
Nervous system নার্ভতন্ত্র
Neutral নিরপেক্ষ

Nihilism নাস্তিবাদ
Non-antagonistic নির্বৈর
— Contradiction নির্বৈর বিরোধ
Nothing শূন্য, অসৎ
Nucleus বীজকোষ
Object বিষয়, বস্তু, বহির্বিষয়
Objective সবিষয়, বিষয়মুখ, বিষয়াত্মক, বাস্তবনিয়মধর্মী
— Reality বিষয়ীভূত সদ্বস্তু
Objectively বিষয়গতভাবে
Objectivity বিষয়তন্ত্রতা
Obscurantism গুহ্যবাদ
Observation নিরীক্ষণ
Obsolete অচল, গতায়ু, বিগত-ব্যবহার, সেকেলে
One-sidedness একদেশদর্শী
Oppose বিরোধিতা করা
Optimistic আশাবাদী
Organ অঙ্গ
Organic Unity একীভূত সমন্বয়
— Whole অঙ্গাঙ্গী ঐক্য
Organism জীবশরীর, দেহী, জীবদেহ
Ossified অস্থিভূত
Part (played) ভূমিকা
Particle কণা
Particular বিশেষ
Partisanship পক্ষপাতিত্ব
Partisan দলীয়
Passive নিরুদ্যম
Peasant Revolutionary Democracy কৃষক বিপ্লবী গণতন্ত্র
Parception উপলব্ধি, প্রত্যক্ষীকরণ
Perceive গোচরীভূত হওয়া
Permanent নিত্য
Permissible গ্রাহ্য
Pessimism নৈরাশ্যবাদ
Phenomena ঘটনা, প্রাকৃতিক প্রকাশ: পরিদৃশ্যমান বস্তুনিচয়
Philistine ফিলিস্টাইন
Philosophical question দার্শনিক সমস্যা
Physical দৈহিক, শারীর, পদার্থবিষয়ক
— Elements পদার্থগত উপাদান
— Idealism ভৌত ভাববাদ
Physics পদার্থবিদ্যা
Plan যোজনাসূচী, পরিকল্পনা
Political রাজনৈতিক
— Economy অর্থনীতি
Popular uprising গণ-অভ্যুত্থান
Positive (n.) সদ্ভাব
— (adj.) সদ্ভাবাত্মক, অস্তিবাচক
Positivism দৃষ্টবাদ
Possibility সম্ভাব্যতা
Practical ব্যবহারিক, প্রক্রিয়াত্মক
Practice প্রযুক্তি, সাধন
Pragmatist প্রয়োগবাদী
Prejudice অন্ধ সংস্কার
Prerequisite পূর্বাবশ্যক, পূর্বোপকল্প

Primary প্রাথমিক
Primitive আদিম
Principle নীতি, তত্ত্ব, পরমতত্ত্ব
Problem সমস্যা
Product মাল, উপজ
Profound প্রগাঢ়
Programme কর্মসূচী
Progressive প্রগতিশীল
Proletariat প্রলেটারীয় শ্রমিক শ্রেণী
Property ধর্ম
Proposition বচন, প্রতিজ্ঞা
Psychic elements মানসিক উপাদান
Purposiveness উদ্দেশ্যপ্রবণতা, উদ্দেশ্যনিষ্ঠা
Quantity পরিমাণ
Quality গুণ
Radio activity তেজস্ক্রিয়তা
Range পরিধি
Rapprochement মৈত্রী
Rational যুক্তিযুক্ত
—Cognition যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান
Rationalism প্রজ্ঞাবাদ
Rationalist যুক্তিবাদী
Reaction প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া (রাসায়নিক)
Reactionary প্রতিক্রিয়াশীল
Real সত্যকার, সৎ
Realism বস্তুতন্ত্রবাদ
Reality বস্তুজগৎ, সদ্বস্তু
In reality—প্রকৃতপক্ষে
Reason বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি
Reflex প্রতিবর্ত
Relativist অপেক্ষবাদী
Renewal নবীকরণ
Repetition চক্রাবর্তন
Republic সাধারণতন্ত্র
Resolution বিশ্লেষণ,নিস্পত্তি, সমাধান
Revolutionary বিপ্লবী, বৈপ্লবিক
—Democrat বিপ্লবী গণতন্ত্রী
Role ভূমিকা
Rotation আবর্ত
Sceptic সংশয়বাদী
Scepticism সংশয়বাদ
School সম্প্রদায়
Science বিদ্যা, বিজ্ঞান
Scientific বৈজ্ঞানিক
Seet সম্প্রদায়
Self development স্বকৃত বিকাশন
Self movement স্বকৃত গতি
Semblance সাদৃশ্য
Sense organs জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চেন্দ্রিয়
Sensualism সংবেদনবাদ
Sensuous Cognition--knowledge ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান
Sequence পর্যায়ক্রম, ক্রম, পরম্পরা, পারম্পর্য
Serfdom ভূদাসপ্রথা
Shock আকস্মিক ক্ষোভ
Single এক
Slavery দাসত্বপ্রথা
Slave owner দাসপ্রভু

— Society দাসসমাজ

Social সামাজিক

—Democrat সোশ্যাল ডিমক্র্যাট

Socialist সমাজতন্ত্রী

Solipsism ব্যক্তিচৈতন্য সর্বস্ববাদ

Sophistry কূটতর্ক, কূটন্যায়

Source উৎস, কারণ

Soviets সোভিয়েট সংস্থা

Space দেশ, দিক

(Relating to)— দেশিক

—Flight মহাকাশযাত্রা

Specialization বিশেষয়ণ

Species উপজাতি

Speculative জাল্পনিক

—thought জাল্পনিক চিন্তা

Spiral চক্রাবর্ত

Spirit অধ্যাত্মশক্তি, উপদেবতা

Spiritual আত্মিক, আধ্যাত্মিক

—principle আত্মিক তত্ত্ব

Spontaneous স্বতঃস্ফূর্ত

Stage পর্যায়, পর্ব

Starting point উপক্রমণিকা

Status আসন

Stellar System নক্ষত্রমণ্ডল

Stimulus উদ্দীপক

Structure গঠনবিন্যাস, সংযোগ

— of atoms পরমাণু-সংযোগ

Struggle সংগ্রাম, সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব

— for existence জীবনসংগ্রাম

—of opposites বিপরীতের সংঘর্ষ

Study(v.)অধ্যয়ন করা অনুসন্ধান করা

(n.) সমীক্ষা, বিচার

— of the world বিশ্বসমীক্ষা

Subject জ্ঞাতা, বিষয়ী ; বিষয়

Subjective জ্ঞানগত, জ্ঞাতৃগত, মানসিক

— Idealism কেবলবিজ্ঞানবাদ, জ্ঞাতৃগত বিজ্ঞানবাদ

Subject matter বিষয়বস্তু

Subsequent উত্তরকালীন

Substance জড়বস্তু

Substantiation যাথার্থ্য প্রতিপাদন

Sum total মোট যোগফল

Supernatural অতি প্রাকৃত, অলৌকিক

Supreme পরা

— Power পরাশক্তি

Symbol প্রতীক

System প্রথা, চিন্তাধারা

Systematiser সংহিতাকার

Technical কারিগরী, প্রায়োগিক

Technique কৌশল, যান্ত্রিক কৌশল

Technological প্রযুক্তিগত

Teleology ইষ্টহেতুবাদ, লক্ষ্যবাদ, প্রয়োজনবাদ

Temporary অস্থায়ী

Tendency প্রবণতা

Tenet শিক্ষা

Theology পুরোহিততন্ত্র
Theoretical তত্ত্বীয়, তাত্ত্বিক
Theory তত্ত্ব
-- of Knowledge প্রমাবিজ্ঞান
— of matter জড়বস্তুতত্ত্ব
Theses তত্ত্ব
Thing পদার্থ, জিনিস, বস্তুদ্রব্য
— -in-itself স্বরূপবস্তু, বস্তুর স্বরূপ
Thought চিন্তা
Phenomena of — চিন্ময় জগতের ঘটনাবলী
Time কাল
Relating to — কালিক
Transform রূপান্তর সাধন করা
Transformation অবস্থান্তর, রূপান্তর
Transient ক্ষণিক
True reality বাস্তব সত্য
Tsarism জারতন্ত্র
Ultimate brick পরম উপাদান
— particle অভেদ্য কণা,পরম কণিকা
Unchanging অবিকারী
Unconnected অসম্পৃক্ত
Understandable সহজবোধ্য
Understanding ধারণা, উপলব্ধি
—of the world বিশ্বোপলব্ধি
Unitary ঐকিক
— system ঐকিক সমূহ
Unity ঐক্য, একত্ব
— of opposites বিপরীতের ঐক্য
Universal সর্বময়
Universality সার্বত্রিকতা
Utopean ইউটোপীয়
— Socialism ইউটোপীয় সমাজ-বাদীদের তত্ত্বচিন্তা
Vanguard অগ্রবাহিনী
Vanity অহংবোধ
Vital ঐকান্তিক
-- process প্রাণক্রিয়া
Vitality প্রাণপ্রাচুর্য
Vitally একান্তভাবে
Void শূন্যদেশ, শূন্য
Volume আয়তন
Voluntarist স্বেচ্ছাবাদী
Voluntary movement স্বেচ্ছাবৃত্তি
Vulgar প্রাকৃত, অবর
— evolution প্রাকৃত অভিব্যক্তিবাদ
— materialism অবর বস্তুবাদ
Way উপায়
Whole সাকল্য, সমগ্রতা, অখণ্ডতা
Will এষণা
Wisdom প্রজ্ঞা
Working people কর্মজীবী,শ্রমজীবী, মেহনতী মানুষ
World জগৎ
- as a whole অখণ্ড বিশ্ব
— element বিশ্ব উপাদান
— outlook বিশ্বদৃষ্টি
— spirit জগতাত্মা
Worldly পার্থিব
— vanity পার্থিব অহংবোধ

শুদ্ধিপত্র

(যে ভুলগুলি অসংশোধিত থাকলে অর্থবিভ্রমের সম্ভাবনা, মাত্র সেইগুলিরই শুদ্ধপাঠ দেওয়া হল)

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধপাঠ
৯	২২	এটা	এতে
১৬	৯	বুঝতে।	বুঝতে,
৩৬	১৭	বিকাশ	বিকাশে
৩৮	২৩	হস্তক্ষেপে	হস্তক্ষেপ
৪৯	৮	পরমাণু দৃশ্য	পরমাণু অদৃশ্য
৬৬	২৩	সমগ্রতা রূপায়িত	সমগ্রতায় রূপায়িত
৬৮	১	উপাদান করতে হলে	উপপাদন করতে হলে
	১৭-১৮	চেতনা বাস্তব চৈতন্য	চেতনা বা চৈতন্য
৭৮	৭	বাইরে।	বাইরে,
৮১	২৬	ভ্রমাত্মক কাজের	শ্রমাত্মক কাজের
৮৩	২০	স্মরণ যাক	স্মরণ করা যাক
৮৬	৯	অন্তশীলন	অনুশীলন
৮৭	১	ফাটিয়ে	ফুটিয়ে
৯০	৬	মারাত্মকও	সারাত্মকও
৯১	৪	আমরা আগে থেকেই	আমরা তার আগে থেকেই
৯৬	১৭	পরিণাম গুণে প্রয়াণ করে	পরিমাণ গুণে প্রয়াণ করে
১২১	২৫	[illegible]াদার	সমাজবাদীরা
১২২	৮	তা এই থাকবে	তা এইভাবেই থাকবে
১২৩	১২	পশ্চাৎগামী	পশ্চাৎবর্তী
	২২	সর্বৈব	সবৈর
	২৩	নিবৈর	নির্বৈর